রূপসী বাংলার দুই কবি

রূপসী বাংলার দুই কবি

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্‌স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

শ্রদ্ধেয় শ্রীসাগরময় ঘোষকে

শ্রদ্ধেয় সাগর দা-র উৎসাহেই এই রচনাটি
প্রথমে ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়েছিল 'দেশ'
পত্রিকায়। তিনিই এই রচনার প্রথম পাঠক।
বই করতে গিয়ে ঘটেছে অনেক নতুন তথ্যের সমাবেশ।
'দেশ'-এ প্রকাশিত রচনার এটি একটি পরিমার্জিত
ও পরিবর্ধিত রূপ বলাই ভাল। বহুজনের
সাগ্রহ সাহায্য পেয়েছি লেখা এবং ছবি দুই
ব্যাপারেই। অফুরন্তভাবে বই জুগিয়েছেন শঙ্খ ঘোষ।
দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করে দিয়েছেন সুনীল
নন্দী এবং সুবীর ভট্টাচার্য। জীবনানন্দের
'রূপসী বাংলা'-র পাণ্ডুলিপি ব্যবহারের অনুমতি
দিয়েছেন শ্রীমতী নলিনী দাশ ও অশোকানন্দ

দাশ। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রিত পাণ্ডুলিপি পেয়েছি
শান্তিনিকেতন-বাসী শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের
সৌজন্যে। অবনীন্দ্রনাথের রঙীন ছবি ব্যবহারের
সুযোগ করে দিয়েছেন যথাক্রমে
রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি, শ্রীমতী শ্যামশ্রী ঠাকুর
ও বাদশা ঠাকুর। নানা ব্যাপারে সাহায্য
করেছেন পার্থ বসু ও পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়।
বইটির নির্ঘণ্ট রচনা করে দিয়েছেন
চিত্রা দেব। প্রকাশনার ব্যাপারে আন্তরিক
উৎসাহ দেখিয়েছেন 'আনন্দ পাবলিশার্স'-এর
বাদল বসু। এঁদের সকলের কাছেই
আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

রূপসী বাংলার দুই কবি

কবি অবনীন্দ্রনাথ

একবার য়ুরোপ সফর শেষ করে দেশে ফিরেই রবীন্দ্রনাথ তলব করলেন ভাইপোকে।

অবন, বিলেতে, ফ্রান্সে, সুইডেনে, জার্মানীতে সব জায়গায় তোমার কত বন্ধু, ভক্ত রয়েছে দেখলুম। তাদের সঙ্গে আমার আলাপ হল। তোমার একবার সেখানে যাওয়া উচিত। প্যারিস, ল্যাটিন কোয়ার্টার আর সব কিছু তোমার নিজের চোখে দেখে আসা দরকার।

ভাইপোর মুখে তখন গড়গড়ার নল। এক ঝলক ধোঁয়া ছেড়ে উত্তর দিলেন তিনি—

আমি শিল্পী। মানসচক্ষে দেখতে পাই সব, ঐ ধোঁয়ার মধ্যে। হুগো বালজাক যখন পড়েছি, তখন আর নিজের চোখে প্যারিস দেখার দরকার হবে না। তুমি আমাকে বল, আমি হুবহু ল্যাটিন কোয়ার্টারের ছবি এঁকে দিচ্ছি।

এই কথাগুলো অথবা এই মনোভঙ্গীকে যদি নিংড়িয়ে নির্যাস করে গদ্যের বদলে কবিতার ছন্দে বলতে বলা হোতো অবনীন্দ্রনাথকে, কী উত্তর দিতেন তিনি তা লিখে গেছেন জীবনানন্দ।

"তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও—আমি এই বাংলার পারে
রয়ে যাব ;"

আশ্চর্য! একজন শিল্পীর মনের খবর হুবহু আরেকজন কবির কলমে। তাহলে কী মনের গভীরতম মহলে মিল ছিল এঁদের দুজনের? কিন্তু সে অনুসন্ধানের প্রথম পর্বে মিলের চেয়ে অমিলটাই চোখের সামনে খাড়া হয়ে ওঠে স্তূপাকারে। দুটো ভিন্ন যুগের মানুষ এঁরা দুজন। একজনের বিকাশ অভিজাত পরিবারের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে। আরেকজন বড় হয়েছেন সাম্রাজ্যবাদী শাসনের মধ্যপর্বে মধ্যবিত্ত চেতনার সবচেয়ে সংঘর্ষময় পটভূমিকায়। একজনের সৃষ্টির শুরু ফলের বোঁটাকে মনে রেখে, ঐতিহ্যকে আঁকড়ে। অপরজনের, সাপের খোলস ছাড়াকে মনে রেখে, ঐতিহ্যকে অস্বীকার না করেও নতুন ঐতিহ্য রচনার তপস্যায় মেতে। একজন যুরোপীয় চিত্রকলার স্বাদ নিয়েছেন দূর থেকে গন্ধে-ঘ্রাণে, জিভের ছোঁয়ায় নয়। আরেকজন য়ুরোপীয় সাহিত্যের সর্বাধুনিক স্রোতে স্নান করেছেন সাঁতার কেটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কামান-বিমান যখন বিশ্বের যাবতীয় প্রাচীন মূল্যবোধের দেয়ালকে দিয়েছে ঝাঁঝরা করে, একজনের সৃষ্টির কাজ তখন প্রায় সারা হওয়ার মুখে। আর অন্যজনের সূত্রপাত সেই বিশ্বজোড়া ভস্মরাশির দিকে তাকিয়ে। একজন ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী। আরেকজন বিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত সমাজ বিপ্লবের প্রত্যক্ষদর্শী।

বিপরীতমুখী এমন দুটি চরিত্রের মধ্যে মিল খুঁজতে যাওয়া যখন মনে হচ্ছিল নিতান্তই অহেতুক, ঠিক সেই মুহূর্তে মনের মধ্যে ঝমঝমিয়ে বেজে উঠলো একটা সত্য, এঁরা দুজনেই কবি।

কবি? জীবনানন্দ দাশ যে কবি, তা আমরা সর্বান্তকরণে জানি। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ? তিনি তো প্রধানত চিত্রকর। পরবর্তী পরিচয়ে শিশু সাহিত্যের এক পরমাশ্চর্য জাদুকর। কিন্তু কবি নন কখনোই। কবিতা লিখেছেন যদিও কয়েকটি। কিন্তু সে মুষ্টিমেয়তার শরীরে এমন শক্তি নেই যে, তাকে সগৌরবে খাড়া করা যাবে জীবনানন্দের অফুরন্ত সৃষ্টির পাশে, সমকক্ষরূপে। তাহলে?

একটু স্মরণ করিয়ে দিলেই হয়তো আমাদের মনে পড়বে, বাংলা সাহিত্যে আরো একবার উচ্চারিত হয়েছিলো অবিকল এই জাতীয় জিজ্ঞাসা। প্রবন্ধের নাম, এক গ্রীষ্মে দুই কবি। প্রবন্ধকার, বুদ্ধদেব বসু। সেখানেও প্রশ্ন ছিল—

"কবিতাই যদি আলোচ্য বিষয় তাহলে ডস্টয়েভস্কির স্থান হয় কেমন করে?"

আর প্রবন্ধকার তার উত্তর দিতে গিয়ে লিখেছিলেন—

"বলা যেতে পারে, সাহিত্যের যা সারাংসার তা-ই কবিতা; কবিতা বলে তাকেই যা বিবরণ নয়, বর্ণনা নয়, মন্তব্য নয়, যা জীবনের মুকুরমাত্র না-হয়ে জীবনের সমান্তর এক সৃষ্টি হয়ে ওঠে; বুদ্ধির অতীত এক চঞ্চলতায় নিক্ষেপ করে আমাদের, যেখানে বহু ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি দ্যুতি ও ছায়া পরস্পরে মিশ্রিত হয়ে অনির্বচনীয়ের আভাস এনে দেয়। আর এই অর্থে এমন কোন শিল্পকলা নেই, যা কবিতার দ্বারা আক্রান্ত না হয়—সব সময় নয়, নিয়ম হিসেবে নয়, কিন্তু কখনো কখনো। টোমাস মান বা ডস্টয়েভস্কির মতো লেখককে 'কবি' আখ্যা দিতে নারাজ হবেন শুধু তাঁরাই যাঁরা গদ্য ও পদ্যের তফাৎ বুঝলেও গদ্য মন বা কবি মনের প্রভেদ বোঝেন না।"

কবি-মনের হিসেবে অবনীন্দ্রনাথ এক কথায় কবি। তবু আরও একটু খুঁটিয়ে দেখে নেওয়া যাক, কবি-কৃতির অবনীন্দ্রনাথকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় কিনা।

বয়স তখন ১৭। শিক্ষানবিসি চলেছে ছবি আঁকার, বিদেশী শিক্ষকের কাছে। হাত পাকেনি। সেই সময়েই সংগোপনে, ঠাকুরবাড়ির সমস্ত কীর্তিমানদের চোখের আড়ালে, হাত লাগালেন এক দুরূহ কাজে। একই সঙ্গে দুটো কাজ। কবিতার অনুবাদ এবং সে-কবিতার চিত্রাঙ্কন।

টমাস মুরের Lalla Rookh তখন সাহিত্য-সেবীদের পাড়ায় সমাদৃত। অবনীন্দ্রনাথ সেই দীর্ঘ কাহিনী-কাব্য থেকেই বেছে নিলেন নিজের মনের মতো একটা অধ্যায়। Fire-wood Worshiper. অনুবাদে নামকরণ করলেন, অগ্নি-উপাসক।

যে বয়সে অবনীন্দ্রনাথ হাত দিয়েছেন কবিতায় অথবা কবিতার অনুবাদে, হয়তো সেই বয়সেই জীবনানন্দ হাত দিয়েছিলেন ছবি আঁকায়। হয়তো বলতে হল, কারণ সঠিক বয়সের হিসেবটা আমাদের জানা নেই। জানা আছে, বোন সুচরিতা দাশের স্মৃতি-চারণা থেকে, কৈশোরে তিনি মন দিয়েছিলেন

ছবিতে। কাগজের উপর পেনসিলের আলতো চাপ দিয়ে, গাছতলায় বসে চলতো তাঁর চিত্র-চর্চা। সংবাদ শুধুমাত্র এইটুকুই। কিন্তু আরো একটু বেশী জানতে পারলে, তাঁকে আরেক রকম ভাবে চেনা যেতো।

'অগ্নি-উপাসক'-এর জন্যে অবনীন্দ্রনাথ নিজের হাতে বানিয়ে নিলেন পাণ্ডুলিপির খাতাটি। ছোট্ট আকারের বইয়ের মতো। ভিতরে ছবির সংখ্যা ৬। ছবির পাশের পাতায় কবিতার উদ্ধৃতি। পুরো পাণ্ডুলিপিটা যেদিন শেষ আঁকায় এবং লেখায়, তারিখটা ছিল ১৮৮৮, ৩ জুলাই। তখনও অবশ্য কবি এবং শিল্পী দুই অবনীন্দ্রনাথেরই হাত পাকতে অনেক বাকী। 'অগ্নি-উপাসক'-এর সেই সব ছবি এবং অনুবাদ দেখে ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরের মতো দৈবজ্ঞানসম্পন্ন জ্যোতিষ ছাড়া অন্য কারো পক্ষেই উচ্চারণ করা সম্ভব ছিল না যে, ইনিই আনবেন ভারতীয় চিত্রশিল্পের জগতে আমূল ওলোট-পালোটের ঝড়, অথবা এঁর কলমেই জন্ম নেবে বাংলার সাহিত্যে কথা এবং কবিতার এক স্বতন্ত্র শিল্পলোক।

'অগ্নি-উপাসকে'র ৬ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ ডাক দিলেন ভাইপোকে, তাঁর সত্ত সমাপ্ত 'চিত্রাঙ্গদা'কে অলঙ্কৃত করতে। রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদা লিখেছিলেন কটকে বসে। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কনও সম্ভবত ঐখানেই। ইতিমধ্যে তুলি-কালিতে হাত কিছুটা পাকা। গিলার্ডির কাছে আঁকা-শেখার পালা শেষ। সচিত্র চিত্রাঙ্গদা যেদিন ছাপানো বই হয়ে বেরোল, দেখা গেল রবীন্দ্রনাথ সে-বই উৎসর্গ করেছেন ভাইপোকেই। উৎসর্গ পত্রের বয়ান—

"বৎস, তুমি আমাকে তোমার যত্ন রচিত চিত্রগুলি উপহার দিয়াছ, আমি তোমাকে আমার কাব্য এবং স্নেহ আশীর্ব্বাদ উপহার দিলাম।"

এই চিত্রাঙ্গদা-চিত্রণের সূত্রেই রবিকাকার সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতার শুরু।

"চিত্রাঙ্গদা তখন সবে লেখা হয়েছে। রবিকা বললেন, ছবি দিতে হবে। আমার তখন একটু সাহস হয়েছে, বললুম, রাজি আছি। সেই সময় চিত্রাঙ্গদার সমস্ত ছবি নিজ হাতে এঁকেছি, ট্রেস করেছি। চিত্রাঙ্গদা প্রকাশিত হল। এখন অবশ্য সে ছবি দেখলে হাসি পায়। কিন্তু এই হল রবিকাকার সঙ্গে আমার প্রথম আর্ট নিয়ে যোগ। তারপর থেকে এতকাল রবিকাকার সঙ্গে বহুবার আর্টের ক্ষেত্রে যোগাযোগ হয়েছে, প্রেরণা পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে। আজ মনে হচ্ছে আমি যা কিছু করতে পেরেছি তার মূলে ছিল তাঁর প্রেরণা।"

কবিতার চিত্রাঙ্কন-এর যদি খাঁটি হিসেব-নিকেশ নিতে হয়, তাহলে দেখতে

পাবো, 'অগ্নি-উপাসক' এবং 'চিত্রাঙ্গদা'-র মাঝখানে রয়ে গেছে তাঁর উত্তমের আরও একটুখানি রঙীন ইতিহাস। তা হোল দ্বিজেন্দ্রলালের 'স্বপ্ন প্রয়াণে'র ছবি। চিত্রাঙ্গদা চিত্রিত করেছিলেন স্বয়ং কবির ডাকে। 'স্বপ্ন প্রয়াণ' শিল্পীর নিজের স্বতোৎসারিত আবেগে। 'চিত্রাঙ্গদা'-য় ছবির পরিমাণ অনেক। রেখা-চিত্রের সংখ্যা, ৩২। কবিতার মূল বিষয় নিয়ে পুরো পাতার ছবির সংখ্যা, ৮। সেখানে 'স্বপ্ন প্রয়াণ'-র ছবির সংখ্যা, মাত্র দুই। এই ছবিই গোটা পরিবারের দৃষ্টিকে টেনে এনেছিল তাঁর দিকে। এরপরই গিলার্ডির কাছে ছবি-আঁকার হাতেখড়ি।

"...বড় হয়েছি, বিয়ে হয়েছে, বড় মেয়ে জন্মেছে, সেই সময় একদিন খেয়াল হল 'স্বপ্ন প্রয়াণ'টা চিত্রিত করা যাক। এর আগে ইস্কুলে পড়তেও কিছু কিছু আঁকা অভ্যেস ছিল। সংস্কৃত কলেজে অনুকূল আমায় লক্ষ্মী সরস্বতী আঁকা শিখিয়েছিল। বলতে গেলে সেইই আমার প্রথম শিল্প শিক্ষার মাস্টার, সূত্রপাত করিয়ে দিয়েছিল ছবি আঁকার।

তা 'স্বপ্ন প্রয়াণে'র ছবি আঁকবার যখন খেয়াল হল, তখন আমি ছবি আঁকায় একটু একটু পেকেছি। কি করে যে পারলুম মনে নেই, তবে নিজের ক্ষমতা জাহির করবার চেষ্টা আরম্ভ হল 'স্বপ্ন প্রয়াণ' থেকে। 'স্বপন রমণী আইল অমনি, নিঃশব্দে যেমন সন্ধ্যা করে পদার্পণ', এমনি সব ছবি, তখন সত্যি যেন 'খুলে দিল মনোমন্দিরের চাবি'। ছবিখানা 'সাধনা' কাগজে বেরিয়েছিল।"

কবি অবনীন্দ্রনাথের কথা বলতে গিয়ে চিত্রাঙ্গদা অথবা স্বপ্ন প্রয়াণের ছবির প্রসঙ্গ টেনে আনা হলো একটা স্বতন্ত্র প্রয়োজনে। অগ্নি-উপাসকে যার খেলাচ্ছলে শুরু, স্বপ্ন প্রয়াণ আর চিত্রাঙ্গদা-য় যার ঈষৎ পরিণতি, তাতে দেখতে পাই, তাঁর ভিতরে স্পন্দিত হয়ে চলেছে কবিতার সঙ্গে অথবা কবিতার কাছাকাছি বসবাসের বাসনা। আর এর পর থেকে তাঁর সমগ্র চিত্র-সাধনার ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাবো, প্রত্যেক অধ্যায়ের মোড়-ফেরার মুখে প্রেরণার উৎস রূপে দাঁড়িয়ে আছে কবিতা। কবিতাই তাঁকে বারে বারে উস্‌কে দিয়ে এক প্রদীপে জ্বালিয়ে দিচ্ছে নানান শিখার আলো। কবিতার সঙ্গে তাঁর এই আধাগোপন প্রেম জীবনের শেষ বেলা পর্যন্ত ফুরোয়নি।

রবি বর্মার যুগের য়ুরোপীয় ধাঁচের নকলনবিসির দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ যেদিন কাঁচা হাতে উদ্বোধন করলেন ভারত শিল্পের, আঁকলেন

দেশী-গড়নের ছবি, সেদিনও, সেই প্রথম সম্ভাবনাময় সৃজনের পিছনেও প্রেরণার উৎস ছিল কবিতা। বৈষ্ণব পদাবলী।

"তখন একতলার বড় ঘরটাতে একধারে চলেছে বিলিয়ার্ড খেলার হো হো, একধারে আমি বসেছি রং তুলি নিয়ে আঁকতে। দেশের শিল্পের রাস্তা তো পেয়ে গেছি কিন্তু আঁকবো কি? রবিকাকা আমায় বললেন, বৈষ্ণব পদাবলী পড়ে ছবি আঁকতে। রবিকাকা আমাকে এই পর্যন্ত বাতলে দিলেন যে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির কবিতাকে রূপ দিতে হবে। লেগে গেলুম পদাবলী পড়তে। প্রথম ছবি করি ভারতীয় পদ্ধতিতে গোবিন্দ দাসের দু লাইন কবিতা—

পৌখলী রজনী পবণ বহে মন্দ
চৌদিশে হিমকর, হিম করু বন্দ।

…সেই আমার প্রথম দেশী ছবি 'শুক্লাভিসার'।"

শুক্লাভিসার ছবির সঙ্গেও আগাগোড়া গাঁথা ছিল কবিতার ১৪টি লাইন উপরে নীচে দু-ভাগ হয়ে। এর পর ধাপে ধাপে সার্থকতার দিকে এগিয়েছেন সবল হাতে, শক্ত পায়ে। তখনো ছবির উপাদান সংগ্রহ অথবা সঞ্চয় করে চলেছেন কবিতা ভাঁড়ার থেকেই। কবিতার প্রেরণা কৃষ্ণলীলা ছবিতে। কৃষ্ণলীলার পরে ঋতুসংহারে। ঋতুসংহারের পরে মেঘদূতে। কালিদাসের বর্ষা-বসন্ত, যক্ষের-বিরহ, অলকার প্রাসাদ, উত্তর মেঘ পূর্বমেঘের আলোছায়া, সবকিছুকেই তিনি জীয়ন্ত করছেন তুলির টানে, রঙের আভাসে-ইঙ্গিতে। আরো পরে, 'কচ ও দেবযানী'। এখানেও উৎসমুখে দাঁড়িয়ে আছে কবিতা, রবীন্দ্রনাথের 'বিদায় অভিশাপ'। 'ভারতী' পত্রিকায় চারু বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন—

"যিনি রবিবাবুর 'বিদায় অভিশাপ' পড়িয়াছেন, তিনি এই চিত্রের মাধুর্য দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন।"

প্রতিবাদ জানিয়েছিল 'সাহিত্য', যে-কোনো রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সৃজনের ক্ষেত্রে যে-কোনো রকম নতুন স্বাদ-ভঙ্গী-বক্তব্যের বিকট বিরোধিতা করাই ছিল যে-পত্রিকার মহান ব্রত অথবা সংকল্প। সেখানে, বলা বাহুল্য, মহাআড়ম্বরে বেজে উঠল নিন্দাবাদ।

"আমরা বহুবার 'বিদায় অভিশাপ' পড়িয়াছি এবং কাব্য সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছি। কিন্তু কচ ও দেবযানী চিত্রের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইতে পারিলাম না।

হয়তো আমরা চাষা, এ চিত্রের মাধুর্য্য উপভোগ করিতে অক্ষম।…"

কচ ও দেবযানীতে যেমন রবীন্দ্রনাথ, 'রুক্মিণীর পত্র লিখন'-এ তেমনি মাইকেল মধুসূদন। 'বীরাঙ্গনা কাব্য' থেকে বেছে নিয়ে ছিলেন এ ছবির বিষয় এবং আবেগ।

এর পরের পর্বে এল ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ। রুবাইয়াৎ-এ পৌছবার আগে হাফেজ-এর ছায়া পড়েছিল একাধিক ছবিতে। রুবাইয়াৎ নিয়ে ছবি আঁকলেন মোট বারোটা। না নিজেকে, না কোনো পূর্বসূরীকে অনুসরণ করলেন এখানে। এ যেন আনকোরা নতুন, পিতৃমাতৃহীন।

"In the illustrations of Omar Khayyam we see for the first time Abanindranath's work showing a definite individual style. This series is a land mark in Abanindranath's style. For the first time we see texture, atmosphere, deep interest in portraiture and dramatic expression." বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়।

এর পরের ধাপে চণ্ডীমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল। দেখা গেল কবিতায় সারল্য এবং বলিষ্ঠতা তার ছবিকেও ভরিয়ে দিয়েছে এক ভিন্ন জাতের তেজে, দীপ্তিতে, দৃঢ়তায়।

"কৃষ্ণমঙ্গল সিরিজ, কবিকঙ্কন সিরিজ যখন রচনা করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, তখন ভাবলোক থেকে কঠিন আকার সম্বন্ধে শিল্পী অনেক বেশী সচেতন। মনে হয় যেন শিল্পীর সকল উপলব্ধি দৃঢ়বদ্ধ রঞ্জিত আকারে রূপান্তরিত হয়েছে। উজ্জ্বল সংঘাতপূর্ণ বর্ণের প্রয়োগে এই সময়ের চিত্র রঞ্জিত মূর্তির কথা মনে করিয়ে দেয়। পশুপক্ষী, গাছ একত্রিত হয়ে প্রাণময় গতিপ্রবাহ এই সময়ের রচনার সর্বপ্রধান আবেদন।…এই চিত্রাবলী রচনার কালে অবনীন্দ্রনাথ আঙ্গিকের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করেননি। মেজাজ অনুযায়ী জল রঙ, প্যাস্টেল, চারকোল, মিশিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হননি তিনি।…

এই সব চিত্র রচনাকালে অবনীন্দ্রনাথ যে অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন সেক্ষেত্রে বিষয়াশ্রিত বস্তু, ভাব অপেক্ষা ভঙ্গী, বর্ণের তরলতা অপেক্ষা কঠিনতা, মাধুর্য অপেক্ষা গাম্ভীর্য দর্শকের মনে যে ভাব জাগায় সেখানে আবেগ সর্বপ্রধান। বুদ্ধিমার্গীয় চিন্তার কোন অবকাশ নেই।" বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়।

কবিতার বিষয়গত আবেগের সঙ্গে তাঁর শিল্পকলারও ভঙ্গী এমনি করেই বদলে গেছে বারেবারে। আমরা সহজেই বুঝতে পারি কবিতার যথার্থ অনুভূতিকে স্পর্শ করার মতো সংবেদনশীলতা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কতখানি তাজা ছিল তাঁর ভিতরে। মঙ্গলকাব্যের আগেই হাত দিয়েছিলেন গীতাঞ্জলি আর Fruit Gathering এর অলঙ্করণে। ইংরেজী গীতাঞ্জলির জন্যে ছবি এঁকেছিলেন ৫টা। Fruit Gathering জন্যে ৭টা। সেখানে ভিন্ন অবনীন্দ্রনাথ। কবিতার মর্মস্বরের সঙ্গে ছবির মর্মবাণীকে একতানে জুড়ে দিলেন স্বচ্ছন্দে, অবলীলায়।

এসব ছাড়াও রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণব কবিতার কাছ থেকে কত যে উপকরণ কুড়িয়েছেন, তার শেষ নেই। এক রাধাকেই তো সাজিয়েছেন কত সাজে। তাঁর প্রথম যে রাধাকে দেখলুম 'কৃষ্ণলীলা' সিরিজের ছবিতে, সে যেন ঈষৎ রুগ্ন, শ্রীহীন, যেন রাধা নয়, রাধার খসড়া। সেই খসড়া থেকেই রূপ বদলে বদলে জন্ম নিতে লাগল নতুন নতুন রাধা।

কবিতার চিত্রকর যে অবনীন্দ্রনাথ, তাঁর সম্পর্কে আমাদের জানা হল অনেক। কিন্তু এত জানার পরেও প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, প্রমাণিত হল কি যে তিনি কবি? উত্তর একটাই। না। কবিতা বুঝে ওঠা বা কবিতায় প্রাণিত হওয়া আর কবিতা রচনা করা, দুই স্বতন্ত্র ভুবন। দুয়ের মাঝখানে স্থির সুনিশ্চিত কোনো সেতু নেই। রস নিংড়ে কবিতা পান আর নিজেকে নিংড়ে কবিতার রস ঝরানো, দুয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান রয়েছে বলেই কবি উপাধির রাজমুকুট সকলের মাথায় গিয়ে পৌঁছয় না। তাই দেখা যায়, সকলে নয়, জীবনানন্দের নির্দেশমত কেউ কেউ মাত্র কবি।

তাহলে? অবনীন্দ্রনাথকে আমরা কবি বলবো প্রত্যয় অথবা প্রমাণের কোন্ শক্ত জমিতে পা রেখে? অথবা আরও সরল করে নেওয়া যাক প্রশ্নটাকে। 'কবি অবনীন্দ্রনাথ' বলতে পারি অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে এমন কোনো ভিন্ন অস্তিত্ব সত্যিই আছে কি কোনোখানে?

এর সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত উত্তর, আছে। সবচেয়ে বিশ্বস্ত উত্তর, আছে, খুঁজে নিতে হবে। শীতের দিনের পা পযন্ত ঝোলানো শালের নকশা আমাদের চোখের সীমানা থেকে সরিয়ে রাখে অন্য সব পরিধানের শ্রী-সৌন্দর্য। অবনীন্দ্রনাথের সৃষ্টির বেলাতেও ঘটেছে তেমনি। তাঁর শিশুসাহিত্যটাই মহামূল্য শালের মতো আমাদের চোখের সামনে চার প্রহর ধরে পাতা। আর তারই জৌলুষে ঢাকা

পড়ে গেছে তাঁর বাকী সব কৃতিত্বের কারুকাজ।

অবনীন্দ্রনাথের কবিতার প্রতি আমাদের ঔদাসীন্যতাই উল্লেখযোগ্য। ঔৎসুক্যটা নগণ্য। তাঁর গদ্য কবিতার ছন্দ এবং ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়ে প্রথম আলোচনার সূত্রপাত করেছেন যে দুজন সমালোচক, সৌভাগ্যবশত তাঁরা দুজনেই কবি। অশোকবিজয় রাহা এবং শঙ্খ ঘোষ। অবশ্য এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আরও একজন কবিকে, শিশুসাহিত্যের সর্ববাদীসম্মত সম্রাটকে যিনি প্রথম সসম্মান আসন পেতে দিয়েছিলেন স্বীকৃত কবিদের সারিতে। এ ঘটনা ঘটেছিল, বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা'য়। অবশ্য সেখানেও চোখে পড়ে এক আশ্চর্য অঘটন। অবনীন্দ্রনাথের লেখা গদ্যকবিতার বদলে বুদ্ধদেব তাঁর সঙ্কলনের জন্যে বেছে নিয়েছিলেন 'আলোর ফুলকি'র একটুকরো মন্ত্রময় অংশ। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যই যে কবিতা, তার একটা চাক্ষুষ প্রমাণ বাংলা কবিতানুরাগীদের চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলাটাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য।

আমাদের সাহিত্যে গদ্য কবিতার যিনি প্রথম সার্থক স্রষ্টা, শুনলে অবাক লাগে, সেই রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যে গদ্যকবিতার প্রথম ফসল ফলানোর জন্যে উত্তেজিত করেছিলেন নিজেকে নয়, এমন দুই ব্যক্তিকে, যাঁরা দুজনেই জাদুকর। একজন ছন্দের। তিনি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। আরেকজন রূপ, রেখা ও রঙের। তিনি অবনীন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথ সাগ্রহে সায় দিয়েছিলেন এ প্রস্তাবে, কিন্তু ঘাড় পাতেননি কাজে। অবনীন্দ্রনাথ জানতেন কবিতার এই শুকনো ডাঙায় হাঁটতে গেলে গলায় বরমাল্যের বদলে কপালে কলসীর কানা জোটারই সম্ভাবনা বেশী। তবুও যে তিনি কোমর বেঁধে সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়লেন ছন্দ ভাঙার এমন দুরূহ কাজে, তার কারণ সম্ভবত এই যে, লোকনিন্দা ততদিনে তাঁর কাছে আর নতুন কোনো উপদ্রব অথবা অন্তরায় নয়। চিত্রসৃষ্টির পর্বে পর্বে রক্ষণশীলদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং সৌজন্যহীন আক্রমণের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বড় নিবিড়।

"অবনীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতা রচনার একটুখানি ইতিহাস আছে, আর তা আমাদের এ-যুগের কবিতার শিল্প-বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। 'পুনশ্চ'-র ভূমিকা থেকে জানতে পারি, গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ 'কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে' দেখে রবীন্দ্রনাথের মনে একটা প্রশ্ন জেগেছিল. 'পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে…বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কিনা'। প্রথমে তিনি

সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেন এটা পরীক্ষা করে দেখতে। সত্যেন্দ্রনাথ 'স্বীকার করেছিলেন কিন্তু চেষ্টা করেননি।' তখন রবীন্দ্রনাথ নিজেই পরীক্ষা করেছেন, 'লিপিকার অল্প কয়েকটি কবিতায় সেগুলি আছে'—যদিও ছাপাবার সময় ছত্রগুলিকে পদ্যের মতো সজ্জিত করা হয়নি। এদিকে রবীন্দ্রনাথের 'অনুরোধক্রমে আবার অবনীন্দ্রনাথ এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মত এই যে, 'তাঁর লেখাগুলি কাব্যের সীমার মধ্যে এসেছিল, কেবল ভাষাবাহুল্যের জন্যে তাতে পরিমাণ রক্ষা হয়নি।'…কিন্তু এ-ব্যাপারে অবনীন্দ্রনাথের নিজেরও একটা বড় কৃতিত্ব আছে ; গদ্য কবিতা সম্বন্ধে একটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনকেও দ্বিধা-মুক্ত করেছেন তিনি।" অশোকবিজয় রাহা

অবনীন্দ্রনাথের হাতে গদ্যকবিতা শরীর পেল কিন্তু আত্মা পেল না, অথবা জন্ম নিয়েও সাবালক হতে পারল না এটাও যেমন সত্যি, আবার তাঁর এই ব্যর্থতাই রবীন্দ্রনাথের নিজের সৃষ্টির বেলায় হয়ে উঠল এক নির্ভুল পথপ্রদর্শক এও তেমনি সত্যি। গদ্যকবিতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথম চেষ্টা, 'লিপিকা'। কিন্তু সেখানে তিনি কবিতার বাক্যগুলোকে পদ্যের ছন্দের সিঁড়ির মতো করে ভাঙেননি, ভাঙতে পারেননি নিতান্তই ভীরুতার বশে। দশ বছর পরে 'পুনশ্চে' পারলেন।

"কিন্তু তা মনে রেখেও এখানে আমি বলতে চাই যে, 'লিপিকা'র সঙ্গে 'পুনশ্চে'র কোনো অব্যাহত যোগ নেই, পরম্পরায় সম্পর্ক নেই, 'পুনশ্চ' ঠিক 'লিপিকা'র পরবর্তী পরীক্ষা নয়। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের এপারে-ওপারে দুই ভিন্ন রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পাই আমরা ; প্রথম পর্বে যিনি একের পর এক তৈরি করেছিলেন নানারকম বন্ধনের চারুতা, দ্বিতীয় পর্বে তাঁর কাজ চলছিল কেবলই সেই বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেওয়ার আয়োজনে। পদ্য ছন্দেরও বাঁধন তিনি কাটতে শুরু করেছিলেন 'বলাকা' থেকে। 'বলাকা'য় সমিল মুক্তবন্ধ আর 'বাঁশি' ধরনের রচনায় অমিল মুক্ত বন্ধনের পর ছন্দমোচনের আর একটি স্তর রইল বাকি, আর সেই স্তরটিই সম্ভব হলো 'পুনশ্চ'তে। এই সম্ভাবনার পূর্বমুহূর্তে তাঁকে দেখে নিতে হচ্ছিল অবনীন্দ্রনাথের চর্চা আর বিফলতার প্রকৃতি, বুঝে নিতে হচ্ছিল কোনখান থেকে সরে আসতে হবে তাঁকে।…তাই গদ্যকবিতায় অবনীন্দ্রনাথের এই যাওয়া আর ফিরে আসাকে গণ্য করতে হয় তাঁর পদ্য রচনারই অনুষঙ্গ হিসেবে। উল্টো দিকে, সেই একই সঙ্গে এই বৃত্তান্ত আমাদের কাজে লাগে,

হয়তো রবীন্দ্রনাথের কবিতাচর্চারও একটা নেপথ্য অধ্যায় বুঝে নেবার জন্যে।"

শঙ্খ ঘোষ

১৩৩৪। বিচিত্রার শ্রাবণ সংখ্যায় ছেপে বেরোল অবনীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দের প্রথম কবিতা, 'পাহাড়িয়া'।

"জেগে ওঠার কিনারায় কিনারায় সুরের পাড় বোনে পাখী
একটা পাখী, না-দেখা পাখী, কানে-শোনা পাখী!
উত্তর পাহাড়ের নিঃশ্বাস মন্ত্র আগলে রাখে
কুয়াসার জাদু দিয়ে;
পাখীকে চিনতে দেয় না, দেখতে দেয় না।..."

কিন্তু শ্রাবণে কবিতা ছাপানোর আগে আষাঢ়ের বিচিত্রায় আরও একটা কাজ করে বসলেন তিনি। লিখলেন গদ্য-ছন্দের আগমনী, প্রবন্ধের আকারে। নাম, 'নতুন ও পুরনোর ছন্দ'।

"সৃষ্টি হবার বেলায় গাছ ধরলে নতুনের ছন্দ, কিন্তু ফুল ফোটানোর ফল ধরানোর বেলায় ছন্দ বদল হল—গোড়াতে এল পুরোনো, আগাতে নতুন।"

তিনি জানালেন—

"পুরনো ডালে ধরা থাকে অগণিত নতুন জীবন-বিন্দু. গোপন ভাবে, পুরনোর কোল ছাড়ার উপায় নেই তাদের—যদিও তারা নতুন, সবাই প্রতীক্ষা করছে নব বসন্তের দূত এসে পৌছনোর।"

এই গদ্য ছন্দই বাংলা কবিতার পুরনো ডালে ছোঁয়াল নতুন বসন্তের হাওয়া, পুরনোর কোলে নতুন জাতের ফুল ফুটিয়ে।

বিচিত্রায় শ্রাবণ সংখ্যার পরই থেমে রইল না তাঁর কলম। বয়ে চলল, ব্যাকুল-আকুল ঝর্নার মতো। নীচে তার তালিকা।

পাহাড়িয়া। বিচিত্রা। শ্রাবণ। ১৩৩৪
রংমহল। বিচিত্রা। ভাদ্র। ১৩৩৪
হাটবার। বেনু। আশ্বিন। ১৩৩৪
তিন দরিয়া। বিচিত্রা। আশ্বিন। ১৩৩৪
আতসবাজি। উত্তরা। কার্ত্তিক। ১৩৩৪
আলোকশিখা। রংমশাল। ১৩৩৫

কোনও একটা সময়ে তাঁর গদ্য ছন্দের নদীতে এল ভাঁটার টান। কবি

অবনীন্দ্রনাথ চলে গেলেন অজ্ঞাতবাসে। তখনও কি বন্ধ হয়েছিল কবিতা লেখা? তখুনি কি ভুলে গেলেন ছন্দের বৃষ্টিতে নৌকো ভাসানো? না। কবি অবনীন্দ্রনাথ ছড়িয়ে পড়লেন তাঁর গদ্যে। যে-জোয়ার আগে বওয়াচ্ছিলেন একটা নির্দিষ্ট নদীর কূল-কিনারা ছুঁয়ে, এখন তাকে বইয়ে দিলেন গদ্যের মাঠ-ঘাট, ক্ষেত-প্রান্তর ভাসিয়ে, ডুবিয়ে, টইটম্বুর করে।

তাঁর কবিত্বের সঙ্গে চূড়ান্ত সাক্ষাৎকারের পরও আরও এক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া বাকি থেকে যায় যেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন, সঙ্গে সঙ্গেই অবনীন্দ্রনাথ হাতে তুলে নিলেন কলম, আর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর কলমে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল কবিতা, বিষয়টা কি সত্যিই জল পড়লে পাতা নড়ার মতো সহজ এবং যান্ত্রিক? নাকি এর উত্তর লুকনো আছে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের আত্মনির্মাণের কোনো গভীর আরাধনার আড়ালে?

পৃথিবীর শিল্প ইতিহাসের দিকে তাকালে বারংবার আমাদের চোখে পড়ে এক আশ্চর্য ঘটনা। যিনি শিল্পী তিনি কখনোই নিজেকে আটকে রাখতে পারছেন না আত্মপ্রকাশের জন্যে নির্বাচিত একটি মাত্র মাধ্যমে। তাঁকে অবিরল হাতছানি দিয়ে চলেছে অন্য শিল্পরূপ। এমন তো নয় যে, অবিরল ছেনী-হাতুড়ী ঠুকে ঠুকে ব্যর্থ হয়েছিলেন মাইকেলেঞ্জেলো মনের ছবিকে পাথরে ফোটাতে। তবুও তাঁকে সইতে হলো নির্মাণের আরেক প্রস্থ দহন. কবিতার দিকে হাত বাড়িয়ে। এই ভাবেই পাই ব্লেক, রসেটি, পিকাশো, পল ক্লী, ককতো, ডালিদের; যাঁদের দু-হাতে দু-রকমের মন্দিরা, ছবি এবং কবিতার।

ইতিহাসের আরও পিছন দিকে হাঁটলে চোখে পড়বে শিল্পী এবং কবির এই যুগ্ম সত্তার আরও সব নিদর্শন। প্রাচীন চীনে যেমন, প্রাচীন জাপানেও তেমনি এক সময়কার শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা ছিলেন কবিও। তাঁদের আখ্যা ছিল শিল্পী-কবি। চীনের ওআঙ উই, সুতুং পো আর জাপানের কোবো দাইশি, কাজ্ঞান ওআনাবে এই গোত্রের শিল্পী। অবশ্য চীন-জাপানের বেলায় কবি-শিল্পীর এই যুগল-মিলন ঘটে যাওয়াটা অন্য দেশের চেয়ে অনেক বেশী স্বাভাবিক। লেখার আর ছবির জন্যে ওঁদের হাতে তো একই তুলির টান। ওঁদের তুলিতে ছবিও কবিতা, কবিতাও ছবি।

এখন আমরা সহজেই বিশ্বাস করতে পারি, অবনীন্দ্রনাথের কলমে কবিতার ফুলকি কোনো আকস্মিক উত্তেজনার ফলাফল নয়। সম্ভবত যে-সময়ে 'অগ্নি-উপাসক' অনুবাদ, কবিতার আগুন তখন থেকেই তাঁর আবেগের অন্তরঙ্গ সঙ্গী।
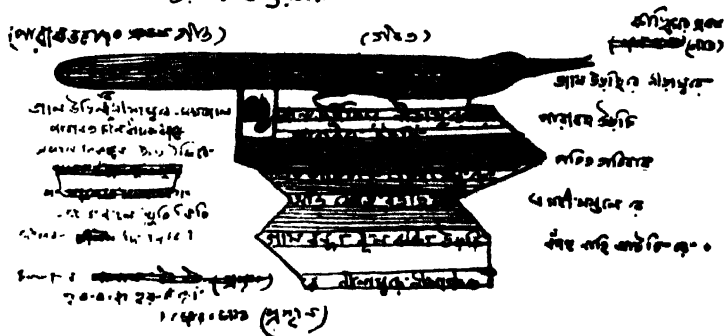
মিল-অমিলের ছন্দ

বিষয় ছিল, বোদলেয়ার। আলোচনার প্রথম স্তরে এলিয়ট বললেন, বোদলেয়ারকে সঙ্গতভাবেই বলা হয়ে থাকে, 'a fragmentary Dante.' কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বোদলেয়ারকে দাঁড় করালেন গ্যেটের পাশে, যা আপাতদৃষ্টিতে শুধু অস্বাভাবিক নয়, অকল্পনীয়। অথচ তুলনার মুহূর্তে তিনি আদৌ বিস্মৃত হয়নি গ্যেটের 'healthiness' এবং বোদলেয়ারের 'morbidity.' এমনকি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেননি যে, এই তুলনা, 'may seem Paradoxical.' তবুও দুই ঘোরতর অমিলকে মেলালেন এক সূত্রে। সূত্রটা এই—

'Restless critical, curious minds and the 'sense of the age' ; both men who understood and foresaw a great deal'.

অবনীন্দ্রনাথ এবং জীবনানন্দের সমগ্র সৃষ্টিকর্মকে এই মানদণ্ডে চাপিয়ে আমরা কি পারবো দুদিকের পাল্লাকে সমান সমান করতে? সে বড় জটিল এবং

দুরূহ কাজ। সে-কাজে হাত লাগানোর আগে, এঁদের সৃষ্টির জগতকে নিয়ে বোঝাপড়াটাকে মুলতুবী রেখে, আমরা বরং ঘুরে তাকাই এই দুই স্রষ্টার ব্যক্তিগত জীবনধারার দিকে। অর্থাৎ কবিকে ছেড়ে মানুষকে ধরি।

একটু তদন্ত করলেই দেখা যাবে, কবিত্বে যত না, তার চেয়ে অনেক বেশী প্রাণবন্ত মিল এই দুটি মানুষের, সহজাত কুঁড়েমীতে। ঘর-কুণো বাঙালী বলতে যা বোঝায়, এঁরা দুজনই তার সর্বোত্তম উদাহরণ। প্রথমেই ধরা যাক অবনীন্দ্রনাথের কথা।

হাতের সামনে সুযোগ এসেছে অফুরন্ত, পৃথিবী পর্যটনের। সব ঠেলেছেন পায়ে। এমনকি সমস্ত ভারতবর্ষটাকেও দেখেননি ঘুরে-ফিরে। তাঁর সব চেয়ে দূরের পাড়ি, মুসৌরী, দার্জিলিং, মুঙ্গের। কাশ্মীর না, কন্যাকুমারিকা না, অজন্তা-ইলোরা না। কাশ্মীর যাননি। অথচ ছবি (Illustration) এঁকেছেন নিবেদিতার জন্যে, নিবেদিতার অনুরোধে, 'চার্ম অব কাশ্মীর'-এর। আগ্রার পাথরে পা পড়েনি তাঁর। তাজমহল দেখেননি চোখে। অথচ তাজমহলকে ঘিরেই তিন-তিনটে অবিস্মরণীয় ছবি। নিজের রচনায় তাজমহলের প্রসঙ্গ টেনেছেন নানা সময়ে। পুরী-কোণারকে গিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু পুরীতে না পৌঁছেও সমুদ্র-দর্শন করেছেন একবার। জোড়াসাঁকোর দক্ষিণের বারান্দায় বসে।

"সেবার আমরা অনেকজন এসেছি পুরীতে। বাবা-মা কলকাতাতেই আছেন। আমাদের সঙ্গে এসেছিলেন আমার এক কত্তা-মা। কলকাতা থেকে পুরীতে বাবা আমাদের সমুদ্র-স্নানের ছবি এঁকে পাঠিয়েছিলেন। আশ্চর্য হয়ে দেখলুম, আমার স্বামী কত্তা-মাকে যেভাবে ধরে স্নান করাচ্ছেন, এবং আমি যেমন করে ঢেউ নিচ্ছি, সমস্ত দৃশ্যটাই হুবহু।"

উপরের কথাগুলো অবনীন্দ্রনাথের বড় মেয়ে উমা দেবীর। তাঁর 'বাবার কথা' নামের বইটি থেকে আরও একটা ঘটনার উল্লেখ করছি, যাতে আরো স্পষ্ট করে চেনা যাবে এই ঘর-আগলানো মানুষটাকে।

"তখন দিদিমা মারা গেছেন, মার ইচ্ছে হলো তীর্থ করতে যাবেন। বাবা বললেন, 'যেতে হয়, তুমি মণিলাল কি অলকাকে নিয়ে চলে যাও। আমি যাব না।'

মা তাই করলেন। একবার মণিলালকে সঙ্গে নিয়ে আর একবার অলকাকে সঙ্গে করে পশ্চিমের দিকে সব ঘুরে এলেন—মথুরা, বৃন্দাবন, সাবিত্রী, পুষ্কর,

স্বপ্নপ্রয়াণ।

সুপ্তিতে ডুবিয়া গেল জাগরণ,
সাগর-সীমায় যথা অস্ত যায় জলন্ত-তপন।
স্বপন-রমণী
আইল অমনি,
নিঃশব্দে যেমন সন্ধ্যা করে পদার্পণ॥

সুকোমল চরণ-কমল দুটি
ছোঁয় কি না-ছোঁয় মাটি, আঁচল ধরায় পড়ে লুটি';
করে পদ্ম-ফুল
কেশে দুল-দুল,
অলসিত আঁখিসম আধো-আধো ফুটি' ॥

স্বপ্নপ্রয়াণ-এর রেখাচিত্র

বিম্ববতী।

(রূপকথা।)

যতনে সাজিল রাণী, বাঁধিল কবরী,
নব ঘন স্নিগ্ধবর্ণ নব নীলাম্বরী
পরিল অনেক সাধে। তার পরে ধীরে
গুপ্ত আবরণ খুলি' আনিল বাহিরে
মায়াময় কনক দর্পণ। মন্ত্র পড়ি'
শুধাইল তারে—কহ মোরে সত্য করি'
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপসী কে ধরায় বিরাজে।
ফুটিয়া উঠিল ধীরে মুকুরের মাঝে
মধুমাখা হাসি-আঁকা একখানি মুখ,
দেখিয়া বিদারি' গেল মহিষীর বুক—
রাজকন্যা বিম্ববতী সতীনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার রেখাচিত্র

আগ্রা, দিল্লি, ফতেপুর সিক্রী, জয়পুর, লক্ষ্ণৌ ইত্যাদি। সেই সব দেখে আসবার পর মা একদিন বাবাকে বললেন, 'তুমি কি করে অমন ছবি এঁকেছো? আমি দেখে এলুম ও যে সব ঠিক তোমার আঁকা ছবির মত!"

বাবা তাঁর স্বভাবসুলভ মজা করে বললেন, 'তুমি চর্মচক্ষে যা দেখে এলে, আমি মর্মচক্ষে তা দেখতে পেয়েছি। তুমি এত খরচ করে হাঙ্গামা পুইয়ে দেখে এলে, আর আমি এই বারান্দায় বসে আগেই সব দেখে নিয়েছি। তবেই বোঝো, তোমার চেয়ে আমার পুণ্য কত বেশী।"

এমনিতে মজলিসি মানুষ। গল্প বলার রাজা। মুখের কথা যেন কবিতার ছন্দ। কিন্তু সেই মানুষই ঘরের বাইরে সভা-সমিতি অথবা বক্তৃতার নাম শুনলে অন্যরকম। না-যেতে, না-বলতে পারলেই বাঁচেন যেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পকলার উপর বক্তৃতা দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে স্যার আশুতোষ যখন তাঁর কাছে এলেন, গোড়াতে রাজীই হননি একদম।

"বক্তৃতা শুনে কে আবার ইঁট-পাটকেল ছুঁড়বে, আমি ওতে নেই। আর তা ছাড়া আমার প্রতি বছর চেঞ্জে যাওয়া চাই, ও আমার হবে না।"

পুত্র অলকেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'ছবির রাজা ওবিন ঠাকুর'-এ আবার অন্য একটা অজুহাতের খবর।

"প্রথমে শারীরিক অসুস্থতার অজুহাতে কিছুতেই তিনি রাজী হননি। শেষে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিজে এসে বিশেষ অনুরোধ করায় পাঁচ বছরের জন্যে কাজে যোগ দিলেন।"

১৯১১। রাজা পঞ্চম জর্জ আর রানী মেরী এসেছেন ভারত ভ্রমণে। দিল্লি থেকে কলকাতায়। রাজদম্পতি জানালেন, দেখতে যাবো সরকারী আর্ট স্কুলের গ্যালারী। অবনীন্দ্রনাথ তখন সরকারী আর্ট স্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপাল। তাঁর উপর ভার পড়ল, রানীর 'স্যাপেরন' হয়ে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ছবি দেখানো, ছবি বোঝানো। যথাসময়ে রাজা-রানী এসে উপস্থিত হলেন গ্যালারীতে। দুজনেই অবনীন্দ্রনাথের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন—হাউ ডু ইউ ডু।

"আমার প্রাণ তখন ধুক ধুক করতে লেগেছে। বেচারা ইণ্ডিয়ান আর্টিস্ট। এই সব কায়দা-কানুনে একেবারেই অনভ্যস্থ। আমি আমার কোণটার ভিতরে লুকোতে পারলেই বাঁচতুম সে সময়ে। আমার দুঃখ কুইন মেরী বোধ হয় বুঝতে পারলেন, তাই তিনি কথা চালিয়ে আমার সঙ্কোচ ঘুচিয়ে

দিলেন।"

প্রতিমা দেবীর 'স্মৃতি চিত্র' থেকে

এই হল অবনীন্দ্রনাথের মনের ভিতরকার চেহারা। ঘরের ভিতরে তিনি সজীব, জীবন্ত। বাইরের জনসমাজের পক্ষে একবিন্দু ঘরোয়া নন। ঘর ছেড়ে পা বাড়াতে গেলে অদৃশ্য কোনো শিকল যেন টান মারে। ছোট মেয়ে সুরূপা দেবীকে একবার লিখেছিলেন:

"যতই লোভ দেখাও, এখন কলকাতা ছেড়ে কোথাও নড়ছিনে—বেশ লাগছে কলকাতা, আহা! এমন স্থান কি আর আছে। কোথায় লাগে তোদের ঘাটশিলা—আহা—এই শহরের বাড়ি-ঘেরা দৃশ্য কি চমৎকার। সকালের একটু একটু কুয়াশার মধ্যে দিয়ে বাড়িগুলোর উপর দেখছি রোদ আর ছায়া পড়েছে, দেখাচ্ছে ঠিক যেন পর্বতের গায়ে আলো-ছায়ার ঝরনা ঝরছে।"

এবার আমরা ঘুরে তাকাবো জীবনানন্দের দিকে।

জন্ম বরিশালে। সেখানেই সুদীর্ঘ ছাত্রজীবন, ইণ্টারমিডিয়েট পর্যন্ত। ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি এ পড়তে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে। অধ্যাপনার প্রথম চাকরি সিটি কলেজে। সেখান থেকে বরখাস্ত হয়ে বাগেরহাট কলেজ। তারপর বছরখানেকের জন্যে দিল্লি রামযশ কলেজে। সেখান থেকে বরিশালে ফিরে গিয়ে ব্রজমোহন কলেজে। তারপর দাঙ্গা আর দেশ-বিভাগের ক্ষতচিহ্ন বুকে নিয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন হল যখন, জন্মভূমির সঙ্গে নাড়ির বাঁধন ছিঁড়ে শোকার্তের মতো চলে এলেন কলকাতায়, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যে কলকাতা এরপর হয়ে উঠবে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন বাসস্থান। ব্যতিক্রম হিসেবে মাঝখানে রয়েছে কেবল কয়েক মাসের জন্যে খড়্গপুরের চাকরি। এই সীমাবদ্ধ পরিসরের বাইরে ছুটি-ছাটায় তিনি অন্য কোথাও, দূরে কোথাও নিছক ভ্রমণের তাগিদে পাড়ি দিয়েছিলেন কিনা, সে সম্পর্কে আমাদের জানার আগ্রহ যতটা প্রবল, জানবার উপাদান-উপকরণ ঠিক ততটাই বিরল। আজ পর্যন্ত তাঁর কোনো পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখা হয়নি। সহধর্মিণী লাবণ্য দাশের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ 'মানুষ জীবনানন্দ' বইটিতে আমরা তাঁকে দেখতে পেয়েছি অনেকখানি ঘরোয়া চেহারায়। কিন্তু সেখানেও ঘরের বাইরে দূর-ভ্রমণের উল্লেখ নেই কোনোখানে। কেবল দেখতে পাওয়া গেছে একটি পারিবারিক গ্রুপ ফোটো, দিল্লির রাজঘাটে তোলা। অশোকানন্দ দাশ-এর মারফৎ-এ তাঁর ভ্রমণের একটা দীর্ঘ তালিকা পেয়ে যাই যদিও, কিন্তু কবির রচনায় তাদের ছাপ পড়েনি হয়তো এই জন্যেই যে

সেটা ছিল তাঁর নিতান্তই বাল্যকাল। তার উপরে তিনি ছিলেন ঘোরতর অসুস্থ।

"খুব ছেলেবেলায় কঠিন অসুখ হল জীবনানন্দের। প্রায় জীবনমরণ সমস্যা। কুসুমকুমারী মুমূর্ষু সন্তানকে নিয়ে ঘুরলেন বিভিন্ন স্বাস্থ্যনিবাসে। জলবায়ুর জনপদে, লক্ষ্ণৌ আগ্রা দিল্লিতে। সঙ্গে ছিলেন জীবনানন্দের দাদামশায় চন্দ্রনাথ। দীর্ঘদিন পশ্চিমে থেকে ছেলেকে সুস্থ করে, পরিবার-পরিজনের মতে অসচ্ছল অবস্থার মধ্যে এক আত্মঘাতী ভ্রমণের পর, কুসুমকুমারী বরিশালে ফিরলেন।"

প্রভাতকুমার দাস

এদিক-ওদিক থেকে, তার সম্পর্কে আর যা-কিছু আমরা জানতে পারি, তাতে অবনীন্দ্রনাথের মতই আর একটি সভা-সমিতি আর বক্তৃতা-বাগ্মীতাকে ভয়-পাওয়া সমাজ-ভিতু অথবা জনতা-দুর্বল মানুষের আদলই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে আমাদের চোখের সামনে।

"In his dealing with people, he always found it hard to communicate, as even an admirer like Buddhadev Bose confirms ; in fact his face was, more often then not, a mask which very few ever penetrated. No wonder people failed to understand him. Certainly it was a life far removed from the Tagorian model of tranquil unity and all-pervasive synthesis. It was much more typical of the contemporary period, with its tensions, its alienations, its secret core of pain, its disbelife, and disillusion." Chidananda Dasgupta.

"কবে কোথায় জীবনানন্দকে প্রথম দেখেছিলাম মনে পড়ছে না। পাঁচ মিনিট দূরে থেকেও 'কল্লোল'-আপিসে তিনি আসতেন না, কিংবা কদাচ আসতেন। অন্তত আমি তাঁকে কখনো সেখানে দেখিনি। হ্যারিসন রোডে তাঁর বোর্ডিঙের তেতলা কিংবা চারতলায় অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে একবার আরোহণ করেছিলাম মনে পড়ে, আর একবার কলেজ স্ট্রীটের ভিড়ের মধ্যে আমরা কয়েকজন তাঁকে অনুসরণ করতে করতে বউবাজারের মোড়ের কাছে এসে ধরে ফেলেছিলাম।

...আসলে জীবনানন্দের স্বভাবে একটা দুরতিক্রম্য দূরত্ব ছিলো—যে

অতিলৌকিক আবহাওয়া তাঁর কবিতার, তা-ই যেন মানুষটিকে ঘিরে থাকতো সব সময়—তার ব্যবধান অতিক্রম করতে ব্যক্তিগত জীবনে আমি পারিনি—সমকালীন অন্য কোনো সাহিত্যিকও না। এই দূরত্ব তিনি শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন ; তিন বা চার বছর আগে সন্ধেবেলা লেকের দিকে তাঁকে বেড়াতে দেখতাম—আমি হয়তো পিছনে চলেছি, এগিয়ে গিয়ে কথা বললে তিনি খুশিও হতেন, অপ্রস্তুতও হতেন, আলাপ জমতো না ; তাই আবার দেখতে পেলে আমি ইচ্ছে করে পেছিয়েও পড়েছি কখনো কখনো, তাঁর নির্জনতা ব্যাহত করিনি। কখনো এলে বেশীক্ষণ বসতেন না, আর চিঠিপত্রেও তাঁর সেই রকম স্বভাব-সঙ্কোচ। যুদ্ধের তৃতীয় বা চতুর্থ বছরে আমরা একবার একটা পাক্ষিক সাহিত্য-সভার ব্যবস্থা করেছিলুম ; তাতে, এ আর পি-র কর্মভার সত্ত্বেও, সুধীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে আসতেন, কিন্তু জীবনানন্দ এসেছিলেন একবার মাত্র ; এসে, একটি কবিতা পড়ার জন্যে বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে অথবা তারই ফলে আমাদের একটু অপ্রস্তুত করে দিয়ে আকস্মিকভাবে বিদায় নিয়েছিলেন।"

বুদ্ধদেব বসু

এই প্রসঙ্গে তাঁর আরো এক বন্ধুপ্রতিম কবি, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সাক্ষ্য আমাদের সহায়তা করবে, তাঁর অন্তর্গত স্বভাবটিকে বুঝে নিতে। দুজনের একবার দেখা হয়েছিল আকাশবাণীর পুরনো বাড়িতে।

"তখন তিনি কায়মনে অসুস্থ। কিন্তু সভায় গিয়েছিলেন, সম্ভবত শুধু প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে দেখা হবে বলে। তিনি কবিসভায় আহূত ছিলেন। কিন্তু জানিনে কী কারণে, তিনি অনুপস্থিত।...জীবনবাবু আর কারো সঙ্গে কথা বলছিলেন না, বারবার শুধু আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন : 'প্রেমেন এল না কেন?'...আমি জীবনানন্দের সেই উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে আহত হয়েও ভাবতে পারিনি যে, তাঁর দিন আসন্ন। এই সাংঘাতিক অন্যমনস্কতাই তাঁর কাল হল—বাড়ির সামনে তিনি ট্রামে চাপা পড়লেন।

অন্যমনস্ক জীবনানন্দ এমনিতেই একটু ছিলেন। রাস্তায় বুদ্ধদেব বসু পেছন থেকে ডেকে তাঁর সাড়া পাননি—এমন ঘটনাও আছে। পাশাপাশি গণেশ এভিনিউতে হেঁটে দেখেছি, একটি কথাও বলছেন না বা হঠাৎ কী মনে হওয়াতে জোরে হেসে উঠলে হয়তো।"

কবি জীবনানন্দ

অনুমান করতে অসুবিধে নেই যে, এই অন্যমনস্কতা অথবা একটা আধুনিক

শহরের জটিল যান্ত্রিকতা সম্বন্ধে পরিপূর্ণ উদাসীনতাই তাঁর অমন আকস্মিক এবং শোচনীয় মৃত্যুর কারণ। অথচ এটাও সত্য নয় যে, ব্যক্তিস্বভাবের বাইরে, কবিস্বভাবে তিনি এই শহর সম্বন্ধে উদাসীন। বরং ঠিক তার বিপরীত। তাঁর কবিতায় কলকাতা নামের শহর তার যাবতীয় নাড়ী-নক্ষত্র নিয়ে উপস্থিত।

আসলে গোড়া থেকেই জীবনানন্দ দুটো মানুষ। একটা গোপন। একটা উন্মুক্ত। জনসমাজের পক্ষে তিনি বেছে নিয়েছিলেন নিজের অজ্ঞাতবাস। সমাজ সম্বন্ধে ছিল তাঁর আশ্চর্য এক ভীতিময় সংস্কার। কারণ আত্মমর্যাদাবোধ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন গভীরতর সজাগ।

"কথায় কথায় একদিন জিজ্ঞাসা করেই বসলাম

—কারও বাড়ি যান না কেন ?

—কেন যাই না ? এই জন্যে যে যাদের বাড়ি যাব, তারা তো বিরক্ত বা বিব্রত হতে পারে।

—কেন তারা তো আনন্দিতও হতে পারে ?

—আমোদ আর আনন্দ বুঝি এক জিনিষ ?…আপনি কি করেন ?

—আমি সব জায়গায় যাই। আমার মাথা ছোট, সব দরজাতেই ঢোকে।

—কিন্তু লৌহকপাট খোলা থাকলেই কি ঢুকতে পারেন ? সে খোলা দরজার সামনে যদি থাকে ছোট ছোট কাঁটা ছড়ানো উন্নাসিকতার, আভিজাত্যের, আত্মাভিমানের।

এতক্ষণে পরিষ্কার হল ব্যাপারটা। তবু জিজ্ঞাসা করলাম

—তার মনে ?

—মানে তো পরিষ্কার। সদর দরজা অনেকেরই খোলা থাকে। কিন্তু তা ঘেরা থাকে অদৃশ্য উঁচু প্রাচীর দিয়ে। কোথাও বা প্রাচীরটি অর্থের কোথাও বা অহঙ্কারের। তাই তো আমি আমার অভ্যাসের প্রাচীর ভাঙতে পারি না।"

অচিন্ত্যকুমার ঘোষ

জনতা অথবা জনসমাগম থেকে দূরে থাকাটাই হয়ে গিয়েছিল তাঁর মজ্জাগত অভ্যাস। আবার এই জনতাকেই যখন মনে হয়েছে আপন এবং যথার্থ অনুরাগী, তখন গা থেকে ছেড়ে ফেলেছেন আত্মগোপনের ছদ্মবেশ।

"নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোক্তারা রবীন্দ্র জন্মোৎসবের সময়, প্রত্যেক বছর একজন শ্রেষ্ঠ কবিকে বিশেষ 'রবীন্দ্র পুরস্কার' দেওয়ার ব্যবস্থা

করেছিলেন। নগদ একশত টাকার সঙ্গে একটি তসরের চাদর আর একটা ডালায় কিছু ফল আর মিষ্টি নির্বাচিত কবিকে উপহার দেওয়ার প্রথা ছিল। জীবনানন্দ ১৩৫৯ সালে প্রকাশিত 'বনলতা সেন'-এর সিগারেট সংস্করণের জন্য এই পুরস্কার পেয়েছিলেন। মহাজাতি সদনের জনসমাগমে কবিকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের পর কয়েকটি কবিতা পড়তে অনুরুদ্ধ হয়ে কবি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করেন। বারবার জিভ দিয়ে বিন্যস্ত ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন করতে করতে বিব্রতপ্রায় কবি একটি কবিতা পড়ে সেদিনের মত যেন কোন রকমে আত্মরক্ষা করেছিলেন। অবশ্য সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন একজন এমন কেউ, তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বলেছিলেন—সেদিন মহাজাতি সদনে গানের জলসার বিশেষ ব্যবস্থা থাকায় শ্রোতাদের আগ্রহ কবিতার চেয়ে গানের দিকেই বেশি, এই অনুমান করে নিজেকে কিছুটা গোপন করতে চাইলেন কবি। অথচ আশ্চর্য ; এই কবিই, পরে সেনেট বিল্ডিং-এ আহূত কবি সম্মেলনে, জনতার সশ্রদ্ধ উল্লাস এবং উচ্ছ্বাস অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে কি স্বচ্ছন্দ সুললিত কণ্ঠে স্বরচিত কবিতা পড়ে গিয়েছিলেন একটার পর একটা। তেমন কোন ভয় বা ক্লান্তি ছিল না সেদিন। আসলে তিনি বুঝে আনন্দ পেয়েছিলেন তাঁর কবিতার সহৃদয় পাঠকের সংখ্যা বাড়ছে,"

প্রভাতকুমার দাস

দ্বিতীয় দফার অর্থাৎ উন্মুক্ত জীবনানন্দের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য সংবাদ পাই আমরা তার আত্মীয়-স্বজনের মারফৎ। বোন সুচরিতা দেবী লিখছেন—

"দাদার সম্পর্কে অনেক জনশ্রুতি প্রচলিত। তিনি জীবন থেকে পালিয়েছেন। তিনি মানুষের সখ্য সহ্য করতে পারতেন না। তিনি নির্জন, তিনি নিরিবিলি। সব কোলাহল থেকে দূরে। এ সব বাক্য-গঠনের সত্য-সততা কতটুকু তা আমার বিবেচ্য নয়, যদিও এ-সবের অনেকগুলোই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে এতদিনে। তবু না বলে উপায় নেই, দাদা একটু সস্নেহ আশ্রয়ের জন্যে কিঞ্চিৎ অসহায় ছিলেন আজীবন। তাঁর নিজের অস্তিত্ব ও তাঁর জন্যে প্রয়োজন-অপ্রয়োজন-গুলোকে যেন তিনি একা গুছিয়ে নিতে পারতেন না, যেন সব এলোমেলো হয়ে যেতো হারিয়ে হারিয়ে যেতো, অথচ তিনি অগোছালো থাকতে ভালবাসতেন না।···বাইরে থেকে যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, তাঁরা তাঁকে গম্ভীর, নির্জন স্বপ্ন-লোকবাসী বলেছেন, বলেছেন সর্বক্ষণ একটা অদৃশ্য দূরত্বের বেষ্টনী তৈরী করে তাঁর নিজের চারিদিকে তিনি সবার থেকে আলাদা হয়ে থাকতেন। কিন্তু কত

সময় দেখেছি, স্বপ্নলোক থেকে নেমে এসে হাসি পরিহাসে, কৌতুকে গল্পে কেবলমাত্র আমাদের সঙ্গেই নয়, বাইরেও যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে যেতে সংকোচ করেনি তাঁদের সঙ্গে এক হয়ে যেতেন। এত মজার মজার কথা বলতে পারতেন যে, হেসে কুটিপাটি হয়ে যেতে হোত। যে মানুষ অত গুরুগাম্ভীর্যের কবিতা লিখতেন, তিনি যে অমন চারিদিক উচ্চকিত করে প্রকম্পিত হাসি হাসতে পারতেন বা অন্যকেও হাসিয়ে হাসিয়ে ক্লান্ত করে দিতে পারতেন, তা যেন না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

পরিহাস ও কৌতুকপ্রিয়তা আমার মাতুল বংশের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে বোধ হয় লাভ করেছিলেন তিনি। আমার দাদামশায় ৺চন্দ্রনাথ দাশ খাঁটি পূর্ববঙ্গের ভাষায় বহু হাসির গান ও ছড়া রচনা করেছিলেন।”

ভাই অশোকানন্দের জবানাতেও কানে এসে বাজে তাঁর পরিহাসময় হাস্যোচ্ছ্বাস।

“তখন কলেজে পড়ছি, অক্সফোর্ড মিশন হোস্টেলে থাকি। দাদা বাইরে থেকে প্রায় দৌড়ে আমার ঘরে এসে একজন ধনী নামজাদা গম্ভীর প্রকৃতি অধ্যাপকের নাম করে বললেন যে, শীগ্‌গির দেখে যা, তিনি আমাদের হোস্টেলের সামনে দিয়ে সাইকেলে চড়ে যাচ্ছেন। সেই অধ্যাপক সাইকেলে চড়ে যাবেন, তা এতই অবিশ্বাস্য যে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখবার জন্য বাইরে এসে দেখি যে, মলিন শার্ট গায়ে দিয়ে একজন ভদ্রলোক সত্যি সত্যিই যাচ্ছেন, উপরি উক্ত অধ্যাপকের সঙ্গে যাঁর অবয়বের অনেক সাদৃশ্য আছে।...কলকাতার পার্কে মাঠে, যেখানেই হিউমারের গন্ধ পেতেন দাঁড়িয়ে যেতেন। অদ্ভুত অস্বাভাবিক সব কিছুই তাঁর রসিকতা জ্ঞানকে সুড়সুড়ি দিত। অকুস্থান থেকে একটু দূরে গিয়ে হাওয়ার মত হাসির ঝড় বইয়ে দিতেন।”

জীবনানন্দের এই হাওয়া-কাঁপানো ঝোড়ো হাসির প্রত্যক্ষদর্শী অনেকেই।

“ওঁর বাড়ি (কলকাতায়) গিয়েছি। দেখি শুয়ে আছেন। বললেন

—জ্বর হয়েছে।

জীবনানন্দ খাট ছেড়ে জানলার কাছে গেলেন। তাক থেকে একটা ওষুধ ভর্তি শিশি এনে বললেন

—ডাক্তার আমাকে এই ওষুধ খেতে দিয়েছে।

কি খেয়াল হল কে জানে, জীবনানন্দ শিশির ছিপি খুলে ওষুধের গন্ধ

শুঁকলেন। বললেন—

—দারুচিনির গন্ধ।

তারপর পথ্যের প্রসঙ্গ।

—আজ রাত্রে কি খাব?

আমি বললাম

—রুটি খান।

—ঠিক!

জীবনানন্দ ডান হাতের তর্জনী তুলে উঁচু করে বললেন

—ঠিক! ডাক্তারও আমাকে রুটি খেতে বলেছেন।

হেসে উঠলেন। নিজস্ব হাসি। অকস্মাৎ তিনি হেসে উঠতেন, প্রচণ্ড শব্দে। অকস্মাৎ হাসি থামাতেন। কখনো হাসির আগে, কখনো হাসির পরে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরতেন। যেন দুরন্ত হাস্য স্রোতকে ঠোঁটের ওপারে বন্দী করে ফেলতেন। বাঁধ ভেঙে হাসি যখন বেরিয়ে আসত, মনে হতো কী বিশাল আনন্দ ঐ হাসির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।" ইন্দ্র মিত্র

অন্য আর এক দৃষ্টান্ত।

"কলেজে একদিন তাঁর সঙ্গে কথা বলছি, এমন সময় এক প্রগতিশীল ছাত্র কবি হঠাৎ কথার মাঝখানেই তাঁকে প্রশ্ন করলে

—আপনি জনগণের কবিতা লেখেন না কেন?

জীবনানন্দবাবু এমন প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কয়েকবার তার এবং আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি আস্তে প্রশ্ন করলেন

—তুমি এই প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের মধ্যে আছো বুঝি?

সে বললে

—হ্যাঁ, অবশ্যই। আমরা এই সমাজ ব্যবস্থাকে বদলাতে চাই। কায়েম করতে চাই শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থা। সেখানে কবি, সাহিত্যিকরাও আমাদের সঙ্গে আসবেন। তাঁদের বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী পরিত্যাগ করে মার্কসবাদ যে নতুন পথ দেখিয়েছে…

কথার মাঝখানেই জীবনানন্দবাবু হঠাৎ প্রশ্ন করলেন

—তুমি কার্ল মার্কস পড়েছ? ডস্ ক্যাপিটাল?

ছাত্র কবিটি থতমত খেয়ে বললে

—না।

জীবনানন্দবাবু এক কাল তার দিকে তাকিয়ে থেকে হাসি গোপনের বহু চেষ্টা করেও অকস্মাৎ উচ্চ হাস্যে ফেটে পড়লেন। হঠাৎ সে হাসি। এমন আচম্বিতে বেরিয়ে আসা যে, অবাক হয়ে দেখতে হয় তাঁকে। সঙ্গে হাসা যায় না।"

আবুল কালাম শামসুদ্দীন

হাওড়া গার্লস কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ, কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর সহকর্মী। সেই কেশববাবু জীবনানন্দের এই আকস্মিক হাসির বন্যাকে বর্ণনা করেছেন— 'শব্দহীন অট্টহাসি'।

"তিনি নিঃসঙ্গ কবিরূপেই আখ্যাত হইয়াছেন; কিন্তু তিনিও যে একজন সঙ্গ-লোভী সামাজিক মানুষ ছিলেন, আমাদের আনন্দ উৎসবের অন্যতম অংশভাক্ ছিলেন, সে কথা আমরা ভুলি কি করিয়া? মাঝে মাঝে তাঁহার স্বপ্নকামী আত্মনিষ্ঠ কবিচিত্ত আমাদের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইত। তাঁহার সেই শব্দহীন অট্টহাসি সমগ্র সত্তার আত্ম-বিকিরণ—এখনও চিত্তপটে অম্লান হইয়া আছে।"

এখানেও অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য। অবনীন্দ্রনাথও বাইরে বড় কঠিন, যেন পাথর। যেন দরজা বন্ধ করা এক রাজবাড়ী। অথচ ভিতরের আসল মানুষটা ভিন্ন। যেন ঝরনা। কলকল-খলখল স্রোতে সব সময়েই ভেসে চলেছে, ভাসিয়ে চলেছে। রাণী চন্দের আঁকা অবনীন্দ্রনাথের এই কঠিন-কোমল মানুষটির ঘরোয়া রূপ অনেকবার দেখেছি আমরা।

"একদিন দক্ষিণের বারান্দায় তিনি বসে কুটুম-কাটাম গড়ছেন, আমি কাছে বসে দেখছি। দেখতে দেখতে পরম বিস্ময়ে এই কথাই তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলুম যে, এই আপনাকে কেন এত ভয় পেতাম আগে। তিনি মুখের চুরুটটি আঙুলে তুলে নিলেন। বললেন, গুটিপোকার মুখোশ দেখেছ? প্রজাপতি হবার আগে 'গুটি' যখন বাঁধে, পাতার নীচে ঘাসের গায়ে ঝুলতে থাকে সেই গুটিপোকা। বেশ কিছুদিন তাদের থাকতে হয় এই অবস্থায়। তাদের মুখের দিকটা থাকে উপরের দিকে, লেজের দিকে থাকে রঙ বেরঙের মুখোশ আঁকা। পাখিরা খেতে এলে গুটিপোকাটা নড়ে-চড়ে ওঠে, মুখোশও নড়ে। সেই মুখোশ দেখেই পাখিরা ভয়ে পালিয়ে যায়।

আমারও তেমনি। মুখোশ পরে থাকি। সেই মুখোশ পেরিয়ে কেউ এসে

গেল তো এসেই গেল।"

অবনীন্দ্রনাথ বয়সেই বড়ো হয়েছেন কেবল। বুড়ো হননি কোনদিন। শিশুর মন নিয়ে এই পৃথিবীকে দেখেছেন বিস্ময়ের চোখে। আর সেই বিস্ময়কে বার বার রূপ দিয়েছেন কখনো লেখায়, কখনো রঙে। পাকা অভিজ্ঞতা আর কাঁচা ছেলেমানুষী, অবিরাম এই দুয়ের যোগফলে তাঁর সৃষ্টির জগত ভরে উঠেছে বৈচিত্র্যে, বহুমুখী বৈভবে। তিনি গুরু হয়েছেন শিষ্যদের কাছে। কিন্তু গুরুগম্ভীর হননি কারো কাছেই। হাস্য-পরিহাস এবং কৌতুকপ্রিয়তা ছিল তাঁর মজ্জায় মজ্জায়। তারই প্রতিফলন আমাদের চোখে পড়ে 'মুখোশ' চিত্রশালায়, কুটুম-কাটামে, যাত্রাপালায়, শিশু সাহিত্যে। আজীবন 'বয়স্ক শিশু' হয়ে থাকাটাই ছিল যেন তাঁর প্রধানতম তপস্যা। ছিলেনও তাই।

"বেনথল সাহেব দাদামশায়ের পুরনো বন্ধু। আর্ট-সোসাইটির পাণ্ডা একজন। একজিবিশন থেকে দাদামশায়দের এবং ছাত্রদের ছবি কিনতেন কত। তিনি বুড়ো হয়ে রিটায়ার করে চলে গেছেন বিলেতে। তাঁর ছেলে এসেছেন ভারতবর্ষে। ছেলে বাপের কাছে কত শুনেছে ঠাকুরবাড়ীর কথা। বাপের সংগ্রহে কত ছবি দেখেছে, কত তারিফ করেছে। তাই কলকাতায় এসে প্রথমেই ছুটে এসেছে দাদামশায়ের কাছে। মনে মনে কল্পনা করে এসেছে দেখবে এক প্রাচীন শিল্পীকে তুলি আর রং এর রাজ্যে। চিত্ররসে ভরপুর। এসে দেখে কোথায় কি? রং-তুলির চিহ্ন পর্যন্ত নেই। হাতে এক খেরো-বাঁধানো জাব্দা খাতা নিয়ে খুদে খুদে অক্ষরে কি সব লিখে চলেছেন। পাতার পর পাতা।

সায়েব জানতে চায়—

—মিস্টার টেগোর কি আজকাল ছবি আঁকেন না?

দাদামশায় সংক্ষেপে জবাব দেন

—না।

সায়েব নানা রকম গল্প করে। কি কি ছবি দেখেছে। কোথায় দেখেছে, বলে। দাদামশায়ও তাকে কত কি শোনান। হাসি ঠাট্টা চলে। তারপর সায়েব হঠাৎ বলে ওঠে

—মিস্টার টেগোর! আপনার মন তো যুবকের মত সতেজ। আপনি বুড়ো হননি একটুও। তবে কেন ছবি আঁকা ছেড়ে দিলেন? আপনার অতবড় প্রতিভা কি··· ?

দাদামশাই বাধা দিয়ে বলেন—

—বুড়ো হইনি, কিন্তু বয়েস বেড়েছে আর সেই সঙ্গে অভিজ্ঞতা। দেখলুম ছবি-টবি কিছু নয়। ছেলেমানুষী। গভীরতর রসের সন্ধানে নেমেছি। নানা রকম শব্দে বাজিয়ে বাজিয়ে দেখছি কি রকম চিত্র ফুটে ওঠে মনের মধ্যে। বাংলা জানলে সায়েব তোমায় শুনিয়ে দিতুম আমার যাত্রা পালা একখানা।

সায়েব বললেন

—আপনি যখন যাত্রার পালা করাবেন আমায় খবর দেবেন। কথা না বুঝলেও শব্দে গান অভিনয় এসব বুঝবো।

সায়েব চলে যাওয়ার পর দাদামশায় আমাদের ডেকে বললেন

—ওরে, বেনথল সায়েবের ছেলে তোদের যাত্রা শুনতে চেয়েছে। লাগিয়ে দে একটা পালা। এই দেখ সায়েবের জন্যে ব্যাণ্ডবাদ্যি লিখে ফেলেছি। বলে শোনালেন

ড্রুম দদ্দড় ধ্রুম ধদ্ধড়
কিপ্ পোলো কিপ্ পোলো
যম জয়ন্তীর তোপ পোলো
যমদণ্ড ভঙ্গ হোলো
কালদণ্ড ফাল হোলো
ফাল্লোলো
ড্রুম দদ্দড় ধ্রুম ধদ্ধড়
কিপপোলো কিপপোলো।" দক্ষিণের বারান্দা

বয়স্করা সতর্ক মানুষ। কিছু ভাঙতে তাঁরা ভয় পান। কিছু ভাঙলে উদ্বেগে-উত্তেজনায় অস্থির। অবনীন্দ্রনাথ চিরতরুণ। তাই ভাঙতে তাঁর ভয় নেই। ভেঙে ভেঙে নতুন করে কিছু গড়বার এই যে নিত্যদিনের খেলায় মেতে থাকতেন তিনি, এটার পিছনে দুঃসাহস ছিল যত, তার চেয়ে বেশী ছিল তাঁর স্বভাবের সরসতা।

এই সরসতার জোরেই কখনো কখনো নিজেকে প্রচার করেছেন অর্দ্ধবৃদ্ধ বলে। তরুণদের সাবধান করে দিয়েছেন বুড়োদের অন্তরঙ্গ না হতে। একবার কোন এক তরুণ পত্রিকার সম্পাদককে চিঠিতে লিখেছিলেন—

—এই বুড়োর আশীর্বাদ গ্রহণ কর কিন্তু দূরে থেকে তাঁকে নমস্কার করো,

অন্যথা হলেই বিপদে পড়বে। বুড়োকে তরুণ বলে ভুল করা তোমাদের স্বভাব, কিন্তু বুড়ো সে জানে শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকতে পারলে বেশ এক চোট মোড়লী করার সুবিধা পাবে। তাই সে দূর থেকে কাছে এগোতে চায় তোমাদের নানা ছলাকলায় ভুলিয়ে। সাবধান! বুড়োদের লেখা যত কম পারো ছাপিও। একটা গল্প আছে—কচি পাতায় আর ছাগলে একবার ভাব হয়েছিল। কচি ডালে কচি পাতা, ছাগল তার নাগাল পায় না, কিন্তু রোজ ডেকে বলে—তোমার ফুটন্ত ভাবে আমি মজে আছি। শয়নে, স্বপনে, জাগরনে তোমারি নবদূর্বাদলশ্যাম ছবি মনে পড়ে। ওগো তরুণ এসো বুকের কাছে! কচি পাতা খুশি হয়ে ভাবে এ-যে আমার একজন—এর প্রাণে যৌবনের জোয়ার বইছে দিনরাত! ভুল করে পাতা ফল ভারে নুয়ে পড়ে, এগিয়ে আসে মাঠের দিকে। বুড়ো মালী এসে ফল পেড়ে নেয়। বুড়ো ছাগটা এসে সবুজ পাতা চিবিয়ে নিজের চোয়াল সবুজ রং-এ ছুপিয়ে চুপি চুপি কচি ছেলের মতো মা মা করতে করতে অন্য ডালের কচি পাতার দিকে অগ্রসর হয়।"

একি তাঁর নিজের বার্ধক্যকে নিয়ে কৌতুক? নাকি নিজের তারুণ্যেরই আর এক তরতাজা উদাহরণ?

নিজের শিল্প সৃষ্টিকে নিয়ে অনেক কৌতুক করেছেন তিনি। তাঁর সম্পর্কিত যে-কোন বইয়ের পাতা ওল্টালেই চোখে পড়বে সেই সব হাস্যকলোচ্ছ্বাসময় কাহিনী। তবে নিজের সৃষ্টিতে সেরা কৌতুকের সংযোজন বোধ করি আরব্য রজনীর চিত্রমালায়। এই চিত্রমালা প্রসঙ্গে তিনি নিজেই উচ্চারণ করে গেছেন—

"আরব্য উপন্যাসের ছবির সেট আঁকা হলে ছেলেদের বললুম—'এই ধরে দিয়ে গেলুম। আমার জীবনের সব কিছু অভিজ্ঞতা এতেই পাবে।' "

সত্যিই দিয়ে গিয়েছিলেন তাই। আরব্য-রজনীর চিত্রমালার একদিকে যেমন গাঢ় হয়ে ফুটেছিল তাঁর সারা জীবনের শিক্ষা, আরেকদিকে তেমনি জেগে উঠেছিল নির্মাণের নতুন বলিষ্ঠতা। পাশাপাশি উজ্জ্বল এবং মিহি রঙকে নিয়ে, স্থাপত্যের ওঠানামা নিয়ে, অসংখ্য কিংবা একটি চরিত্রের আশ্চর্য কম্পোজিশন নিয়ে আরব্য রজনীর ছবিগুলো খুলে দিয়েছিল শিল্পের এক নতুন সিংহদ্বার। আর এরই মধ্যে তিনি সংগোপনে ভরে দিয়েছিলেন এক আশ্চর্য কৌতুক। লোককে দেখালেন আরব্য রজনী। কিন্তু ভিতরে লুকিয়ে রাখলেন তখনকার কলকাতাকে। লোকে দেখল মানুষগুলো বাগদাদের। অবনীন্দ্রনাথ আসলে

বাগদাদী ধাঁচে এঁকে রাখলেন চেনা-জানা মানুষদের।

"যদিও উপলক্ষ্য আরব্য উপন্যাস, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ এঁকেছেন তাঁর সারা জীবনের অভিজ্ঞতা। শহুরে জীবনের অভিজ্ঞতাকে বোগদাদের লৌকিক, অলৌকিক ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন এমনভাবে যে কালের ব্যবধান মুছে গেছে সে ক্ষেত্রে। উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতা শহরের জনস্রোত ও বিচিত্র কর্মজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা আরব্য উপন্যাসের কাহিনীতে রূপান্তরিত করেছেন অবনীন্দ্রনাথ। এটিকে আরব্য উপন্যাসের চিত্রাবলী না বলে তাঁর মৌলিক কলকাতা নগরের কাহিনী বলা অসংগত নয়।...জীবজন্তু, মানুষ, সেলাইয়ের কল, হ্যারিকেন-লণ্ঠন, হোটেলের নাম লেখা সুটকেশ সব-কিছুই ছবির ইমারতী বাঁধনকে দৃঢ়তর করেছে।" বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

"মূর্তি কল্পনায় শিল্পীর চারপাশের দেখাশোনা ও চেনা জানা মানুষের চেহারার আদল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। এমন কি তাঁর আত্মমূর্তিও যে স্থান পায়নি তা জোর করে বলা যায় না।" সুধা বসু

ঠিক এই রকম আর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি, ছবিতে নয়, লেখায়, 'খুতুর রামায়ণ' নামে শেষ বয়সের লেখা একটি দীর্ঘ যাত্রা পালা। এ রচনা এখনো পর্যন্ত বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়নি। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল পাণ্ডুলিপিটি দেখার। লম্বা-চওড়া বিরাট একটা খাতা। লেখার সঙ্গে পাতায় পাতায় ছবি। অথচ প্রথম দু-চার পাতার কাটাকুটির ডিজাইন বাদ দিলে সেই সচিত্র পাণ্ডুলিপির একটি ছবিও অবনীন্দ্রনাথের নিজের হাতে আঁকা নয়। খবরের কাগজ, পাঁজী, সেকালের শাড়ির লেবেল, বিভিন্ন বোতলের লেবেল, দেশী-বিদেশী সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ছবি, বিজ্ঞাপন, কার্টুন, যেখান থেকে যা পেয়েছেন তাকেই কেটেকুটে লাগসই করে জুড়ে দিয়েছেন যাত্রাপালার উদ্ভট বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে। খুতুর রামায়ণ শুধু চিত্রণেই বিচিত্র নয়। বিচিত্র তার সমকালীনতায়। রাবণ বধ পালার সঙ্গে তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে নারকীয় ঘটনা অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

সৃষ্টিশীল মানুষদের স্বভাবের ভিতরে এক ধরনের বৈপরীত্য থেকেই যায়। সেও এক ধরনের সৌন্দর্য্য। টলস্টয় প্রসঙ্গে একটি স্মরণীয় উক্তি আছে—"What ever he was, and he was almost everything—he was also its opposite." অবনীন্দ্রনাথ এবং জীবনানন্দের সামাজিক পরিচয় যথাক্রমে

ঘরকুনো এবং নির্জনতম। অথচ এঁরা নিজেরাই বারবার ভেঙেছেন এই-সব প্রবাদ-সদৃশ্য ধারণার বাঁধ।

অবনীন্দ্রনাথ ঘরের বাইরে পা বাড়িয়েছেন কমই, তাঁর দীর্ঘ জীবনের তুলনায়। কিন্তু যেখানে যতটুকু দেখেছেন, সেটা তন্ন তন্ন করে খুঁটিয়ে। বেড়াতে গেছেন পাহাড়ে। সঙ্গে দূরবীন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেছেন এক ঠাঁই চোখে দূরবীন লাগিয়ে। এইভাবে দূরকে টেনে আনতেন কাছে। এবং এই ভাবেই একবার আপাদমস্তক বরফে ঢাকা হিমালয়ের বুকে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন 'একেবারে রবিকাকার নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'।

"দেখছিলুম বসে বসে পাহাড়ের দৃশ্য। বরফের দিকে টেলিস্কোপটাকে ঘুরিয়ে দেখছি, হঠাৎ মনে হল কি একটা নড়ছে। বরফের উপর কোন প্রকাণ্ড জন্তু না কি—তাই মনে হল। তারপর দেখলুম একটা মস্ত বরফের ধ্বস—হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। তার সঙ্গে তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল ঐ নদীটা। এতদূর থেকে দেখছি—নিশ্চয় প্রকাণ্ড একটা ব্যাপার—কি হচ্ছে এখন ওখানে কে জানে।"

তাঁর সমসাময়িক কবি বন্ধুদের রচনায় যে জীবনানন্দ ঘোরতর রূপে স্থির এবং নির্জন, সেই জীবনানন্দেরই ভিতরেই লুকিয়েছিল চির-ভ্রাম্যমাণ এক পথিক। ঠিক যেমনভাবে ক্লান্তিহীন হেঁটেছেন তিনি তাঁর কবিতায়, একদা ঠিক তেমনি-ভাবেই হেঁটেছেন ভারতের পথে-প্রান্তরে নিজের পায়ে।

"প্রায় ছেলেবেলা থেকেই বরিশালের উপকণ্ঠে শ্মশানভূমির পাশ দিয়ে আমরা দুজনে হেঁটেছি, অবাক হয়ে কখনো বা লাসকাটা ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখেছি। কখনও আরও দূরের পাল্লা, শহর ছাড়িয়ে গ্রামের পথে। …গিরিডিতে উশ্রী নদী পার হয়ে বালুর তটে, আমলকী বনে বহুদিন হেঁটেছি। কখনও হেঁটেছি এপারে ক্রিস্টান হিলের দিকে। কলকাতার ময়দানে, পার্কে, অলিতে-গলিতে উষাকালে অথবা গভীর রাত্রিতে বহুদিন হেঁটেছি। পুনা শহরে হেঁটে গেছি পার্বতী মন্দিরের চূড়ায়, যারবেদায় পর্ণকুটীরের পাশ দিয়ে, মূলামুখা নদীর সঙ্গমে, কাকীতে, লোনা ভোলার পথে। হেঁটেছি বোম্বাই শহরের পথঘাটে, মালাবার হিলে, ওযার্লীর সমুদ্রের পাশে, ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস থেকে বান্দ্রায়, বান্দ্রা থেকে জুহুর সমুদ্রতটে। হেঁটেছি দিল্লীর সড়কে সড়কে যেখানকার ধুলোর সঙ্গে মিশে গেছে অনেক বিলুপ্ত নগরীর ধুলো ও বালি, হেঁটেছি শাহানশা বাদশাহের কবরের

পাশে পাশে, মসজিদ-মিনারের কাছে লোদী গারডেনে, ইউসুফ সরাইতে, মেহেরৌলীর পথে।" অশোকানন্দ দাশ

অথচ, এই বিবরণও যেমন সত্য, এমন অবিরল ভ্রমণের পরও জীবনের দুদণ্ড শান্তির খোঁজে অস্তিত্বের ভিতরকার গাঢ় ঘন একাকীত্বের উপলব্ধিই যে হয়ে উঠেছিল তাঁর স্থির বাসস্থান সেটাও তেমনি সত্য।

নিজের স্বভাবকে জানতেন বলেই, নিজের সম্পর্কে তাঁর এমন সরল উচ্চারণ—

"সকল লোকের মাঝে বসে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা?
আমার চোখেই শুধু ধাঁধা?
আমার পথেই শুধু বাধা?"

বোঝা গেল, নির্জনতা-প্রিয়, ভিড়ের ভিতরেও একলা-একলা এই দুটি মানুষের ধাত উড়ে চলার নয়। বরং বৃক্ষের স্বভাব। কোথাও স্থির হয়ে বসে, মাটির ভিতরে গভীর শিকড় চালিয়ে, পৃথিবীর রস টানা।

অথচ, এমনই যাঁরা স্থির, যাঁরা আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে থেকেছেন যে-যার নিজের সীমানায়, গণ্ডী-টানা চত্বরে, অনেকটা স্বেচ্ছাবন্দীর মতো, যাদের দিকে তাকালে মনে হয় বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁদের উদাসীনতা বুঝি আকাশ-ছোঁয়া, তাঁরাই আবার কী এক আশ্চর্য মন্ত্রবলে তাঁদের সৃষ্টিতে অনন্তকালের পথিক, অবিরাম পর্যটনকারী, দেশ-দেশান্তর পার হয়ে কাল-কালান্তরে।

জীবনানন্দ হাঁটেন হাজার বছর ধরে। তাঁর ভ্রমণের পথে পড়ে সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগরের নিশীথ অন্ধকার। পড়ে বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ। পড়ে বিদর্ভ, শ্রাবস্তী, বিদিশার কারুকার্যময় যুগ। হাজার বছর আগে মারা গেছে যেসব রূপসীরা, এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায়; তাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটে যায় কোনো এক গভীর হাওয়ার রাতে। বেবিলনের রানীর ঘাড়ের উপর চিতার উজ্জ্বল চামড়া, পারস্য গালিচা, কাশ্মীরী শাল, বেরিন তরঙ্গে নিটোল মুক্তাপ্রবাল, অপরূপ সব খিলান, গম্বুজের বেদনাময় রেখা, সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি, আলেকজান্দ্রিয়ার মোমের আলোক দেখতে দেখতে তাঁর পথ-প্রদক্ষিণ। মধ্যযুগের অবসান স্থির করে দিতে গিয়ে ইওরোপ গ্রীস

যখন উজ্জ্বল খৃস্টান হতে চলেছে, তিনি তখন হাজির ছিলেন সেখানে। এক তারা-ভরা রাতের বাতাসে ধর্মাশোকের ছেলে মহেন্দ্রের সাথে তাঁর দেখা হয়েছিল উত্তরোল বড় সাগরের পথে। বুদ্ধ, অম্বাপালি, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সঙ্গেও প্রাণাধিক পরিচয় ছিল তাঁর। আর এই সব বিস্তারিত অভিজ্ঞতার পর আমরা যখন পড়ি—

"যখনই আমার আত্মা বৃক্ষ আর আগুনের মতো নভোচারী
হয়ে ওঠে—মনে হয় যেন কোন হরিতের—নব হরিতের
সঙ্গীতে নিশ্চিহ্ন হয়ে মানুষের ভাষা
এ জন্মের—আরো বহু জন্ম-জন্মান্তের মুখোমুখি ফিরে এসে অনাদি আলোয়
ভালোবাসা—"

তখন বিশ্বাস করতে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে না যে, তিনি সত্যি সত্যিই জন্ম-জন্মান্তরের কবি।

আর কী আশ্চর্য ঘটনা, অবনীন্দ্রনাথেরও ঐ একই পথরেখা ধরে অনন্ত পরিক্রমা।

আরব্য উপন্যাস আর ওমর খৈয়ামের চিত্রমালা, সম্রাট অশোক, অশোকের শেষ বয়সের রানী তিষ্যরক্ষিতা, বুদ্ধ-সুজাতা, কচ-দেবযানী, তপস্বিনী উমা, মেঘদূতের নির্বাসিত যক্ষ, অলকার প্রাসাদ চত্বরে সঙ্গীতের আসর, কৃষ্ণলীলা চিত্রমালা, মেঘাবৃত রজনীতে প্রেমাস্পদের দিকে পা-বাড়ানো অভিসারিকা, বেতাল পঞ্চবিংশতি আর বুদ্ধচরিতের চিত্রমালা, জাহানারা, জেবউন্নিসা, সাজাহান, জাহাঙ্গীর, মোগল যুগের হিরণ্ময় খিলান আর শিল্পীত জালির কাজ, তাঁর ক্লান্তিহীন স্থান-কাল-হারা ভ্রমণের সাক্ষ্য।

কিন্তু এ-ভ্রমণ চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথের। লিপিকার অবনীন্দ্রনাথ কি তাহলে অন্য মানুষ? শুধু এ জন্মের, শুধু সমকালের? না।

যখন "নালকে" পড়ি—

"কপিলাবস্তুর রাজবাড়ি। রাজরানী মায়াদেবী সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে আছেন। ঘরের সামনে খোলা ছাদ, তার ওধারে বাগান শহর, মন্দির, মঠ। আরো ও-ধারে—অনেক দূরে হিমালয় পর্বত—শাদা বরফে ঢাকা। আর সেই পাহাড়ের ওধারে আকাশ জুড়ে আশ্চর্য এক শাদা আলো, তার মাঝে সিঁদুরের টিপের মত সূর্য উঠছেন। রাজা শুদ্ধোদন সেই আশ্চর্য আলোর দিকে চেয়ে আছেন,

অথবা 'শকুন্তলা'-য়

"প্রিয়ংবদা কেশর-ফুলের হার নিলে, অনসূয়া গন্ধ ফুলের তেল নিলে, দুই সখীতে শকুন্তলাকে সাজাতে বসল। তার মাথায় তেল দিলে, খোঁপায় ফুল দিলে, কপালে সিঁদুর দিলে, পায়ে আলতা দিলে, নতুন বাকল দিলে, তবু তো মন উঠল না!"

অথবা 'রাজকাহিনী'-তে

"শিলাদিত্য মশাল আনতে হুকুম দিলেন; সেই মশালের আলোয় শিলাদিত্য দেখলেন—উত্তর দিকটা শূন্য করে সূর্যমূর্তির সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের আধখানা যেন পাতালে চলে গেছে; কেবল কালো পাথরের সাতটা ঘোড়ার মুণ্ড বাসুকীর ফণার মতো মাটির উপরে জেগে আছে। যে-ঘরে শিলাদিত্য গায়েবীর সঙ্গে খেলা করেছেন, যে-ঘরে সারাদিন খেলার পর দুটি ভাইবোন গুর্জর দেশের গল্প শুনতে শুনতে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়তেন, যেখানে দেবদারু গাছের মতো পিতলের সেই আরতি-প্রদীপ ছিল, সে-সকল ঘরের চিহ্ন-মাত্র নেই।"

তখন মনে হয়, এ যেন নিছক কথাচিত্র নয়, স্মৃতিচিত্র। যেন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। যেন সবটাই চোখে দেখা, কানে শোনা।

নিজের অন্যান্য রচনাতেও তিনি এমন সব ছবি এঁকেছেন, মনে হয় তাঁর বসবাস যেন স্থান-কালের এমন এক কেন্দ্রে যেখান থেকে কোনো দূর শতাব্দী অথবা দূরতম দেশ দূরের নয় এতটুকু। ইচ্ছাটুকুই যথেষ্ট। ইচ্ছের ডানা ছড়ালেই এক পলকে হাজির হয়ে যেতে পারেন দূর-দূরান্তরে, কাল-কালান্তরে। তা যে পারেন, সে বিশ্বাসে বুঝি আস্থাও ছিল অবনীন্দ্রনাথের। 'একে তিন তিনে এক' গল্পে তিনি নিজেকে জড়িয়েই রচনা করে গেছেন তার রঙ্গচিত্র। গল্পের তিন চরিত্রের একজন, ছিরিকণ্ঠ, একবার গিয়েছিল ঠাকুর বাড়িতে অবনীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। ফিরে আসার পর নিম্নোক্ত কথোপকথন—

"—তুই গেছলি ঠাকুর বাড়িতে, কেউ রুখলে না?

—না সোজা চলে গেলাম।

—তারপর?

—তারপর শুনলেম ঠাকুর গেছলেন একটু আগে বোগদাদে, এখনই ফিরলেন।

—গেল আর ফিরল? বোগদাদ কি এখানে যে—

—আরে শোননা, ঐ কথাই একজন ঠাকুরদাসকে শুধোতে সে বল্লে, আজ কাল ঠাকুর মশাইকে হাজার দাস্তাঁর ছবির জন্যে রোজ রোজ দৌড়তে হয় ইরান, তুরান, বাসরা, বোগদাদ। খালি ঘুমোতে আর খেতে আসেন বাড়ি দিনে দুতিন বার।

—বলিস কি অ্যাঁ?"

ছিরিপদ বা ছিরি অভিলাষদের বিস্ফারিত চোখের বিস্ময় এইখানেই শেষ হয়নি। আরও অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনার বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ তাদের শুনতে হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শী ছিরিকণ্ঠের এজাহারে।

"বলি শোন না, আমাকে তো ঠাকুরদাস তার নিজের ঘরে বসিয়ে বল্লে, পান খান। বিড়ি কি সিগারেটের নামও করলে না। বসে আছি, দেখি একটা বর্মা এনে দিলে। এতক্ষণ চেয়ে দেখছিলেম বৈঠকখানা বাড়ি পুরোনো ঝরঝরে ভাঙা চোরা। যেমন বর্মা ধরিয়ে একটান দিয়েছি টেক্কামার্কা জ্বেলে, অমনি সব বদলে গেল। ছেঁড়া মাদুর হয়ে গেল মখ্‌মলের গালচে। ঘরটা একেবারে শিস্‌মহল বাদশাই কেতার। আবু হোসেনের মত হক্‌চকিয়ে গেলুম। ঠাকুরদাস তখন আর দাস নেই, একেবারে খাস্‌ মহলের বান্দা হয়ে গেছে, ঠিক যেন রঙের গোলামটা। হুবহু নবাবী কেতার। সেলাম করে বল্লে, চলিয়ে, হুজুর তলব ফরমাতে হেঁ।"

এতক্ষণ ছিরিকণ্ঠের মুখে ছিরিকণ্ঠের অভিজ্ঞতার কথা। এর পর ছিরিকণ্ঠের মুখে হুবহু অবনী ঠাকুরের গল্প।

"অবনীবাবু বল্লেন, বোসো না, একটা মজার কথা শোনো। আজ হঠাৎ ডাক পড়লো হারুন-অল-রসিদের ওখানে। কি হল, না বাদশার গলায় মাছের কাঁটা ফুটেছে। দৌড়লেম···"

ছিরিকণ্ঠ যেমন অবনীবাবুর পাল্লায় পড়ে ফিরে এসেছিল আশ্চর্য অভিজ্ঞতা নিয়ে, স্বয়ং অবনীবাবুও তেমনি একবার আকণ্ঠ বিস্ময়ে ডুবেছিলেন ভূতখানার কিউরেটার উপদেব উপাধ্যায় আর তার আসিস্টান্ট প্রভৃত সামন্তর পাল্লায় পড়ে। তারা তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল গুস্তিঘরে, ভূতখানার অদ্ভুত সব কলেকসান দেখাতে। দাদামশায় মুখে গুস্তিঘর কথাটা শুনে চমকে উঠেছিল নাতি বাদশা। প্রশ্ন করেছিল, গুস্তিঘর কাকে বলে দাদমশা? দাদামশা-র উত্তর—

"কে জানে ভাই, দেখে মনে হল গুন্তিঘর।
কে জানে ভূতখানা কি গুন্তিঘর
ধাঁচাখানা খাঁচাপানা
কোন্ লুপ্ত যুগের গুপ্ত কৃষ্টির দিচ্ছে খবর
বারান্দা দিচ্ছে গান্ধার শিল্পের গন্ধ
মৌর্য শিল্পের শৌর্য বোঝাচ্ছে
সারি সারি জানলা দরজা আঁটসাঁট বন্ধ।
অলিন্দে বারেন্দ্র শিল্পের সারি সারি কবন্ধ
মাথার জন্যে অপেক্ষা করছে একটানা।
সদর দোরে পাল রাজাদের পাল্কি পড়ে আছে একখানা।"

এর পর, ভূতখানার বা গুন্তিঘরের কালচিটে নিবিড়ান্ধকার ভেদ করে, ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরে ঘুরে তিনি যা দেখলেন অথবা তাঁর চোখ দিয়ে আমাদের যা দেখালেন তার লিস্টিটা কোনো ছোটখাট ব্যাপার নয়। প্রভূত সামন্ত, বুঝতে পারি, ঠিকই বলেছিল যে, ভুবনেশ্বর পরগনার এই ভূতখানাটি সত্যি সত্যিই ভূভারতের অধুনালুপ্ত কৃষ্টির যাবতীয় রত্ন সমষ্টির ভাণ্ডার বিশেষ। সেখানে রয়েছে—

মাহেঞ্জোদাঁড়োর তিজেল হাঁড়ির মতো গম্বুজ।
নলরাজার পোড়া মৎসটির মতো তোরনের মকর।
শেষ নাগবংশীদের সীল।
কালিদাসের ঘোঁটন কালির একটুকরো।
সগারশ্বমেধের ঘোড়ার আক্কেলদাঁত।
গুলে পোড়া শীতলপাটির মতো নটী বেহুলার মেখলা।
লখিন্দরের মালাই চাকি, ভাঙা শাঁখের মতো।
লৌহদন্ত মুনির দাঁতন।
আলেকজাণ্ডারের বিউটিফেলার ঘোড়ার চক্ষের পলক
লক্ষ্মণসেনের ভাঙা পেলেট,
সম্রাট অশোকের গড়গড়ার মুখনল।
করকোষ্ঠী ভাষায় লেখা উপগুপ্তের প্রেমপত্র, শুঁকলে লোধ-রেণুর গন্ধ।
অজন্তা গুহার দোরের ছিটকিন্।

নারদ মুনির পিয়ানোর কান।

বড়ু চণ্ডীদাসের দোয়াত।

বল্লাল সেনের ব্রাহ্মণ ভোজনের খুরি গেলাস মেটে হাঁড়ি।

দেখতে দেখতে দিশেহারা হয়ে যান অবনীন্দ্রনাথ। দেখতে দেখতে দিশে-হারা করে দেন আমাদেরও। এ যেন এক তীর্থযাত্রা, হারানো-পুরনো পৃথিবীর পথে-প্রান্তরে।

জীবনানন্দেও তাই। ক্ষণে ক্ষণে তাঁর অতীতচারণ। তাঁর অন্যান্য সব কবিতার কথা ছেড়ে দিয়ে শুধু যদি 'রূপসী বাংলা'কেই চোখের সামনে আনি, দেখতে পাবো এর সমর্থন। সেখানেও ঘুরে-ফিরে আসছে চাঁদসদাগর, মধুকর ডিঙা, বল্লাল সেনের ঘোড়া, গৌড় বাংলার সীতারাম, রাজারাম, রামনাম রায়, বেহুলার লহনার মধুর জগত। আসছে রায়গুনাকরের স্মৃতি, চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদের শ্যামা, ধনপতির-শ্রীমন্তের-মুকুন্দরামের-চণ্ডীমঙ্গলের প্রসঙ্গ। আবার বাংলার বারোমাসের জলের-স্থলের, আকাশের, বাতাসের, আলো-অন্ধকারের ভিতরে কখনো কখনো ঢুকে পড়েছে আরো সুদূর অতীতের স্বপ্নের গন্ধ।

"আবার স্বপ্নের গন্ধে মন

কেঁদে ওঠে :—তবু জানি আমাদের স্বপ্ন হতে অশ্রু ক্লান্তি রক্তের কণিকা

ঝরে শুধু—স্বপ্ন কি দেখেনি বুদ্ধ-নিউসিডিয়ায় বসে দেখেনি মণিকা?

স্বপ্ন কি দেখেনি রোম, এশিরিয়া, উজ্জয়িনী, গৌড়-বাংলা, দিল্লী, বেবিলন?"

জীবনানন্দের এই অতীচারিতার উৎস-মূলে দাঁড়িয়ে আছেন ইয়েটস, এমন কথা আমরা শুনেছি কোনো কোনো সমালোচকের মুখে। তাঁদের মিল উপলব্ধির আত্মীয়তায়, মৌলিকতাহীন অন্ধ অনুকরণে নয়। তাই ইয়েটস যখন বলেন—

"I sing of the ancient ways"

জীবনানন্দ জানান—

"সেই নগরীর এক ধূসর প্রাসাদের রূপ জাগে হৃদয়ে।"

তাহলে অবনীন্দ্রনাথের বেলায় আমরা উৎস-মুখ খুঁজতে বেরোব কোনখানে? উৎস, আদৌ অসম্ভব নয়, তাঁর চিত্রকলা, চিত্রচর্চার উপকরণ সন্ধান, উপকরণের সন্ধানে বেরিয়ে কবিতার কাছে চলে এসে আত্মীয় পাতানো।

সত্যিই কি তিনি উপস্থিত ছিলেন ঐ সব কালে? অবনীন্দ্রনাথকে এ প্রশ্ন

করলে যা উত্তর দিতেন, তা জীবনানন্দের ভাষায় আমরা শুনে নিতে পারি—

"মনে হয় প্রাণ এক দূর স্বচ্ছ সাগরের কূলে
জন্ম নিয়েছিলো কবে ;
পিছে মৃত্যুহীন, জন্মহীন, চিহ্নহীন
কুয়াশার যে-ইঙ্গিত ছিলো—
সেই ধীরে ভুলে গিয়ে অন্য এক মানে
পেয়েছিলো এখানে ভূমিষ্ঠ হয়ে--আলো জল আকাশের টানে
যেন কাকে ভালবেসে ।"

এ-উত্তরেও যদি আমাদের সন্দেহ না ঘোচে তাহলে শোনা যাক তাঁর নিজের মুখের স্বীকারোক্তি। বোন বিনয়িনী দেবীকে লিখছেন চিঠিতে—

"সারনাথ অতি আশ্চর্য জায়গা। আমি সেবারে এলাহাবাদ থেকে ফিরে গিয়ে দেখে এসেছি। জায়গাটা প্রথম দেখেই আমার খুব চেনা চেনা বোধ হয়েছিল, আমার মনে হল যে মন্দিরের কোণে কুয়োটার ধারে আমার দোকানঘর ছিল সেখানে বসে আমি মাটির পুতুল আর পট বিক্রী করছি শহরের ছেলেমেয়েগুলো আমার দোকানের সামনে রং-চং করা পুতুলগুলোর দিকে হাঁ করে দাঁড়িয়ে। মেয়েরা সামনের কুয়ো থেকে জল তুলছে, গল্পগুজব করছে মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে লোক উঠছে নামছে। এসব যেন অনেক দিনের স্বপ্নের মতো মনে পড়ে গেল। আরও আশ্চর্য যে অতগুলো ঘরবাড়ির মধ্যে আমার ঘরটি আমি দেখেই চিনতে পারলুম, পাঁচ কি ছয় হাত চৌকো একটা ছোটো ঘর দরজার উপরে দুটি হাঁস পাথরের চৌকাঠে লেখা আছে। তোমরা বোধ হয় সে ঘরখানি দেখনি, সেটা নেহাৎ ছোটো। সামান্য দোকান ঘর কিনা, আমার মন কিন্তু আজও সেই ঘরখানিতে পড়ে আছে। সারনাথের যাদুঘরে যেসব মাটির ঘোড়া, খুরি, গেলাস, কুঁজো দেখেছো সেসব আমার হাতে গড়া তার কোন ভুল নেই। তখনকার পটগুলো কোথায় গেল কে জানে।

লোকে ঘরে ফিরলে মন যেমন হয়, সারনাথে গিয়ে মন আমার ঠিক তেমনি হয়েছিল।"

'জোড়াসাঁকোর ধারে'-য় লিখছেন—

"লোকে বলে, যে তারাকে দেখি চোখে সে তারা লোপ পেয়ে গেছে বহু যুগ আগে। তার আলোর কম্পনটুকু দেখছি আমরা আজ তারারূপে। আমার

মনও কি তাই? প্রাণের সেই বহু যুগ আগে লোপ পেয়ে যাওয়া কম্পন ধরে দিচ্ছে আজকের ছবিতে লোক-চোখের সামনে। আর্টিস্টের মনের হিসেব আর কাজের হিসেব ধরতে যাওয়া ভুল। 'শাজাহানের মৃত্যুশয্যা'—লোকে কেন বলে এত ঠিক হল কী করে? আমিও ভেবে পাইনে। কী জানি, কোনো কালে কি ছিলুম সেখানে? বুঝতে পারিনি।"

এরপর আর দেরী হয় না এই দ্বিতীয় মানুষটিকেও জন্ম-জন্মান্তরের কবি হিসেবে চিনে নিতে অথবা মেনে নিতে। আমরা বিশ্বাস করে নিই এঁরা জাতিস্মর নন শুধু, স্মৃতিরও ঈশ্বর। আর সেই সঙ্গে বুঝে যাই এই দুই শিল্পীর, দুই কবির মনের গোপন কথাটিও এক—

"দূর পৃথিবীর গন্ধে ভরে ওঠে আমার এ বাঙালীর মন"

হ্যাঁ, এও আরেক পরিচয় যে, এঁরা উভয়েই বাঙালী। কিন্তু সে কী কেবল জন্মসূত্রে? না কি বাংলাকে ভালবেসে, বুঝে, খুঁজে, অস্থিতে-মজ্জায় তার রস টেনে, সৌন্দর্যে ডুবে, সুষমায় স্নান করে?

টমাস মানের মুখে আমরা শুনেছি যে, মানুষ যখন নিজেকে সঠিক জানতে পারে, তখনই সে হয়ে ওঠে আরেকজন মানুষ। এই কথাকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন অন্য ভঙ্গীতে। "মানুষের মধ্যে দ্বিজত্ব আছে; মানুষ একবার জন্মায় গর্ভের মধ্যে, আবার জন্মায় মুক্ত পৃথিবীতে। তেমনি আর-এক দিক দিয়ে মানুষের এক জন্ম আপনাকে নিয়ে, আরেক-এক জন্ম সকলকে নিয়ে।"

অবনীন্দ্রনাথ আর জীবনানন্দেরও তেমনি একটা জন্ম এই বাংলায়, আরেকটা সকল কিছুকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে মুক্ত পৃথিবীতে। বাংলাকে জেনে, তাঁরা জেনেছেন নিজেদের। তারপর তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন আরেক-রকম মানুষ—দেশ-দেশান্তরের, পৃথিবীর, অনন্ত সময়ের।

[illegible]

[illegible]

পাখির ডানার ঘ্রাণ

জীবনানন্দে প্রচুর পাখি। উপমায় পাখি। প্রতীকে পাখি। বিশেষণে পাখি। কবিতায় কবিতায়, পংক্তিতে পংক্তিতে, পাখিদের আনাগোনা, ওড়াউড়ি, খেলাধুলো। তাঁর কবিতা যেন বিশাল একটা সোনার খাঁচা। আর সেই খাঁচার দরজাটা যেন চিরকালের জন্যে খোলা। পাখিরা সেখানে যখন খুশী এসেছে, বসেছে, থেকেছে, খেলেছে এবং উড়ে গেছে।

এই সব পাখিরা, কখনো কখনো কবির জন্যে বয়ে এনেছে দূর পৃথিবীর খবরাখবর। কখনো কখনো কবির বার্তাকেই যেন তারা বয়ে নিয়ে গেছে দূর পৃথিবীতে। কখনো কখনো কবি তাদের কান্নায় ব্যথিত। কখনো কখনো তারাই হয়ে উঠেছে কবির কান্না। কখনো কবি তাদের উপহার দিয়েছেন অভিজ্ঞতার ব্যাপ্ত আকাশ। কখনো তারা কবিকে উপহার দিয়েছে অভিজ্ঞতার ঝরা পালক। হ্যাঁ, ঝরা পালক। তাঁর প্রথম কবিতার বইয়ের নামের মধ্যেই রয়েছে সেই প্রাপ্তি স্বীকার।

রবীন্দ্রনাথের গানে যেমন ফুল, জীবনানন্দের কবিতায় তেমনি পাখি। অনেক গোপন কথা, আপন কথা, জটিল কথার নির্ভরশীল বাহক তারা। সহৃদয় শ্রোতাও। বনলতা সেন যেদিন পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে আমাদের দিকে তাকালেন, সেই দিন থেকে আমাদের কবিতায়, আমাদের আধুনিক মননের যাবতীয় আলো-আঁধার, রোদ-কুয়াশার সঙ্গী হয়ে পাখিরা আকাশ ছেড়ে নেমে এল একেবারে ধরা-ছোঁয়ার, চেনা-জানার কাছাকাছি।

পাখি তাঁর এতই চেনা, পাখির সঙ্গে এমন নিবিড় সম্পর্ক যে এই জীবনের শেষে পরবর্তী জীবনে আবার তিনি পৃথিবীতে ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা জানান, পাখি হয়েই। কখনো বলেন,

"আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়, হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে ; "

কখনো সখেদে উচ্চারণ করেন,

"আমি যদি হতাম বনহংস
বনহংস হতে যদি তুমি"

আবার কখনো এই বাংলাকে তিনি স্থির বাসস্থান হিসেবে বেছে নেন, পাখিদেরই ভালবেসে।

"বাঁধিলাম ঘর এই শ্যামা আর খঞ্জনার দেশ ভালবেসে।"

"এই জীবনানন্দীয় আরণ্যপ্রকৃতি অসংখ্য প্রাণী পাখি কীটপতঙ্গের আসা-যাওয়ায় সতত চঞ্চল, প্রাণের নিছক উল্লাসে, অপচয়ে, আলস্যে স্পন্দিত হচ্ছে : থুরথুরে এক পেঁচা, একা পায়রা, অবিচল শালিখ, সোনালী চিল, কাকাতুয়া. মাছরাঙা, জলপিপি, কিংবা দুরন্ত শকুন। সন্ধ্যার আঁধারে ঘুমের ঘ্রাণ-পাওয়া হাঁস—পুকুরপাড়ে, স্ফটিক-পাখনামেলা বোলতা—নীলিমার ; শাদা বক—নীল হাওয়ার সমুদ্রে। শিকারীর গুলির আঘাত এড়িয়ে জ্যোৎস্নায় বুনো হাঁস উড়ে যায়। আরো আছে। পদ্য সাজানোর অলঙ্কার হিসেবে নয়, অবয়ব হয়ে কবিতায় মিশে।"

নরেশ গুহ

জীবনানন্দের কাব্য-চেতনায় পাখিদের এই যে বাঁধা-নীড়-এর শুরু শৈশবে, বাল্যের বরিশালে, প্রকৃতির ভিতরে তাঁর খেয়ালী খেলাধুলোর সকাল-সন্ধেয়। তাঁর সেই শৈশব কালের কিছু টুকরো ছবি এখান ওখান থেকে জড়ো করে দেখা যাক এবার।

১। "ছোটবেলায় আমরা মায়ের কাছে লেখাপড়া শিখেছি, সে পাঠ খুব বেশীক্ষণের নয়। খেলবার, বাগানে বেড়াবার, প্রজাপতির পিছনে দৌড়বার, ঘুড়ি ওড়াবার, প্রচুর অবকাশ ছিল।" অশোকানন্দ দাশ

২। "বাল্য ও কৈশোর কেটেছে মায়ের বাবার জ্ঞানযোগী প্রগাঢ় ব্যক্তিত্বের সৌরজগতের উত্তাপে, 'ভাবতে শেখার' উন্মেষে। আর বাকীটুকু ভরাট করে ছিল বই আর বই, বাগানের ভাণ্ডারে বিচিত্র রঙে-রসে মন ভরিয়ে দিয়ে অজস্র ফুল আর ফল।" সুচরিতা দাশ

৩। "বরিশালে বগুড়া রোডে আমাদের পাঁচ-ছয় বিঘা জমির উপরে বাড়ি ছিল। সেই জমির ঝোপের মধ্যে কোথায় আনারস ফলের গায়ে হলুদের ছোপ এসেছে, কাঁঠালগাছে কাঁঠাল কত বড় হল, কত আম হয়েছে নানান গাছে এসব তাঁর নখদর্পনে থাকত সব সময়েই, কখনও হিসেবে ভুল হতো না।"

অশোকানন্দ

৪। "বরিশালে তাঁকে আবাল্য অনেকগুলি বছর কাটাতে হয়েছে, সে-সব তাঁর পুষ্পকোরকের অনাদি বিস্ময়ে, আবার ভালোবাসায় আলোক দেখার দিন। তার পরে কর্মজীবনেও ঘুরে-ফিরে বরিশাল। অধ্যাপনার কাজে। ...যখনই কোনো প্রসঙ্গে বরিশালের কথা উঠেছে, তার প্রশস্তিতে তাঁর যেন আর মুখে কথা ধরে না। শেষের দিকটাতে অবস্থা এমনই হয়েছিল যে, ভাল থাকা মানেই বরিশালে যেমন ছিলাম, তেমন থাকা। ...আসলে বরিশালের সর্বপ্রকৃতিময় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উপকরণগুলোর সঙ্গেও তাঁর যেন এক অদৃশ্য প্রচুর কাছাকাছি জানাশোনা ছিল। যেন সব ছিল আপন, অনুদ্ঘাটনায় রহস্যের আলো-আঁধারিতে আপন। ......বসন্তের বুকে গৈরিক গ্রীষ্ম কঠোর সন্ন্যাসী দৃপ্ত পায়ে হেঁটে যেতে আসে। যদিও অগ্নিবরণ কৃষ্ণচূড়ার সমারোহ শেষ হয়নি তখনও, বাগানের সবুজ মেহেদীগাছের বেড়ার কিনারে যদিও আলো ছড়াচ্ছে তখনও একসারি ইটরঙের লিলিফুল, তবু আকাশে যেন তরল আগুন ছড়িয়ে গেছে, বাতাসে অগ্নিকণা। ইস্পাতের মত উজ্জ্বল আকাশের দিকে তাকিয়ে একটি মুগ্ধ কবিতাও ছটফট করে ওঠে অস্থিরতায়। কি অপূর্ব রুদ্র এই দীপ্তি, কি ভয়াবহ তীব্র দাহ, কি আশ্চর্য দৃঢ় ঔজ্জ্বল্য। মাঝে-মাঝে নিতান্ত 'নীলোৎপলপত্র কান্তিভিঃ কচিৎ প্রভিন্নাজনরাশিসন্নিভৈঃ' মেঘমালা দূর দিগন্ত ভরে ফেলে চোখের চাতককে দুদণ্ড তৃপ্তি দিয়ে যায়। তারপরেই আবার ডাকপাখির

চিৎকার, গাঙচিল ও শালিখের পাখার ঝটপট, মৌমাছির গুঞ্জরণ; উদার নিরালা দুপুর। সবুজ বনশ্রী, মাথার উপর শফেদা মেঘের সারি, বাজপাখির চক্কর আর কান্না।" সুচরিতা

বরিশালের এই প্রকৃতি, এই বন, বন-জ্যোৎস্না, বর্ণ-গন্ধ-ঘ্রাণ, আর এই পাখিদের অবিরল অজস্র রকমের সাড়া-শব্দ, হাঁক-ডাক, হই-হুল্লোড়, মোগল সম্রাটের সীলমোহরের মতো এক নক্‌শাময় ছাপ ফেলেছিল তাঁর গহন-চেতনায়। নিজের কবিতায় বর্ষার মতো ঝরিয়ে দিয়েছেন সেই সব। দেবার পরও ফুরোয়নি। কিছু ছিল উদ্‌বৃত্ত, অবশিষ্ট। সেগুলো ছড়িয়ে দিয়েছেন ইতস্তত তাঁর গদ্যের ভিতরে, গল্পে-উপন্যাসে। ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের ভিতরে উঁকি দিয়েছেন তিনি নিজেই স্মৃতি-গন্ধে ভারাতুর তাঁর ভিজে চোখ তুলে। আর সেই সূত্রেই অজস্র পাখির আনাগোনা ঘটে গেছে তাঁর গদ্যে।

১। "শান্তিশেখরের মনে হলো, মাস্টারমশাই মালার্মের দু-তিনখানা বই আলগোছে টু-শব্দ না-করে কোথায় যেন রেখে দিলেন। মনে হলো, আমলকী-পল্লবের থেকে শিশির ঝরে পড়ল যেন হেমন্ত রাতের পাখির পালকে··· ।"

বিলাস

২। "রাজহাঁসের মতো ঘাড় কাত করে বইগুলোর দিকে তাকিয়েছিল শান্তিশেখর।" বিলাস

৩। "শান্তিশেখরের মনে হল, কোন এক অন্ধকার থেকে তাদের কবেকার ইস্‌কুলের মৃত হেডমাস্টারমশাই অপরেশবাবু তাকে বলছেন, 'বিলাসী তোমার মন, শান্তিশেখর। কী যে রাজহংসী খুঁজে মরছ তুমি—কী যে বালিহাঁস কাদা-খোঁচা খুঁচে মারছে তোমাকে! কিন্তু তারাও পাখির মতো চোখ তুলে তাকাতে-না-তাকাতেও পালকের সোঁদা গন্ধ হাওয়ায় হারিয়ে যায় বুঝি? শূন্যে মিলিয়ে যায় তারা? তারাও?' তা যায়; তা যাক; তাদের জন্যে কোনো খেদ নেই।" বিলাস

৪। "রেবা বললে, 'কেন ডাকছিলে?'

খাঁচার পাখি যেন ছাড়া পেয়েছে—গলার স্বর এমনি। আমিও আকাশটাকে ফিরে পেয়েছি। পেয়েছি ফিরে আকাশের যা-কিছু আলো—সবটুকু।" ছায়ানট

ছোট গল্প থেকে চলে আসি উপন্যাসে। তাঁর 'মাল্যবানে' পাখিদের ভূমিকাটাও যে কতখানি মূল্যবান, সেটা এখুনি শরতের রোদের মতো ঝলমলিয়ে

উঠবে আমাদের সামনে।

১। "এখন নিচের ঘরে যেতে হয়। কিন্তু তবুও মাল্যবান গেল না সহসা। মশারীর খুঁট তুলে এদের খাটের পাশে পাড়াগাঁর পউষ রাতে নিশ্চুপ ডানার পাখির মতো এসে স্নিগ্ধ নৈঃশব্দ্যে—এদের জাগিয়ে?—বসে থাকতে চায়।"

২। "একটি স্ত্রীলোক মিষ্টি হোক, বিষ হোক, ঠাণ্ডা হোক, আমার জীবনের রাখা-ঢাকা সবুজ বনে আতার ক্ষীরের মতো কথাগুলো শুনতে আসবে—সে পাখি ও নয়। ওর চেহারা যদি কালো, খারাপ হতো—তাহলে তো চাষার মেয়েরও অযোগ্য হত। একটা মোদ্দাফারসকে নিয়ে ঘর করছি আতাবনের পাখির মতো—সেই-সেই-পাখিনীকে চেয়ে আমি—"

৩। "একটা পাখি সৃষ্টি করে তাকে যদি ইঁদারার অন্ধকারে ফেলে দেওয়া হয়—তেমন ছটফট করে উঠতে লাগল মাল্যবানের ভিতরটা।"

৪। "মাল্যবান মাঝে-মাঝে অবাক হয়ে ভাবে—কথা ভাবে। কথা ভাবা কালো ধুমসো পাখিদের নীড় তার মাথাটা, আচমকা একটা সিগারেট জ্বালিয়ে বা দড়াম করে জানালার কপাটটা খুলে ফেলে পাখিগুলোকে উড়িয়ে দেয় সে।"

৫। "শেষ রাতের একটা বসন্তবউরি পাখির মতো একরাশ নক্ষত্র ও অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়বার আগে একটু চলকে উঠে হেসে জেগে উঠবার বেঁচে থাকবার ইচ্ছা অনিচ্ছা অতিক্রম করে (মাল্যবানের মনে হল) কে যেন উৎক্রান্ত হয়ে গেল।"

৬। "হড়বা বানের ঠাণ্ডা স্রোতে যেন মুর্গি আমি হাঁসের মতো সাঁতার কাটতে চাচ্ছি, বাজপাখির মতো উড়ে যেতে চাচ্ছি। আমার জীবনের বানচালের ব্যাপারটা এই রকম।"

৭। "পাড়াগাঁর বাড়িতে প্রকাণ্ড বড় উঠোন ছিল তাদের, ঘাসে ঢাকা, কোথাও বা শক্ত সাদা মাটি বেরিয়ে পড়ছে, তারই ওপর সারাদিন খেলা করত রোদ, ছায়া, মেঘের ছায়া, আকাশের চিলের ডানার ছায়া রোদে দ্রুততায় চলিষ্ণু হীরেকষের মতো তার ছুটকানো। শালিখ উড়ে আসত উঠোনে; খড়ের চালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত বক—এই সরোবর থেকে সেই সরোবরে যাবার পথে, ডানায় তাদের জলের গন্ধ, ঠোঁটে রঙের আভা চকিত চোখ দূরের দিকে—নীলিমার দিকে। কত উঁচু উঁচু গাছ ছিল উঠোন ঘিরে; সারাটা শীতকালে ঘুঘুর ডাকে জারুল ঝাউ পাৎবাদাম আমের বন নিম ছিজলির জঙ্গল যেমন করে

ফুকরে ফুকরে উঠত—রোদের দিকে পিঠ রেখে নিজের শরীরটাকে একটু এলিয়ে দিলে সমস্ত শরীর ঘুমে ভ'রে উঠত সেই পাখির ডাকে। মাঝে মাঝে উঠোনে এসে পড়ত ঘুঘু, যেমন কলের মতো, পাখিদের দেশে ক্ষুদে ঢেঁকির পাড়ের মতো ঘুঘুদের লেজগুলো উঠত-পড়ত, উঠত-পড়ত—ঘুর ঘুর করে ছুটে যেত তারা মাঠে-ঘাসে—কী খুঁজত—কী চাইত? সেই পঁচিশ-তিরিশ বছর আগের শীতের ভোরের কুয়াশার ভেতর সেই সব পাখি যেমন পৃথিবীর মনে কোনো দিন ছিল না; আজকের পৃথিবীটা কলকাতার বাণিজ্যশক্তির গোলকধাঁধা দিয়ে এমনি অদ্ভুত অপৃথিবী। ফিকে কফির কোকোর মতো রঙের গলা ফুলিয়ে কত পাতি-কাক উড়ে আসত খড়ের চালে, উঠোনে; শন শন করে উড়ে যেতো ঠাণ্ডা জলের ওপর দিয়ে ছুঁই ছুঁই করে কোনো নদীকে কোনো দীঘিকে না ছুঁয়ে, জলের ভেতর ঝাপসা প্রতিফলিত হয়ে, শাঁ শাঁ করে কোথায় থেকে উড়ে যেত তারা কোথায়; সকালের কুয়াশার দিক থেকে দূর বিদিকের পানে উড়ে যেত সেই কাকগুলো পৃথিবীটাকেই টেনে বার করবার জন্যে, উজ্জ্বল সূর্যটাকে সবাইকে পাইয়ে দেবার জন্যে—যারা কাক নয়, পাখি নয়, তাদের জন্যেও—ক-ক্‌-ক-ক্‌—যেমন শতচেতনার হাঁকডাক, সালিশি, নির্জনতা।"

৮। "সকালবেলা কুয়াশার ভেতর দিয়ে এক-একটা কাক মাল্যবানের বারান্দার রেলিং-এর ওপর উড়ে আসে, কুয়াশার এলোমেলো ছেঁড়াছিঁড়ির ভেতর দিয়ে ডানা মেলে গোলদীঘির দেবদারু, নিমগাছের দিকে মিলিয়ে যায়; প্রকৃতির দিঙনির্ণয়ী মন নড়ে ওঠে যেন। কুহক অনুভব করে মাল্যবান।"

৯। "শীতের রাতের তুলোওঠা গরম লেপের ভেতর স্খলিত হতে-হতে যখন নারী প্রেম নাগরী প্রেম এমন কি গ্রন্থি-মাংসে গিয়ে আঘাত করতে লাগল, তখন মাল্যবান পাড়াগাঁর ছেলেবেলার কত ছোলার ক্ষেত, বড়ো দীঘি, চাঁচের বেড়ার ঘর, শীতের রাতে গোয়ালের গরম খড়ের গাদি, ফোড়নের মতো চারিদিকে শিশির ভেজা মাঠ, পেঁচার পাখার খসখসানি, দূরে সুভাবনীয়তম কালো পাখির ডাক—সময়ের ভাঁড়ার ভেঙে মাল্যবান বার করতে লাগল এই সব।"

পাখির প্রাণোচ্ছল উপস্থিতি তাঁর শেষ উপন্যাস, 'সুতীর্থে'ও। কোনো বিশেষ মুহূর্তে একটি বিশেষ চরিত্রের অন্তর্গত চেতনা বা মানসিকতাকে বোঝাবার জন্যে জীবনানন্দ পাখিকে কাজে লাগিয়েছেন বারংবার। আর তাঁর সবকটি নায়ক-চরিত্রের স্বভাবের গড়ন এমনিই যে অতীতকে মনে করতে গেলেই ঘুরে

ঘুরে পাখির ঝাঁক এসে হাজির হয় সামনে অথবা তিনিই হারিয়ে যান পাখির ঝাঁকের অনন্ত শান্তির অভ্যন্তরে। জীবন-যাপনের চৌকো চৌহদ্দীর সীমা ছাড়িয়ে দূরে তাকাতে গেলেই চোখ আটকে যায় কোনো না কোনো পাখিতে। এমনকি যখন মানুষের রক্ত-মাংসের বিকার বা বিকৃতিকে আমাদের সামনে গভীর ক্ষত চিহ্নের মতো ফুটিয়ে তুলতে চান, তখনও তাঁর শ্রেষ্ঠতম অবলম্বন, পাখি। 'সুতীর্থ' উপন্যাসেও এই সব লক্ষণ অপর্যাপ্ত।

১। "কী মুশকিল ও রকম আছড়ে পিছড়ে গোঁত্তা মারছ কেন হা-হা বাঁটের বাছুরের মতো হাসছে না কাঁদছে, শোন বলি—দেখনা বিজন অসিত—ছাড়বে না তুমি আমায়, ছাড়বে না, সুতীর্থ! তু-মি—আ-মা-য়—ছা-ড়-ড়-ড় ছা-ড়-বে—না—আ—আ—আ—, খুব একটা প্রবল ঝটকায় বিরূপাক্ষ ছিটকে পড়ল সমস্ত তেপয় ও কফির পেয়ালা পিরিচ নিয়ে আলমারিটার উপর, সুতীর্থ তার মস্ত বড় লম্বা শরীর ও এলোমেলো ঝুলের ফিতের ঠ্যাং ডানার ঝাপটানি নিয়ে টান হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দু-এক মুহূর্ত।"

২। "পাখিদের ডানা গজায় যেখানে সুতীর্থদের শরীরের সেই জায়গাটা আঁকড়ে টেনে ফুটপাতে তাকে চড়িয়ে দিয়ে ভবতোষ বললে— ।"

৩। "কী কাজ তোমার—কী কাজ আছে এই ব্যাগের ভেতর? পরিবার নিয়ে আছ কলকাতায়? যাচ্ছিলে কোথায় শীত-রাতের লক্ষ্মী পেঁচার মতো—"

৪। "রৌদ্রের দিনে হঠাৎ এক ঝাঁক যাযাবর কাকাতুয়া উড়ে এসে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লে যে রকম বুক ধড়ধড় করে তেমনি কেমন একটা আশ্চর্য স্পর্শে চমকিত হয়ে হেড নাপিত মধুমঙ্গল ভাবছিল—"

৫। "রোদের ভেতরে পালকের ঝাড়ে এক ঝাঁক আশ্চর্য চন্দনা পাখি আগেই তার ঘরের ভেতরে এসে পড়েছে—এবারে পক্ষীমাতা নিজে এল যেন অনেক রোদ ছড়িয়ে বাতাস উড়িয়ে।"

৬। "হাতের সিগারেটের আগুনে আর একটা নতুন সিগারেট ধরিয়ে নিতে গিয়ে এক আধ মুহূর্ত চুপ করে বসে রইল বিরূপাক্ষ। বাইরে রোদ, নীলিমা ঘরের ভেতরে মেঝের ওপর দেওয়ালের গায়ে ডানার ছায়া ফেলে অদূর দিগন্তের পুরুষ চিল মহিলা পাখির সংক্রমণ…"

৭। "বয়সের সবচেয়ে ভালো সময়টাকেই পাখি বানিয়ে আকাশে ছেড়ে না দিয়ে চোখ উপড়ে মাটিতে ফেলে দিল জয়তী— ; গাইয়ে পাখিটাকে খুপরীতে

ঠেলে দিল তারপর ; অন্ধকারে ভাল গান হবে বলে।"

৮। "মহিলা একজন নিবিড় নিশীথ-ঠুঁটি স্বর্গীয় পাখির মতো নিমেষনিহত হয়ে ভাবছিল—"

৯। "মানুষ : মানে যারা মারণযন্ত্র, শেল তৈরী করতে পারে? তার চেয়ে যারা তালপাতার ব্যাগ তৈরী করতে পারে তারা বেশী মানুষ। যারা একশোবার করে আমেরিকায় এশিয়ায় কনফারেন্স পাতায় আর ভাঙে, পরস্পরকে বজ্জাত বলে গালাগাল দেয়, একেবারে উৎখাত করে ফেলবার ফিকিরে থাকে, তারাই তো মানুষ এখনকার পৃথিবীতে, আর তাঁদের তাঁবেদাররা—ব্যাঙ্কে—আপিসে—ডিপার্টমেন্টাল চেম্বারে বসে পৃথিবীর সর্বত্র। এর চেয়ে বেশী মানুষ মনে করি আমি যারা নদীর পারে হোগলার ক্ষেতের পাশে বসে তাকিয়ে দেখে কি করে বাবুই পাখিগুলো বাসা তৈরী করে, তেমন শান্তিতে তেমনি নীড় মানুষের জন্যেও তৈরী করবার প্রেরণা পায় তারা, কিন্তু তারপরেই উপলব্ধি করে মানুষ তো মারীবীজ হাঁকিয়ে চলেছে পৃথিবীতে—বাবুইদের সঙ্গে মানুষের তো কোনো মিল নেই—কি করে স্থিরতা পাবে মানুষ পৃথিবীতে—কি করে শান্তি পাবে?"

১০। "থেকে থেকে মনে হচ্ছিল সুতীর্থের ঘরের ভেতর যেন একটা রাধা-ঠঁটি পাখি ঘিয়ের মতো ডানা পালক মেলে ঝরঝর জলজল ঝরঝর জলজল বসন্ত রাতের হিজল বনের নদী নির্ঝরের মতো শব্দে কথা বলে গেল।"

১১। "মানুষের গুলি এড়িয়ে আকাশের অন্তহীন নিরাপদের ভেতর বুনো হাঁস দম্পতীর মতো নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল জয়তীর বুকের ভেতর থেকে।"

এই সব পড়তে পড়তে পাখির কলরোলে, ডানার শব্দে, তাদের দ্রুত পরিবর্তনময় ভঙ্গী বদলের চমকে চমকে, আমরা যখন ঘোর আচ্ছন্ন, তখন বুঝতে পারি জীবনানন্দ সারাজীবন ধরে পালন করে গেছেন তাঁর কৈশোরের প্রতিশ্রুতি— "Like the Robin I would chirrup and out pour".

ছাত্রজীবনে লেখা ইংরেজী কবিতার পোকা-কামড়ানো খাতা থেকে উদ্ধার করা অল্প কয়েকটি কবিতার একটিতে এই ছত্রটি, তাঁর জীবনের একাধিক সদিচ্ছা, এবং সংকল্পের অন্যতম।

জীবনের প্রথম গদ্য কবিতায় অবনীন্দ্রনাথ নিয়ে এলেন পাখিকে। আর সে কবিতার প্রথম স্তবকেই পাখির সুর, পাখিদের সমাগম—

"জেগে ওঠার কিনারায় সুরের পাড় বোনে পাখী—
একটি পাখী, না-দেখা পাখী, কানে-শোনা পাখী !
উত্তর-পাহাড়ের নিঃশ্বাস-মন্ত্র আগ্‌লে রাখে
কুয়াশার যাদু দিয়ে ;
পাখীকে চিনতে দেয় না, দেখতে দেয় না !"

পাখির সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা অবনীন্দ্রনাথেরও একেবারে ছেলেবেলা থেকে। পাখির সঙ্গে, পাখি এঁকে, পাখি গড়ে, পাখির মতোই জীবন কাটিয়ে গেছেন তিনি। পাখি পোষার সখ ছিল বাবা গণেন্দ্রনাথের। তাঁর কাছ থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে এই সখ চলে এসেছিল ছেলের রক্তে।

"বিকেলে ছোট পিসি পায়রা খাওয়াতে বসতেন। ঘরের পাশেই খোলা ছাত ; সেখানে কাঠের খোপে, বাঁশের খোপে, পোষা থাকতো লক্কা, সিরাজী, মুক্ষী কতো কী নামের আর চেহারার পায়রা। খাওয়ার সময় ডানায় আর পালকে ছোট পিসিকে ঘিরে ফেলতো পায়রাগুলো। সে যেন সত্যিই এক পাখির রাজত্ব দেখতাম। বাবামশায়েরও পাখির শখ ছিলো, কিন্তু তাঁর শখ দামী দামী খাঁচায় পাখির, ময়ূর, সারস, হাঁস এসবেরই।" আপন কথা

আবার জোড়াসাঁকোর ধারে-য় পড়ি।

"বাবামশায় বিকেল হলে মাঝে মাঝে এসে বসেন ফোয়ারার ধারে। ফোয়ারাটির মাঝে একটি কচি ছেলের ধাতুমূর্তি আকাশের দিকে হাত তুলে। উঁচু হয়ে ফোয়ারা থেকে জল পড়ছে, আশেপাশে পাখিরা গাইছে, ফুলের সুবাস ভেসে আসছে, তারই মাঝে বাবামশায় বসে। মস্ত বড় একটা ঝিল তৈরি হল এক পাশে।…দলে দলে হাঁস চরে বেড়ায়। ঝিলের এক পাড়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বটগাছ, তলায় সারস-সারসী, ময়ূর-ময়ূরী, রুপোলি সোনালি মরাল দলে দলে খেলা করে। তার ওদিকে হরিণ বাগানে, পালে পালে হরিণ একদিক থেকে আরেকদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। …আর একদিকে ফুলের বাগান। বাগানে সুন্দর সুন্দর খাঁচা। সেকি খাঁচা, যেন এক একটি মন্দির ; সোনালি রঙ, তাতে নানান জাতের রঙ-বেরঙের পাখি, দেশ-বিদেশ থেকে আনানো, বাবামশায়ের বড়ো শখের।"

এ হল অবনীন্দ্রনাথের মুখে তাঁর বাবামশায়-এর ছবি। এবার শুনবো মেয়ে উমা দেবীর মুখে তাঁর বাবামশায়-এর পাখি নিয়ে খেলাধুলোর কথা।

"আমার বিয়ে হয়েছিল দশ বছর বয়সে, তখন আমি বেথুন স্কুলে পড়ি। মনে পড়ে, সেই সময় বাবার খুব পাখি পোষার শখ হয়েছিলো। কতো রকমের খাঁচা তৈরী করে কতো রঙ-বেরঙের পাখি পুষেছিলেন। খাঁচার ভিতরে গাছের ডাল দেওয়া হলো, বাসা তৈরী হলো ডালের ফাঁকে ফাঁকে আমার দাসী তার দেশ থেকে বাবাকে বাবুইপাখির বাসা এনে দিত। বাবা সেগুলো গাছে টাঙিয়ে তাতে খাবার দিয়ে রেখে যেতেন—কতো পাখি এসে তাতে আশ্রয় নিতো। বাবা তখন বৈষ্ণব পদাবলী থেকে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র আঁকছেন—তাঁর জন্ম থেকে দেহত্যাগ পর্যন্ত। কতো কোকিল, শালিখ, ময়না কিনে বাগানে ছেড়ে দিতেন। এক একদিন পাখিশুদ্ধ খাঁচার দরজা খুলে দিতেন বাবা, বলতেন, 'ওরা আমার বাগানেই থাকবে, কোথাও যাবে না।' মনে হয়, নিজের বাগানেই তিনি বৃন্দাবনের রূপ দেখতে চেয়েছিলেন।"

এই বাবামশায়-এরই আরেক রকম ছবি, যখন তিনি মোহনলালের দাদামশায়।

"'সামার হাউস'-এর একটা অংশ ছিল জাল দিয়ে ঘেরা। ঘেরা অংশের মেঝে ফুঁড়ে বসানো ছিল ডাল-পালাওয়ালা একটা গাছের শুকনো গুঁড়ি। এটি এককালে ছিল দাদামশার পাখির খাঁচা। দাদামশায় পালে পালে পাখি কিনে এনে এই খাঁচার মধ্যে ভরতেন। তারা জল খেয়ে, দানা খেয়ে, গাছের ডালে বসে কটা দিন কাটাত, তারপর দাদামশায় আস্তে আস্তে তাদের ছাড়তে আরম্ভ করতেন। দাদামশার বিশ্বাস ছিল এইভাবে ছেড়ে দিলে তারা জোড়া-সাঁকোর বাগানের পরিসীমার মধ্যেই থেকে যাবে।...বাগানের মধ্যে তাদের ভুলিয়ে রাখার জন্যে ডালে ডালে বাসা বেঁধে দেওয়া হত। ঝোপ ঝাড় কুঞ্জবন বানিয়ে তাদের নিরালা নির্ভর জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করা হত। ঘর বাঁধুক, বাচ্চা পাড়ুক, সংসার পেতে বসুক—এই ছিল দাদামশার মনের ইচ্ছে। মায়ায় পড়ে পাখিরা রয়ে যেত কিছুদিন জোড়াসাঁকোর ঐ বাগানে। তারপর কবে আবার বনের দুর্বার ডাক এসে পৌঁছত। একদিন দেখা যেত বনের পাখিরা সব বাগান ছেড়ে পালিয়েছে।"

দক্ষিণের বারান্দা

চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথ পাখি এঁকেছেন অজস্র, সৃষ্টির পর্বে পর্বে, প্রত্যেকবার রঙ পালটিয়ে, ঢঙ পালটিয়ে। কখনো এঁকেছেন নিখুঁত ওয়াশে। কখনো প্যাস্টেলে। আবার চণ্ডীমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল চিত্রমালার সময় তুলির সবল

কচ ও দেবযানী

টানে, মোটা রঙে। কোনো পাখি বাদ নেই তাঁর তুলিতে। ময়ূর এঁকেছেন একাধিক। কাক, বক, শালিখ, চড়ুই, টিয়া, কাকাতুয়া, পেঁচা বাদুড় সকলেই তাঁর চিত্রশালায়, অতিথি নয়, স্থায়ী বাসিন্দা। এঁকেছেনও বারে বারে। দেখেছেনও বারে বারে।

"মুসৌরীতে দেখেছি, ঘুরেছি। অনেককাল বাদে বের হল পাখির ছবি-গুলি। সেখানে থাকতে ছবি আঁকিনি ; ঘুরে ঘুরে দেখেছি, পাখির গান শুনেছি শহরের পাখিগুলো গান গায় না, চেঁচায়—খাবার জন্যে চেঁচায়, বাসার জন্যে চেঁচায়, মারামারি করে চেঁচায়।

বলব কি মুসৌরী পাহাড়ের পাখিদের গানের কথা।...দূরের পাহাড়ে একটি পাখি একটু সুর বলে, সেখান থেকে আর একটি পাখি সে সুর ধরে নিলে। এমনি করতে করতে সমস্ত পাহাড়ে প্রভাতবন্দনা শুরু হয়ে গেল।"

জোড়াসাঁকোর ধারে

জীবনের শেষ পর্বে যখন পা, যখন হাত থেকে খসে পড়েছে তুলি, যখন কালির রঙে মন রাঙে না আর, তখন হাতে নিলেন প্রকৃতির হাতের উচ্ছিষ্ট। এক টুকরো ভাঙা ডাল এ গাছ থেকে, শুকনো ডাল ও-গাছ থেকে, মচকানো ডাল বাগানের শুকনো পাতার আড়াল থেকে। সেই সঙ্গে ভাঙা কাঠের টুকরোটাকরা, আবর্জনার তলা থেকে কোন একটা শিশির মুখ, যন্ত্রপাতির বিকল দেহের হাড়-পাঁজরা, এই সব বাজে জিনিস, হিজিবিজি, আবোল-তাবোল। আর তাই নিয়ে শুরু হল তাঁর নতুন খেয়ালি খেলা, কুটুম কাটাম। সেখানেও অঢেল পশুপাখির আনাগোনা। সেখানেও ছোট পাখি, বড় পাখি, রাঙা পাখি, অনেক, অগুনতি। তাদের গাঁয়ে আঁচড় নেই রঙের, আদর নেই তুলির। তবুও যেন দেখতে পাওয়া যায় তাদের পালকের রঙ-বাহার, তাদের চোখে আকাশের নীল ছায়া, তাদের ডানায় রোদ-জ্যোৎস্নার আলো।

রাণী চন্দের 'শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ'-এ এই সব পাখির প্রসঙ্গ অজস্র।

১। সেবার মুসৌরী পাহাড়েই আর একদিন বেরিয়েছি বিকেলে। যাবার পথে দেখি একটা চেরী গাছ। গাছে পাতা নেই, ফুল নেই ; খালি খালি ডালগুলি আকাশের গায়ে—কেমন যেন ব্যথা লাগল বুকে। আহা! এই গাছ যখন ফুলে ভরে ওঠে—কত বাহার তার। ফেরবার পথে—সন্ধ্যে হয়ে আসে আসে—পা চালিয়ে ঘরে ফিরছি, সেই চেরীগাছের কাছে এসেই থমকে

দাঁড়ালুম। একি! খাবার সময়ে দেখে গেলাম খালি ডাল, আর এরই মধ্যে গাছটা ভরে গেছে—কচি কচি সবুজ পাতা হাওয়ায় দুলছে।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি আর চোখের পলক ফেলে ফেলে দেখছি—ঠিক দেখছি কি না। এমনি দেখতে দেখতে এক সময়ে কচি পাতাগুলো ঝাঁক বেঁধে যেন হাওয়ায় উড়ে গেল। ছোট্ট ছোট্ট এই এতটুকুটুকু সবুজ পাখিগুলি, বুকটা সাদা; এসে বসেছিল দল বেঁধে চেরী ডালে।"

২। "গল্প পড়ে শোনাচ্ছিলাম তাঁকে। শুকনো তালপাতার আধপোড়া একটি ছোট ডাঁট কুড়িয়ে এনে রেখেছেন ঘরে কবে কোন দিন। তালপাতা যেখান থেকে বের হয় ঠিক সেই জায়গাটা। মালী বা দারোয়ান কেউ হয়তো জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করেছিল তা, শুকনো পাতাগুলি পুড়ে গেছে, শক্ত ডাঁটের কাছটা ছিল অমনি পড়ে। সেটা কোথা থেকে দেখা গেল গড়াতে গড়াতে এসে পড়েছিল তাঁর পথের পাশে। বেড়াতে বেরিয়ে নজর পড়ল অবনীন্দ্রনাথের। তুলে এনে রেখে দিলেন ঘরে। আমার পড়া শেষ হলে বলে উঠলেন, কানে শুনছিলুম তোমার লেখা আর দেখছিলুম কোণার ওটিকে—ওই তালপাতার ডাঁটটিকে। দিব্যি একটা পাখি। আনো দেখি কাছে।

এনে দিলাম।

বললেন, এই দেখো পাখির লেজ, ডানা, সবই ঠিক আছে, কেবল একটি মুখ বসিয়ে দিলেই, ব্যাস ময়ূরটি।

সরু ডালের টুকরো একটা সঞ্চয় করা সামগ্রী হাতে তুলে নিয়ে জুড়ে দিলেন তাতে। চমৎকার একটা ময়ূর হয়ে গেল নিমেষে পোড়া ডাঁটের।

বললেন, আনো একখানা কাগজ, এঁকে ফেলি এর ছবি।

ছবি আঁকতে লাগলেন। আঁকতে আঁকতে বলতে লাগলেন, "এ যক্ষপুরীর ময়ূরী। যক্ষের বিরহে পুড়ে পুড়ে রঙ-টঙ এর কোথায় চলে গেছে!"

৩। "অবনীন্দ্রনাথ এ সময় ছবি আঁকতেন চোখে দেখা অতি কাছের সাধারণ বিষয়বস্তু নিয়ে। কিন্তু আঁকতে আঁকতে তাকে যে কোথায় নিয়ে তুলতেন, নাগালের কত উপরে উঠে যেত সে ছবি।

জানলার পাল্লায় একটা চড়ুইপাখি এসে বসল; অবনীন্দ্রনাথ বললেন, দাও একটা কাগজ, এই চড়ুইপাখিটাকে আঁকি।

কাগজে চড়ুইপাখির দাগ পড়তে-না-পড়তেই তো সে পাখি উধাও। কিন্তু

আঁকা হল রঙে গড়নে অতি সুন্দর করে সেই চড়ুইপাখিকে।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, "এ যে ভোরের চড়ুইপাখি। রবিকা কবিতা লিখেছেন একে দিয়ে।"

৪। "পূর্ণিমা একটি নতুন ছবি এঁকেছে কলাভবনে বসে। এনে দেখাল অবনীন্দ্রনাথকে। শান্ত রঙ, যেন সকালবেলায় আলোয় বাগানের একটা কোণ।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, বেশ হয়েছে।

কাগজের মাঝখানে কী একটা দোষ, একটা জায়গায় একটু উঁচু হয়ে আছে।

তিনি বললেন, এটা যে করকর করে, চোখে লাগে, মনেও লাগে।

পূর্ণিমা বললে, ও নেপালী কাগজের দোষ। আমি কী করব বলুন।

বললেন, তা অমনি রাখা তো চলবে না। দে একটা পাখি করে ওখানে। সকালবেলার শান্ত সুর, আকাশের আলো যেন হালকা কুয়াশায় ঢাকা, এইখানে এই নিঝুম ভাবটি রাখতে হবে। একটা সাদা পায়রা বসিয়ে দে দেখিনি। যেন নিঝুম পাখিটি এসে বসেছে নীড় ছেড়ে, কুয়াশা কেটে গিয়ে রোদের তাপ একটু গায়ে লাগলেই উড়ে যাবে আকাশের গায়ে। বলে, নিজেই বসিয়ে দিলেন পায়রাটি সেখানে। বসিয়ে দিলেন নয়, যেন ছিলই সেখানে পায়রাটি বসে, তিনি ফুটিয়ে দিলেন মাত্র। বললেন, এই সব ভেবে, তবে ছবি আঁকতে হয়। সব সুরের একটি কনসার্ট : এই হল ছবি।"

একটু-এতটুকু ছোট-খাটো পাখিদের দিকেও তাঁর সমান নজর। গাছের জ্যান্ত পাখির দিকে তো আছেই। মাটির তৈরী মরা পাখিও আদরের ধন।

শিষ্য অসিত হালদার তখন লক্ষ্ণৌ-এর আর্ট কলেজের প্রিন্সিপাল। অবনীন্দ্রনাথ একবার তাঁকে চিঠিতে লিখছেন—

"তুমি তো সেখানে আর্ট স্কুল-এর কর্তা কিন্তু আজ তোমায় একটা নতুন ও চমৎকার জিনিসের খবর দিই, যা লক্ষ্ণৌ-এ তৈরী হয়ে বিক্রি হচ্ছে, অথচ এতদিন তোমরা সে আর্টটার খবর নাওনি একেবারেই।

আমার কয়েক আত্মীয় এবার লক্ষ্ণৌ থেকে এক টিনের বাক্স ভর্তি মাটির পুতুল এনেছেন, তার মধ্যে দেখলুম কতকগুলি এক ইঞ্চি পরিমাণ মাটির গড়া নানান রকম পাখির মূর্তি, অতি মজাদার খেলনা।··· তুমি যদি খেলনার খোঁজ নিয়ে দুই সেট পাখি এবং দুই সেট চতুষ্পদ ইত্যাদি কমপ্লিট সেট কিনে আমাকে

ভাল করে প্যাক করে ভি পি-তে পাঠিয়ে দাও তো তোমায় শুভশত আশীর্বাদ করি।"

অবনীন্দ্রনাথের পুষতে পাখি, দেখতে পাখি, আঁকতে পাখি, গড়তে পাখি আবার লিখতেও পাখি। পাখির উপমা ছাড়া যেন কইতে জানেন না কথা, এমন নিবিড় আত্মীয়তা তাঁদের সঙ্গে। লিখছেন নিজের রবিকাকার গান নিয়ে প্রবন্ধ। উড়ে এল পাখি।

"সে দিন আর ফিরবে না। তারপর গানের পর গান ওঁর কত শুনেছি, সেই প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত ওঁর কত গানই শুনেছি, কিন্তু সে রকম আর শুনলুম না। যৌবনের পাখি চলে গেছে, আর এক পাখি এসেছে।"

তাঁর রচনায় পাখিকে খুঁজতে হয় না, ডাকতে হয় না। হাত বাড়াবার আগেই হাজির, চোখের চাতালে।

"তাঁর বড় তিনটি বইও মূলত পাখির পুরাণ"

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আর সে তিনটে বইকে চিনে নিতে চোখের এক-পলকের বেশী সময় ব্যয় হয় না আমাদের। বুড়ো আংলা, আলোর ফুলকি আর খাজাঞ্চীর খাতা।

"এই পক্ষীরূপকই রচনা করেছে গুরুদেবকে ; এই পাখিদেরই আবার রচনা করেছেন গুরুদেব।" এই বলে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন শিষ্য প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর। তাঁর কাছ থেকে আরও জানতে পারি—

"ঐ আকাশচারী পাখির দলই গুরুদেবের ছিল সত্যিকারের সখা। ওরাই তাঁরই কাছে বহন করে নিয়ে আসত, রূপময়, বর্ণময় গন্ধর্বলোক থেকে, তার চিত্রকানন থেকে,—এক পৃথিবী-ভোলানো সঙ্গীত, যে সঙ্গীতটির অগ্নিমাধুরী কানের মধ্যে প্রবেশ না করলে কোনো মরণশীল মানুষই রূপ দেখবার অধিকারী হয় না।...উপরকার আলো আর নীচেরকার মৃত্তিকার মাঝখান দিয়ে ওরাই ছিল তাঁর সম্বন্ধ-সূত্র।"

উপনিষদের সেই 'দ্বা সুপর্ণা' থেকে, পুরাণের গরুড়, রূপকথার ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী, শুক-সারী থেকে বাংলার পাড়া-গাঁয়ের পোড়া মাটির পুতুল পর্যন্ত ছড়ানো এই যে বিরাট জগতটা পাখিদের দখলে, অবনীন্দ্রনাথ দুহাত ভরে কুড়িয়েছেন সেইখান থেকে নিজের প্রয়োজনের উপকরণ। তারপর গায়ে পরিয়েছেন পছন্দসই পোশাক, মুখে বসিয়ে দিয়েছেন পছন্দসই ভাষা, রেখে দিয়ে গেছেন তাদের বাংলা

সাহিত্যের সোনার খাঁচায়, আমাদের চিরকালের খেলার অথবা মেলা-মেশার সঙ্গী করে।

তিনি যে শুধু পাখি দেখেছেন লিখেছেন এবং এঁকেছেন, সেইটুকুই সত্য নয়। কৌতুক করে বলে গেছেন, পাখিদের ভাষা বুঝবার 'শকুন-বিদ্যে'টাও জানা আছে তাঁর। এ তথ্য তিনি জানিয়েছেন নিজেরই এক গল্পের ভিতর দিয়ে।

"দেখতে পাচ্ছি তোমার পেটে…'শকুন-বিদ্যে' রয়েছে। জগতে এ-বিদ্যে অতি কম লোকেই পায়।…এদেশে এক অবনী ঠাকুর আর তোমাতে এই বিদ্যে অর্সেছে দেখছি। খবরদার—এ বিদ্যের কথা কাউকে জানতে দিও না।"

তাঁর এই 'শকুন বিদ্যে'কে আজগুবি-উক্তি বলে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যতটা সহজ, তাঁর সমগ্র রচনাবলীতে পাখিদের সংলাপগুলোকে মিথ্যে বলে অস্বীকার করা ঠিক ততটাই কঠিন। সেখানে—

১। কাকের মুখে কখনো—কই কই। কখনো—রও রও।

২। প্যাঁচার মুখে—হুঁ হুঁ, ঠিক ঠিক, বাঃ বাঃ।

৩। পাহাড়ের এক পাখি বলে উঠল—হুহু বাতাস হুহু।
আরেক পাখি প্রতিধ্বনি করে জানাল—ঘুট ঘুট আঁধার ঘুটঘুট।

৪। বনের ঘুঘু বৌ-এর ঘুম ভাঙাচ্ছে—বুবু ওঠো দেখি মৃম্।

৫। কোকিল পাপিয়ার ভাষা নকল করে বলছে—পিউ পিউ কিউ কিউ।

৬। শালিখ গাইছে—সা রে গা মা, চারটে ভিমে তা।
আর শালিখের ছেলেরা পড়া মুখস্থ করছে—
ব্রীক ইট, ব্রীজ পুল, স্কুল ইস্কুল।

৭। পেঁচারা ষড়যন্ত্র করে যখন—
হুতুম থুম, হুতুম তুম, লাগ লাগ ঘু, লাগ লাগ ঘুট

আর তাঁর প্রসিদ্ধ কুঁকড়োর মুখে কত যে মজার ভাষা! মানুষের ভাষাও লজ্জাবতীর মতো নুয়ে পড়ে তার কাছে, এমন হীরে-মানিকের ছটা তার বচনে-ভাষণে। 'আলোর ফুলকি'-তে মেয়ে পাখিদের গলায় মেয়েলি ঢং, পুরুষদের গলায় পৌরুষ।

"আপাত দৃষ্টিতে অসংলগ্ন হলেও, চসারের Parliament of Fowls বলে কাব্যরূপকখানি 'আলোর ফুলকি'-র প্রসঙ্গে ভাবাসঙ্গবাহী। সেখানে পশু পাখির হাট বসে গেছে, হুবহু মানবিক সংলাপের উত্তাপে কখনো তিনটে

ঈগল উচ্চ কথনে মত্ত, কখনো বা মানবজাগতিক বাসনা বা বৈরাগ্যের অবিকল সাদৃশ্যে জলের পাখিদের মুখপাত্রী হিসেবে রাজহংসী নির্লিপ্ত গলায় বলছে—

But she wol love him, lat him take another !

'আলোর ফুলকি'র দৃশ্যপট অনেকটা Parliament of Fowl-এর মতই তীর্যক প্রাণীদের মনুষ্যত্বে চঞ্চল ." অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

শিল্পের কথা বলতে গিয়েও পাখির প্রসঙ্গ টেনেছেন তিনি বাগেশ্বরী প্রবন্ধমালায়। শিল্প আর রস হচ্ছে সেখানে শুক আর সারি। ছবি আঁকতে হলে মনটাকে চোখটাকে কেমন হতে হবে? উত্তরে জানালেন, পিঞ্জর খোলা পাখিটির মতো। সে উড়বে বাস্তব আর কল্পনার মাটিতে—আকাশে। এ ছাড়াও—

১। "আসল পাখি ওড়ে, লোহার চাদর ঝুপ করে পড়ে; দুই বস্তুর দুই ধর্ম, কিন্তু আর্টিস্টের হাতে সাদৃশ্যের কৌশলে লোহার চাদর-মোড়া পাখনা মেলিয়ে উড়ো কলটা ঠিক পাখির সাদৃশ্য ধরে উড়ে চললো শূন্যভরে। দুই বিভিন্ন বস্তু মিলল এক হয়ে সাদৃশ্য দেবার কৌশলে—"

২। "আত্মা এবং পরমাত্মা দুই কেমন যেমনি দেখাতে হল অমনি ঋষিরা তাঁদের সেই পূর্বতন অবস্থার দুটি পাখির উপাখ্যান দিয়ে ছবি দিলেন 'দ্বা সুপর্ণা'—একটি পাখি জেগে থাকে, একটি পাখি ঘুমিয়ে থাকে। কোন অখ্যাত যুগের রূপকথার পাখি যখন আর্যদের পূর্বপুরুষরা সবেমাত্র কথা বলতে আগুন পোহাতে শিখেছেন তারি স্মৃতিছন্দের দ্বারা নিরূপিত হল, ঋষিদের গভীর তত্ত্বজ্ঞান তাকে তলিয়ে দিতে পারলে না। তারপর থেকে পাথরে ধাতুকে কবিতায় গানে রূপকথায় আর্য-সভ্যতা কতবার কত ভাবে এই দুটি পাখি বেঙ্গমা-বেঙ্গমী এবং শুক সারীর আকারে ধরে গেলো তার ঠিক নেই।"

৩। "সৃষ্টি কর্তা আসেন, যেমন ময়ূর এগিয়ে আসে। আগে ঠোঁট, মাথা, পা, পিছনে আসে তার পেখম; বিচিত্র রঙে, বিচিত্র বাহারে।

সৃষ্টিকর্তা অপূর্ব সৃষ্টি করেছেন। তিনি এগিয়ে আসেননি। সৃষ্টিকে দিয়েছেন সামনে ঠেলে। নিজে আছেন পিছনে। আর্টের আসল কথাটা হচ্ছে তাই।"

৪। "দেখ, যে একবার ওড়া-পাখি ফাঁদ পেতে ধরতে শিখেছে, সে কি আর ভোলে শোলার পাখিতে? আলোছায়াকে ধরবার যে আনন্দ, সে আর পারে

না রেখায় আবদ্ধ রাখতে কিছু।

নন্দলাল আমায় বলেছিল, রেখার ভিতর কি আপনি কিছুই পান না? আমি বললুম, কি বলব নন্দলাল, রেখার ভিতর আমি দেখি যেন খাঁচার ভিতর বন্ধ পাখি।

...এই তো তোমার মুখ, রেখায় আর কতটুকু ধরবে? এই মুখে দুই পাখি; এক পাখি ঘুমোচ্ছে, এক পাখি জেগে আছে।...এদিক ওদিক দুদিক দিয়ে ঘুমের পাখি, জাগার পাখি—"

৫। "আঁকতে শেখা এমন শক্ত কি?...গোরু ছুটছে তার ভঙ্গী, কে আসছে দেখতে মুখ ফিরিয়েছে তার ভঙ্গী, পাখি ঝিমিয়ে আছে ফল খাচ্ছে উড়ে যাচ্ছে —সব আঁকবে। রূপের ভেদ ওইখানে। যে পাখি ঘুমোচ্ছে, যে উড়ছে তার থেকে আলাদা। ফর্‌ম সবটুকু রেখে দিলে।"

৬। "মেঘের সঙ্গে ময়ূরের মিত্রতা। তাই কোনো একদিন নিজের গলা থেকে গন্ধর্ব নগরের বিচিত্র রঙের তারাফুলে গাঁথা রঙীন মালা ময়ূরের গলায় পরিয়ে দিয়ে মেঘ তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলে। মানুষ প্রথম ভাবলে, এমন সুন্দর সাজ কারো নেই। তারপর হঠাৎ একদিন সে দেখলে বকের পাঁতি পদ্মফুলের মালার ছলে সুন্দর হয়ে মেঘের বুক থেকে মাটির বুকে নেমে এলো, মানুষ বললে, ময়ূর ও বক এরা দুইটিই সুন্দর। আবার একদিন এলো জলের ধারে সারস পাখি—মেঘ যাকে নিজের গায়ের রঙে সাজিয়ে পাঠালে। এমনি একের পর এক সুন্দর দেখতে দেখতে মানুষ বর্ষাকাল কাটালে, তারপর শরতে দেখা দিলে আকাশে নীল পদ্মমালার দুটি পাপড়িতে সেজে নীলকণ্ঠ পাখি, এমনি ঋতুর পর ঋতুতে, সুন্দরের সন্দেশবহ আসতে লাগলো একটির পর একটি মানুষের কাছে—সব শেষে এলো রাতের কালো পাখি আকাশ পটের আলো নিভিয়ে অন্ধকার দুখানি পাখনা মেলে-পৃথিবীর কোনো ফুল, আকাশের কোনো তারার সঙ্গে মানুষ তার তুলনা খুঁজে না পেয়ে অবাক হয়ে রইল।"

এত সব উপমা-তুলনার পরও যদি কেউ প্রশ্ন করেন, শিল্প কি, তাহলে তার উত্তরেও অবনীন্দ্রনাথ টানবেন পাখির কথা। তিনি বলবেন, মানুষের তৈরী শিল্প হল তার 'মনের পাখির গতিবিধির চিহ্ন'।

জীবনানন্দ সাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে পাখির প্রসঙ্গ টানেননি। কিন্তু মানুষের কথা বলতে গিয়ে পাখিকে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি তাঁর।

কালের অন্তঃস্থলকে ছুঁতে গিয়ে মুখোমুখি হয়েছেন এমন সব বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের, যার রঙ ধূসর, যার অধিবাসী মানুষেরা বিবর্ণ, বিপন্ন। এই সব স্থান-কাল-পাত্রের অভিজ্ঞতাকে কবিতায় রূপ দেবার সময় তাঁকে বারবার শরণাপন্ন হতে হয়েছে পাখিদের। তাঁর কবিতায় মানুষের দৈহিক বিবর্ণতা অথবা আত্মিক বিপন্নতার আকৃতিকে স্পষ্ট এবং গাঢ়তর হয়ে উঠেছে পাখির উপমায়, পাখিদের প্রতিমুহূর্তের ছিন্নভিন্ন জীবনযাপনের আদলে। পাখিরাই যেন তাঁকে জুগিয়েছে সেই চাবি, যা দিয়ে খুঁজে পেয়েছেন মানুষের দীর্ণ অস্তিত্বের কাছাকাছি পৌঁছবার স্বচ্ছন্দ সড়ক।

১। "তোমারে খুঁজেছি আমি নির্জন পেঁচার মতো প্রাণে
দেখিলাম দেহ তার বিমর্ষ পাখির রঙে ভরা।"

২। "সূর্যের আলোয় তার রঙ কুঙ্কুমের মতো নেই আর ;
হয়ে গেছে রোগা শালিখের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো।"

৩। "তোমার আমার ভালবাসা—তা কি
একটি পাখি—একটি সাদা পাখি।"

৪। "গুলি খেয়ে শূন্যে মৃত্যু হবার আগে পাখি
যেমন তাহার সুস্থ দেহের পাখিনীকে দেখে
কামের পরিতৃপ্তি খুঁজে আকাশে উড়ে যায়

তেমনি আলো-অন্ধকারের মরণ জীবনের
মোহানা থেকে তোমাকে ভালবেসে
শান্তি ভাল ; শান্তি ভাল, উড়েছি আমি ঢের।"

৫। "মাঝে মাঝে মনে হয় এ জীবন হংসীর মতন
হয়তো বা কোন এক কৃপণের ঘরে
প্রভাতে সোনার ডিম রেখে যায় খড়ের ভিতরে।"

তাঁর শিল্প-সম্পর্কিত প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন দুটি পাখির কথা। একটি কালো। আর একটি সাদা। এই সাদা পাখি আর কালো পাখি যেন তাঁর জীবনের আরো সব প্রগাঢ় অভিজ্ঞতার অংশীদার। একবার চিঠিতে লিখছেন নন্দলালকে—

"কবির জন্মদিনে তোমরা যোগ দিয়ে উৎসব করছো সুতরাং নিশ্চয়ই

তোমরা রূপদক্ষ এবং রসিকও বটে আমি এ সম্বন্ধে কোনো তর্ক তুলছিনে শুধু আমি কেন যেতে পারলাম না তাই বলি—আজ সকাল থেকে আলোর একটা সাদা পাখি আর অন্ধকারের একটা কালো পাখি দুজনে দুটি পালক আমার সামনে ফেলে দিয়ে বললে এর মধ্যে কোনটি সাদা আর কোনটি কালো বিচার করে বল—ভাবতে ভাবতে রেলের সময় উৎরে গেল প্রশ্নেরও মীমাংসা হল না তাই তোমাদের শরণাপন্ন হচ্ছি—আমার নাম ডোবে যদি তোমরা কেউ এর সদুত্তর একটি সাদা পালক আর একটি কালো পালকের সঠিক হিসেব না লিখে পাঠাও। ...রবিকাকাকে আমার প্রণাম দিও,...মন গেল উড়ে সেখানে, মাথা বসে বসে ভাবছে সাদা কালো পালকের তত্ত্বকথা।"

জীবনানন্দের কবিতাতেও যেন পাখির চরিত্র দুই। একটা সাদা, আলোর। আরেকটা অন্ধকারের, কালো। সাদা পাখি উড়ছে মানুষের সামনে বিজয় পতাকার মতো। কালো পাখি কেবল মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে মরণশীল কোনো নদীর ওপারের দিকে। তাঁর কালো পাখির ভিতর দিয়ে দেখছি সেই পৃথিবীকে যে অসুস্থ। সাদা পাখির ভিতর দিয়ে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পৃথিবী।

মানুষ পাখির মতো হোক, স্বচ্ছ সাদা পাখি, তাঁর 'সুতীর্থ' উপন্যাসে সুতীর্থ-র মুখ দিয়ে উচ্চারিত হতে শুনেছি এমন প্রার্থনা।

"পাখি-টাখি নিয়ে ক্ষেমেশের ঘরবার। যেন সব মানুষ পাখি হয়ে গেলে ভালো হত, স্বচ্ছ-মনের সাদা পাখি সব।"

সাদা পাখি, কালো পাখি, আলো এবং অন্ধকারের পাখি, বনের এবং মনের পাখি, বাস্তব এবং কল্পনার পাখি, বেদনার এবং আনন্দের পাখি, এই দুই কবির রাজত্বের সকাল-সন্ধ্যের সুস্থির এবং স্থায়ী বাসিন্দে। অবিরল ওড়াওড়ি দিয়ে এরাই যেন জানিয়ে চলেছে আমাদের পৃথিবী এখনো প্রাণময়। চারিদিকের নিথর বর্তমানের ভিতরে এরাই হয়ে উঠেছে গতিময়তার প্রতীক।

'রূপসী বাংলা'য় জীবনানন্দ শুধু সমসাময়িক কালের পাখিদের নিয়েই তুষ্ট নন। খোঁজ করেন অতীতকালের সেই সব পাখিদের চাঁদসদাগরের মধুকর ডিঙার সঙ্গে যারা উড়েছিল 'কালীদহের' আকাশে, বেহুলা-সনকা কিংবা বল্লাল সেনের সময়ে যাদের ওড়াউড়ি ছিল কোনো কোনো ঝড়ের রাতে কালো বাতাসের গায়ে। যে-শ্যামার নরম গান শুনতে শুনতে বেহুলার ভেলা

গাঙুড়ের জলে ভেসে ভেসে এগিয়ে চলেছিল অমরার দিকে, দু-পহরে চণ্ডিকামঙ্গল লিখতে বসে যে-কোকিলের ডাকে বার বার বাধা পেয়েছিলেন মুকুন্দরাম, সুদূর প্রবাস থেকে বাংলার সুপুরির বনের কাছে শ্রীমন্তের ময়ূরপঙ্খী পৌঁছনোর সময়ে ক্লান্ত হয়ে ডেকেছিল যে করুণ কাক, কত শতাব্দী আগের সেই সব পাখীদের স্মৃতি বারে বারে মনে পড়ে যায় তাঁর। খুঁজতে খুঁজতে দেখাও পেয়ে যান হঠাৎ। তখনই বলে ওঠেন, আজকের এই গাংশালিখের ঝাঁকে ভরা ধলেশ্বরাই সেদিনের সেই কালীদহ, আর

"এই সব পাখিগুলো কিছুতেই আজিকার নয় যেন—নয়।"

আর যখন সেই পাখিরাই ভুলে গিয়ে থাকে নিজেদের আত্মপরিচয়, কবি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন তাদের মনে করিয়ে দিতে—

"হায় পাখি, একদিন কালীদহে ছিলে না কি—দহের বাতাসে
আষাঢ়ের দু'-পহরে কলরব কর নি কি এই বাংলায়!"
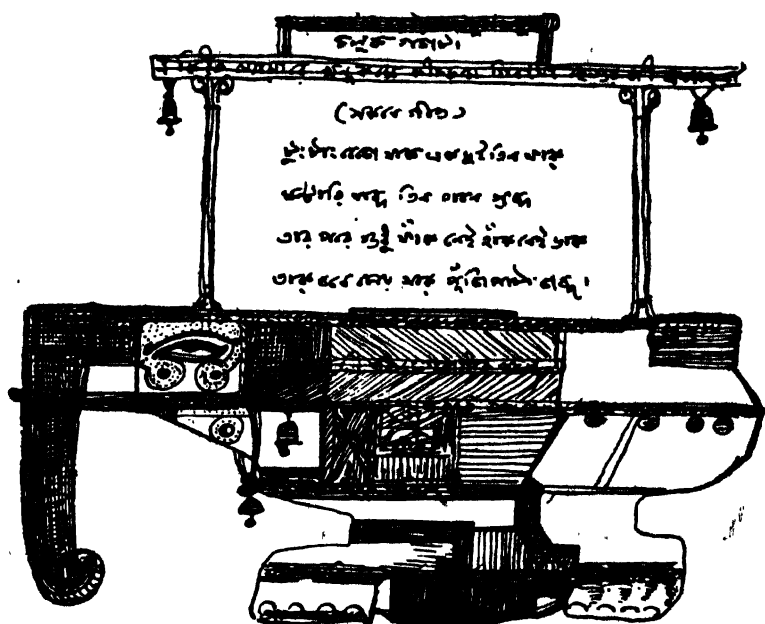
আরও এক ঝাঁক পশু-পাখি

"আরো এক ঝাঁক স্বতন্ত্র ইমেজ এই দুই কবির কাব্যে বার বার উপস্থিত হয়েছে। এত বারবার যে মনে হয়, তারা যেন কবিকে কিছুতেই অব্যাহতি দেয় না। তার কাছে পুনঃ পুনঃ স্বপ্নগ্রস্তের মতো কবিকে ফিরে আসতেই হয়; ফলে, একই ইমেজকে তাৎপর্যের নতুন নতুন স্তরে মণ্ডিত করে কবিকে উপস্থিত করতে হয়। কেননা কবি কখনো কখনো বাধ্যবাধকতার বন্ধনে বন্দী। সেই একঝাঁক ইমেজ জন্তু ও পাখির, পবিত্র করুণ হরিণ-হরিণী বনহংসীর দল, পঙ্কিল রাত্রির মতো ঝুলন্ত অথবা উড়ন্ত বাদুড় বিজ্ঞ সমালোচকের মতো জ্ঞানবৃদ্ধ পেঁচা, হিংস্র শকুন, এবং সবচেয়ে বেশী বীভৎস শূকর।" অশ্রুকুমার শিকদার

উপরে যে দু-জন কবির উল্লেখ, তাঁরা হলেন ইয়েটস এবং জীবনানন্দ। কিন্তু এখানে যদি ইয়েটস কেটে আমরা বসিয়ে দিই অবনীন্দ্রনাথ, অসত্য ভাষণের অপরাধ ঘটবে না এতটুকু।

জীবনানন্দে—

"কাঁচপোকা, গঙ্গাফড়িং, চড়ুই, দোয়েল ঝিঁঝির কথা যাই হোক, মাছি আর নীল মশা, পাটকিলে ডানা চিল, ভাঙা ডিম, মাকড়ের ছেঁড়া জাল, পুরনো পেঁচার ঘ্রাণ, অথবা রাতচর ডাঁশ দিয়ে কবিতায় যাকে বলে 'শোভাবর্ধন'—সেটা করার কথা কল্পনা করা যায় না। হয়তো 'সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি' (বিশ্বাস করে পড়া গ্রন্থ থেকে এসেছে ?) অথবা 'চিতার উজ্জ্বল চামড়ার শাল' শৌখিন কল্পনাকে সুড়সুড়ি দেবে ; 'নদীর জলের ভিতর শম্বর, নীলগাই, হরিণের ছায়ার আসা-যাওয়াটাও মনে হতে পারে বনেদি রোমান্স ঘেঁষা। কিন্তু শেয়াল গাধা? নেউল, বিড়াল মহীনের ঘোড়া আর ঘাইহরিণী ? সামুদ্রিক কাঁকড়া, গলিত স্থবির ব্যাং, বাটা মাছ ? এরা সব নিজের নিয়মের প্রয়োজনেই জীবনানন্দের কাব্যে প্রবেশ করেছে। পাসপোর্ট আছে।" নরেশ গুহ

"The animal world comes in for its share too (rather as in Edith Sitwill) sometimes in the most 'unpoetic' forms ; the sores on the dying horse, the doddering blind old owl, the swan, the camel, the golden lion, the vulture, the decrepit frog, the mosquito." Chidananda Dasgupta

আর অবনীন্দ্রনাথে—

"লতাপাতা, কীটপতঙ্গ, পশুপাখি, মানুষ থেকে শুরু করে ভূতপ্রেত, রাক্ষস-খোক্কস, হুরি-পরী, ঠাকুর দেবতা—কে নেই তাঁর সৃষ্টিলোকে ? গোড়াতেই বলেছি তাঁর পুতুলগুলো পর্যন্ত জীবন্ত—তারা হাসে, নাচে, কথা কয়, গান করে।...... তারা সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখা মানতে নারাজ।"

অশোকবিজয় রাহা

সেখানে বসন্ত বাউরি 'বউ কথা কও' বলে ডাক দেয় থেকে থেকে।

এক গাঁ থেকে আরেক গাঁয়ে নীল আকাশের খবর বয়ে নিয়ে যায় নীল পায়রা।

কুঞ্জলতার পাতায় এসে বসে মহুয়া।

ফলন্ত গাছকে ঘিরে মোচং বাজিয়ে গান গায় বোলতারা। আর তাদের সঙ্গে দোয়ার দেয় ভোমরা, মৌমাছি, গঙ্গাফড়িং।

পেয়ারা গাছে শিষ দেয় শ্যামা পাখি।

কাঠঠোকরার মাথায় লাল টুপি, গায়ে সবুজ ফতুয়া।

লাল টুপি, নীল গলাবন্ধ সবুজ কোর্তা পরে উড়ে বেড়ায় মাছরাঙা।

লম্বা পায়ে ঘোরে হাড়গিলের রাজা খাম্বাজং।

আছে এমন সব হতকুচ্ছিত হাঁস যাদের হলুদবর্ণ চোখগুলো যেন গুলের আগুন, দেখলে ভয় হয়। আছে এমন মোরগ, যার মাথায় গোঁজা আগুনের ফুল। এমন মুরগি যার মাথায় মেমসাহেবের মতো গোলাপী ফিতে। আবার অন্য কারুর ঠোঁটে আলতা, চোখে কাজল, পরনে নীলাম্বরী।

আছে গাং-শালিখ, গো-শালিখ, কোলাব্যাঙ, ঝিঁঝি, উইচিংড়ি। আছে বাঘ-ভালুক, শেয়াল, ছাগল, ভেড়া, শুকপাখি। আছে ঘোড়া হাতী। আছে চিল শকুন, বাজপাখি।

জীবনানন্দের গদ্যেও 'এই সব পশু পাখি কীটপতঙ্গদের আসর এমনি জমজমাট। 'মাল্যবান' উপন্যাসের নায়ক মাল্যবানকে তারা ঘিরে রয়েছে সর্বক্ষণ। তারা হয়ে উঠেছে মাল্যবানের ছেঁড়া-খোঁড়া অস্তিত্বের নিত্য-সহচর। কখনো মাল্যবান তাদের কথা ভাবে। কখনো মাল্যবানকেই তারা ভাবায়। কখনো মাল্যবানের চেতনাকে তারা জোগায় টাটকা অভিজ্ঞতার শাঁসজল। কখনো মাল্যবানের অবচেতন-অভিজ্ঞতার কবরখানা ঠেলে তারা বেরিয়ে আসে পৃথিবীর পথে-প্রান্তরে-রাজপথে। তারা কেউ কেউ মাল্যবানের অতীত স্মৃতিতে সুন্দর। মাল্যবানের বর্তমান জীবনপটে তাদের কারো কারো বীভৎস বিকৃত উপস্থিতিটাই তাকে যেন সাহায্য করে সময়ের সত্য-চেহারাটাকে বুঝে নিতে।

লরেন্সের Man and Bat কবিতায় একটা বাদুড়ের 'round and round and round' ঘূর্ণীপাক যেমন কবিতার মানুষটিকে অস্থির এবং হিংস্র করে তোলে এক নিস্তারহীন উপদ্রবের সংঘাতে, মাল্যবানও যেন চারপাশ থেকে সেইভাবে আক্রান্ত, পৃথিবীর জন্তু-জানোয়ারের ওৎ-পাতা ভঙ্গীর বেড়াজালে।

১। "একটা কথা ঠিক: মাটির নীচে গেঁড় আর কন্দ খাওয়া শুয়োরের মতো (আপার গ্রেডের) অফিসগিরিই তার সব নয়।"

২। "মাল্যবান শীতের রাতের নিঃশব্দতা ও অতিদীর্ঘতা, যে-দীর্ঘতা নিঃশব্দতা, যে-নিঃশব্দতা স্নিগ্ধতা (হতে পারত, কতবার পাড়াগাঁর রাতে হয়েছিল) সে-সব সুর কেটে যাচ্ছে উপলব্ধি করে, উৎপলা যে-গুমোটের সৃষ্টি করেছে সেটাকে হাল্কা করে দেবার জন্যে সরু গোঁফে তা দিয়ে একটু হেসে বললে, 'রাত বিরেতে ওপরে চলে এলে উচ্চিংড়ের কাবাব বানিয়ে দেবে নাকি আমাকে,

পলা !' বলে নিজেই হাসল মাল্যবান।"

৩। "মনটা তার অনেক সময়ই একটা মুনিয়ার বা মেঠো ইঁদুরের মতো আকাশে আকাশে ফসলে ফসলে ভেসে যেতে চায়।"

৪। "আহ্বান যা আসে তাও শ্বশুরবাড়ির থেকে। লোচনা ডোমেরও জামাইষষ্ঠী হয়—সেই রকম আর কি। বেয়াল্লিশটা বছর বসে এত বড়ো পৃথিবীর ভেতরে থেকে মানুষ সমাজে মানুষটা কানা—একেবারে ছুঁচো-চামচিকের পারা।"

৫। "এই বারোটা বছর উৎপলার অনিচ্ছা অরুচির বঁইচি-কাঁটা, চাঁদা-কাঁটা বেত-কাঁটার ঠাসবুনোনো জঙ্গলে নিজের কাজ-কামনাকে অন্ধ পাখির মতো নাকে দমে উড়িয়েছে মাল্যবান। কত যে সজারুর ধ্যাষ্টামো, কাকাতুয়ার নষ্টামি, ভোঁদরের কাতরতা, বেড়ালের ভেংচি, কেউটের ছোবল, আর বাঘিনীর থাবা এই নারীটির।"

৬। "মাল্যবান গায়ে তেল, পায়ে তেল, মাথায় তেল মেখে ভরা রোদে একটা বিচিত্র সরীসৃপের মতো চিকচিক করছিল।"

৭। "এক একদিন খুব বেশী রাতে বিছানায় জেগে থেকে-থেকে মাল্যবানের মনে হয়, কাদা পাঁকের ভেতরে একটা শুয়োরের মতো সমস্ত দিন জীবনটা যেন ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে বেড়ায়। বেড়ালের ছানার মৃত্যু তাকে বেশ একটা চমৎকার মুক্তি দিয়েছিল—স্ত্রীর মমতা বিমুখর্তার ঢের ওপারে চলে গিয়েছিল সে—"

৮। "হড়পা বানের ঠাণ্ডা স্রোতে যেন মুর্গি আমি—হাঁসের মতো সাঁতার কাটতে চাচ্ছি। আমার জীবনের বানচালের ব্যাপারটা এই রকম।"

৯। " 'তা আমার স্ত্রীকে কী করে চিনলেন?' মাল্যবান বেড়ালের থেকে চিতে বাঘ, চিতে বাঘ থেকে বেড়াল সত্তায় আসা-যাওয়া করতে করতে বললে।"

১০। "দেশলাই জ্বালিয়ে চুরুট ধরিয়ে মাল্যবান একটা বড়ো হুড়াড়ের ছানার মতো হঠাৎ উজ্জিয়ে উঠে বললে—"

'মাল্যবান' এবং 'সুতীর্থ' এই দুটো উপন্যাস পড়তে পড়তে আমরা যেন সত্যি সত্যিই আবিষ্কার করি ভিন্ন এক জীবনানন্দকে। তাঁর কবিতায় যেখানে তিনি নাগরিক, যেখানে কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছে যুদ্ধোত্তর সভ্যতা, দাঙ্গা-

দুর্ভিক্ষে কলুষিত শহর, সেখানে ইস্পাতের ফলার মতো ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে তাঁর ঘৃণা এবং বিদ্রূপ। অগ্নিবর্ণ হয়ে উঠেছে তাঁর বেদনা, বিবমিষা। যেন এই মৃত অভিশপ্ত সময়টাকে মৃত্যু অভিশাপ দিয়ে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে পারলে সুস্থির হতে পারতেন, তাঁর ভাষায় ফুটে ওঠে এমন গরম ভাপ। আর সেই তিনিই যখন কবিতা থেকে চলে আসেন গদ্যে, গল্প-উপন্যাসে, যখন বিস্তীর্ণ হয়ে যায় সমাজ এবং সময়ের পরিধি, সময়ের দরদালানের কাঠ-কাঠরার খুঁটি-খাঁটার মতো গড়তে হয় নানা চরিত্র, তখন তাঁকে কবিতার চেয়ে অনেক বেশী শরণাপন্ন হতে হয় সেই সব পশু-পাখিদের, মূল্যবোধের বিপর্যয় বা ভাঙনে ভরা সময়ের যাবতীয় ক্লেদ-কদর্যতার প্রতীক হয়ে ওঠার ক্ষমতা রয়েছে যাদের। বিষয় বদলালে ভঙ্গীও বদলে যায় বা বদলাতে হয় কেমন ভাবে, তার নমুনা আমরা একাধিকবার দেখেছি অবনীন্দ্রনাথে। রাজ কাহিনী, নালক বা শকুন্তলায় যিনি দরবারী, কৌতুককাহিনী বা ফ্যান্টাসী বা যাত্রা পালায় তিনি বৈঠকী। ওমর খৈয়াম বা আরব্য রজনীর চিত্রমালায় যিনি নৈপুণ্যের শিখর খোঁজেন সব কিছুর সামঞ্জস্য ঘটিয়ে, মুখোস বা চাণ্ডীমঙ্গলের চিত্রমালায় তিনি নিজের হাতেই ভেঙে ফেলেন সেইসব শুদ্ধাচার। জীবনানন্দও সেইভাবে ভাঙেন নিজের পূর্ব-প্রকাশভঙ্গীকে। যেহেতু উপন্যাসে তিনি ধরতে চান এক বিশৃঙ্খল সময়-প্রবাহ, যার ভিতরে 'চিং হয়ে, কাং হয়ে, তেরছা কেন্নিক মেরে' রয়েছি আমরা, যার আরো গভীর অভ্যন্তরে রয়ে গেছে আমাদের 'ব্যথা, বাচালতা, সরসতা, নষ্টামি, ভয়, রক্ত, রিরংসা, অনাথ অন্ধকার', সেই কারণেই, জীবনযাপনের নতুন আদলের সঙ্গে সঙ্গতি-সম্বন্ধ বজায় রেখে, তাঁকে গড়ে দিতে হয় ভাষায় নতুন ছন্দ, নাগরিক জীবনের অশালীন অপভাষা থেকে অপর্যাপ্ত উপকরণ কুড়িয়ে। আর সেই ফাঁকেই এই সব গদ্য-রচনায়, শ্মশানে শিয়াল-কুকুরের আধিপত্যের স্বাভাবিক ভঙ্গীতেই, ঘটে যায় এক ঝাঁক পশু-পাখি, জন্তু-জানোয়ারের সমাবেশ। আট ঠ্যাং ওয়ালা মাকড়া, লিকলিকে ছিপছিপে বানর বাচ্চা, খালুয়ের ভিতরে ন্যাটা মাছ। মগরাহাটার কুচো চিংড়ি, সজারুর ধ্যাস্টামো, কাকাতুয়ার নষ্টামি, ভোঁদড়ের কাতরতা, বেড়ালের ভেংচি, কেউটের ছোবল, বাঘিনীর থাবা, ভেটকীর মুখ, ফিঙের ঠ্যাং, বাজপাখি, শামুক-গুগুলির অবিরল আসা-যাওয়া সেখানে, মানুষেরই আকৃতি-প্রকৃতির আদত চেহারাকে সুস্পষ্ট করে তুলতে। জীবনানন্দে এই সব পশু-পাখিরা যেন হয়ে ওঠে

মানুষের নিজেকে দেখার ভিন্ন এক আয়না। অবনীন্দ্রনাথে এরাই যেন মানুষের পাশাপাশি আর এক পাল্টা মানবিক জগৎ।

অনেক সময় একই জন্তু-জানোয়ার অবনীন্দ্রনাথে কৌতুক রসের উপাদান আর জীবনানন্দে অসুস্থ সভ্যতা অথবা মূর্ছিত সময়কে চিনিয়ে দেবার অথবা চিনে নেওয়ার উপকরণ।

বুড়ো আংলায় আমরা প্রত্যক্ষ করেছি গণেশ ঠাকুরের শুঁড় দোলানো নাচ, শুঁড়ের ঝাপটা, রিদয়ের চোখ দিয়ে। জীবনানন্দ সেই হাতীর শুঁড়টাকে বসিয়ে দিলেন মানুষের মাথায়।

"এখনও ওর মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে মনে হচ্ছিল সর্বসিদ্ধিদাতার হাতীর শুঁড় নড়ছে যেন।" সুতীর্থ

বুড়ো আংলা-য় ঐ রিদয়কেই একবার তেড়ে এসেছিল এক আরশোলা। রিদয় তাকে মারতে গেলে সে উল্টে পড়েছিল আরশোলার ডানার ঝাপটায়। এই আরশোলাই জীবনানন্দে হয়ে ওঠে মানুষের মর্মতলের যাবতীয় রক্তাতুর লুব্ধতার প্রতীক। এইখানে, মাত্র এক আঁচড়েই তিনি ফুটিয়ে তোলেন কাফ্‌কা-র জগতের নৈসর্গিক জটিলতা এবং আত্মার ভিতরকার অন্ধকার।

"মন্বন্তর দাঙ্গা-হাঙ্গামা দুটো যুদ্ধ কালোবাজার মিলিটারিরা সেঁটে চিবিয়ে খেয়ে গেছে সব; হাড়গোড়ের ছিবড়ে শুঁকতে আরশোলারা শুঁড় নাড়ছে, তাদের ঠ্যাং ফড়ফড় করছে, ফড়ফড় করছে। চান সেই ঠ্যাং? দিতে পারি তবে। সে ঠ্যাং তো আপনার নিজেরি। কার রক্তমাংস চাইছেন আপনি? কার আছে? কে দেবে আপনাকে?" সুতীর্থ

জীবনানন্দে তুচ্ছ মাকড়সাও উপস্থিত, ভয়াবহ প্রতীকের সাজে।

"তোমরা শুয়ে থাকলে তোমাদের গায়ের ওপর দিয়ে হেঁটে যাবে ওরা; তোমাদের সত্যাগ্রহ ওরা মানবে না; ওরা আর স্ট্রাইক করবে না—কাজে যাবে—তোমাদের বুকের ওপর দিয়ে মাড়িয়ে যাবে। ওদের চোখ মুখ হাত ঠ্যাং তো মাকড়সার মত হয়ে পড়েছে ইন্নাসিন, মাকড় যাবে মাকড়সার জালের ওপর দিয়ে ধেই ধেই করে নেচে।'

'আমরা হলাম মাকড়সার জাল?'

'মাকড়সার জাল ছাড়া আর কি আমরা? মানুষ তো নয়—মানুষের পিত্তি। শরীরে পিত্তি কফ বায়ু ঠিকরে যে অংশ বেরিয়ে আসে তার ফ্যাকড়া তুমি,

পাখি (কুট্‌ম কাটাম)

আমি, অনন্তরাম, ঘনশ্যাম—'

'আর ওরা হল মাকড়সা?'

'মাকড়সা। ওদের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ আমাদের।' "

আর অবনীন্দ্রনাথ এমনই দয়ালু যে, পশুপাখির পালাগানে রঙ-ছুট কালো কুচকুচে চামচিকেটাকেও ডেকে এসে সাজিয়ে দেন চরিত্র করে। এমন কি গলায় একটা মজাদার গান দিতেও ভোলেন না।

ইকড়ি মিকড়ি চাম্ চিকড়ি
চামের ছাতা, চামের ঘর
উড়ে পড় নাটাগড় পারাছুট খুলে ধর
ঘুরে পড় ঝুলে পড় শুয়ে পড় নুয়ে পড়
আঁকুড়ি জুঁকড়ি কুঁকড়ি সুঁকড়ি—

এই 'গৃধরাজ-বধ পালা'র শেষ প্রান্তে হড়িমের অনুরোধে জরদ্গব যখন তার থলিটা খুলে দেখায়, আমরা দেখতে পাই আঁকড়-গাছের জাড়-শিকড়ের সঙ্গে, ঝুরো ফুল-বাতাসা মিশে রয়েছে শাঁখিনী সাপের হাড় সরু সরু আর কালো গিরগিটির খোলোস।

জীবনানন্দ শুনেছেন কোটী কোটী শুয়োরের আর্তনাদ। আর আমাদেরও শুনিয়েছেন শত শত শূকরের চীৎকার, শত শত শূকরীর প্রসব বেদনার আড়ম্বর।

অবনীন্দ্রনাথ শুনেছেন বনের যাবতীয় পশু-পক্ষীর জেন্ত সভার বিবরণ। আর আমাদের শুনিয়েছেন তাদের বীর-রসের রুধির স্বাদে বলীয়ান সিংহনাদ, হ্রেষা, বৃংহিত, চীৎকার, চিচিকার। সে সভায় বড়ো-বড়ো হাড়-ভাঙা, ঘাড়-ভাঙা থেকে মশা মাছি টিকটিকি, ঝাঁটা-গোঁফ লম্বা দাড়ি ধাড়ি-বাচ্চা চুনো-পুঁটি মাকড়-ধোকড় ফিড়িং-ফড়িং কাগা-বগা পর্যন্ত সকলেই হাজির। সেখানে হেড়েলের ডাকে বেজে উঠেছিল এমন কোমল সুর, যা মিলবে কেবল অরগানের তিন সপ্তকের কোমল কালো সুরে। আর রাজহংসের গলায় বয়ে গিয়েছিল বিগলিত-প্রায় কড়ি-কোমল সুরের করুণ ঝরনা। সেইখানেই সুন্দরবনের বাঘের মুখে হুহুঙ্কার—'আমরা লড়াই দেব, খুন জখম রক্তপাত করব, মানুষের জাতকে জাত পৃথিবী থেকে লোপ করে দেবো।'

জীবনানন্দে পেঁচার উল্লেখ অজস্র। অশ্বত্থের কোঠর অথবা শিমুলের ডালে

সে পেঁচা কখনো একা। কখনো ইঁদুরের সঙ্গে মিলেমিশে একসাথে বেরিয়ে পড়েছে জ্যোৎস্নায় ধানখেত খুঁজতে। তখন দেখা যায়—

"প্রচুর শস্যের গন্ধ থেকে থেকে আসিতেছে ভেসে
পেঁচা আর ইঁদুরের ঘ্রাণে ভরা আমাদের ভাঁড়ারের দেশ।"

পেঁচা আর ইঁদুরের উল্লেখ যেমন বহুবার, তাদের সম্পর্কটাও বহুবিধ। কখনো বন্ধু, কখনো শত্রু। কখনো কেউ খাদ্য, কেউ খাদক। তাঁর গদ্য রচনাতেও কখনো কখনো শুনতে পাই আশ্চর্য সংলাপ, মানুষের মুখে—

"কোথায় যাচ্ছিলে শীতরাতের লক্ষ্মীপেঁচার মতো : কলকাতার কালপেঁচারা ধাড়ি ইঁদুরের ঘ্যাট রেঁধে রেখেছে বুঝি?" সুতীর্থ

অবনীন্দ্রনাথের গদ্য ঘাঁটতে ঘাঁটতেও আমরা পেয়ে যাই এই রকম ইঁদুরের ঘ্যাটে-র খবর। 'গজকচ্ছপের বৃত্তান্ত' নামের গল্পে গরুড় যখন বছরের পর বছর না খেতে পেয়ে মনের দুঃখে লক্ষ্মী পেঁচাকে বলে—পেটের জ্বালায় মরে যাচ্ছি। গলার নলী হয়ে যাচ্ছে জিজ্জিরে, তখন পেঁচা বলে—

"আহা তাই তো দাদা, শকুনির জাত, মাংস না পেলে হবে নিপাত গরুড়ের বংশ। লক্ষ্মী ঘরে চল, ইঁদুর ধরে খাবে আন মাংস।"

গরুড় অবশ্য নাক সিঁটকেছিল এই প্রস্তাবে।

জীবনানন্দে পেঁচারা সংখ্যালঘু নয় কিন্তু স্বল্পভাষী।

'—বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে?
চমৎকার!
ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার।'

এই তুমুল গাঢ় সমাচারের বাইরে তারা যত বেশী বার চোখ খুলেছে, তত বেশী মুখ খোলেনি।

কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের পেঁচারা ব্যস্ত যত, বাক্যবাগীশ অথবা বাগ্মী ঠিক ততটাই। তারা ক্রূর, তারা ভীষণ, তারা ষড়যন্ত্রকারী। অন্ধকারে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তারা।

"এই বার বয়সে সবার বড়ো চিলে-পেঁচার পালা। সে চড়াগলায় চিৎকার করেই শুরু করলে, 'ভাই সব'। সব জ্বলন্ত চোখগুলো অমনি চিলের দিকে ফিরল। "ভাই সব, আমরা আজ এই কতকালের পুরনো মিশকালো পাকুড়-তলায় ঘুটঘুটে আঁধারে কেন এসেছি জান? খুন করতে, খুন করতে, এ আমি

চেঁচিয়েই বলবো। কিসের ভয়? কাকে ভয়?" আলোয় ঝলকি

কথা বলেছে আরও নানা পশুপাখি, নানা ভাষায় নানা ভঙ্গিতে। আর বিচিত্রভাবে তিনি পশুপাখির মুখে আশ্চর্য যেসব সংলাপ জোগাতেন, তার বিষয়ে নিজেই লিখে গেছেন কিছু কিছু।

"শিশুবোধক পড়লুম, বড়ো চমৎকার বই, অমন বই আমি আর দেখিনে। এখানকার ছেলেরা পড়ে না সে বই—

কুরুবা কুরুবা কুরুবা লিজ্জে
কাঠায় কুরুবা কাঠায় লিজ্জে
কাঠায় কাঠায় ধুল পরিমাণ
দশ বিশ কাঠায় কাঠায় জান।

আমার যাত্রায় ছাগলের মুখে এই গান জুড়ে দিয়েছিলুম। কেমন সুন্দর কথা বলো দেখিনি, যেন কুর কুর ঘাস খাচ্ছে ছাগলছানা।" জোড়াসাঁকোর ধারে

অবনীন্দ্রনাথের যাত্রা পালায় আরও সব অদ্ভুত কাণ্ড! সেখানকার ফ্যানটসিতে জন্তু-জানোয়ারেরাই নায়ক অথবা প্রধান চরিত্রের মতো। মানুষের ভাষা মুখে নিয়ে তারা হয়ে উঠেছে মানুষের সংসারের আপনজন।

আবার এই সব পশু-পাখিরা, জন্তু-জানোয়ারেরাই প্রতীকরূপে ভিন্ন প্রাণ পায় তাঁর রচনায়।

১। "যমরাজের মহিষের মাথাটির মতো সেই কালো পাথর।"

২। "ভীলরাজ মাঙ্গলিক, সাপের মতো কালো, বাঘের মতো জোরালো, সিংহের মতো তেজস্বী।"

৩। "হঠাৎ একটা কালো-পেঁচা চিৎকার করে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল; তার প্রকাণ্ড দুখানা কালো ডানার ঠাণ্ডা বাতাস অন্ধকার ছাদে রাজা-রাণীর মুখের উপর কার যেন দুখানা ঠাণ্ডা হাতের মতো বুলিয়ে গেল।"

৪। "কখনো পাহাড়ের ফাটল বেয়ে একটা গাছের শিকড় নেমেছে, সেটা তাঁর হাতে ঠেকতে মনে হল যেন সাপের গায়ে হাত পড়েছে···।"

৫। "মাঠের মাঝে একটা শেওড়া গাছের ঝোপ। অন্ধকারে কালো বেড়ালের মতো গুঁড়ি মেরে বসে আছে।"

৬। "হাই তুললেন—যেন বোড়া সাপ মুখ ব্যাদান করে একটা খাবি খেলে।"

৭। "এমন সময় মহোদর যেন লোম-পোড়া তুম্বার মতো ডাকছে।"

৮। "তখন রাত এক-প্রহর। 'মার'-এর দল 'মারী'র উল্কামুখী শিয়ালের মতো, রক্ত আঁখি বাদুড়ের মতো মুখ থেকে আগুনের হলকা ছড়িয়ে চারিদিকে হাহা হুহু করে ডেকে বেড়াচ্ছে……।"

৯। "ফর্দটা আগাগোড়া হিজিবিজি, যেন ফার্সিতে লেখা। কেবল কলমের খোঁচ, যেন মুরগির একরাশ ছেঁড়া পালক উড়ছে।"

জীবনানন্দের জগতেও ভিসা-পাশপোর্ট পেতে অসুবিধে হয়নি এমনি সব পশু পাখির, কীট পতঙ্গের, জন্তুদের।

১। "এই হাঙ্গামাটার পর থেকে কলকাতায় এসব জায়গা জমির ওপর সোনার মাকড়ি কানে এঁটে দিনরাত গিন্নী-শকুন লাফাচ্ছে।"

২। "ভবতোষ ঘনবর্ষার কুমড়ো ক্ষেতের কাঁকড়ার মতো গাঢ় চোখে তাকিয়ে বললে—"

৩। "গোখরো সাপের মতো কড়ি মাথায় মন্থু বাবুর সঙ্গে চলে গেল বোন মেদনীপুরে।"

৪। "একটা লিকলিকে ছিপছিপে বানরের বাচ্চাকে কেউ যেন মানুষের শাবকে পরিণত করতে গিয়ে হয়রান হয়ে ফেলে রেখেছে।"

৫। "বলতে বলতে কেশে উঠলেন মণিকা। মনে হল, পাঁজরের ভেতর থেকে একটা গলিত ব্যাঙ হাঁকড়ে উঠেছে।"

৬। "কলকাতার বিরাট হিক্কার থেকে ওগরানো গরু মহিষ যাঁড়ের নিরবচ্ছিন্নতা এখানে প্রবল।"

৭। "বর্ষারাতে পাড়াগাঁর খাটালে বেড়ালের চোখ যেমন জ্বলে ওঠে, তেমনি নিরেট নিঃসৃত চোখে মণিকার দিকে তাকিয়ে বিরূপাক্ষ বসে রইল।"

জীবনানন্দে অতিপ্রকৃত অথবা ফানটাসির ছোঁয়া লাগা দৃশ্যাবলী অফুরান। এখানেও অবনীন্দ্রনাথ তাঁর অগ্রজ। জীবনানন্দ লিখলেন

'মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে।'

অবনীন্দ্রনাথেও এক দুপুর রাতে ফুটন্ত ধবধবে জুঁই ফুলের মতো খই খাওয়ার জন্যে ভূতুড়ে নিশ্বাস ছড়িয়ে ছুটে আসে ঘোড়া-ভূতেরা।

জীবনানন্দে—

এমনি তিনজন আধো আইবুড়ো ভিখারীর সঙ্গে আমাদের দেখা হয় যারা

রামছাগলের মতো রুখু দাড়ি নেড়ে একজন ভিখিরিনী মেয়ের দিকে তাকিয়ে ভালোবেসে ভেবে নেয় শাঁকচুন্নী। তারা পৃথিবীর ন্যায়-অন্যায় গণনা করে চুলের এঁটিলি মেরে। আর অন্যত্র আমাদের সঙ্গে বারবার দেখা হয় সেই সব পেঁচা আর বেড়ালের, যাদের মুখে সব সময়েই মরা ইঁদুর।

অবনীন্দ্রনাথে এরই সমকক্ষ এবং সাদৃশ্যময় বর্ণনা—

"উকুন-মুখী উকুন বাছতে আছে একটা রামছাগলের কোলের পরে রেখে। তারে দেখে মনে হয় ছাগলীর মা বুড়ি—ছাগলের শিং-এ মারে সে ঘামাচি ফুসকুড়ি। কেউ তারে বলে ডাইনী বুড়ি, যক্ষিবুড়ি, খায় শেয়ালের নাড়ি-ভুঁড়ি। কাল পেঁচি আর দাঁড়কাগেদের জুড়িদার সে, বসে আছে কম্বল মুড়ি। চোখের তারা তার কালো বেড়ালটা, দিষ্টি দিয়ে রাতে জ্বলে। সে খায় ইঁদুর-ভাজা ধরে খাঁচা কলে।"

"এই হচ্ছে সেই চোখ, যে চোখ সত্যিকার শিশুর, রূপকথার শিশু মানুষের, যে পায়ের তলার পিঁপড়েটিরাও কথা শুনতে থেমে দাঁড়ায়— এ চোখ দেখতে ভয় পায় না, দেখতে পেয়েও আকুল হয় না, এতে কাছে ডাকা নেই, দূরে রাখাও না, একই সঙ্গে নির্লিপ্ত এবং ঘনিষ্ঠ, একে বলতে পারি প্রাণ পদার্থের পবিত্রতা-বোধ। ...অবনীন্দ্রনাথের পশুচিত্রণ, তাঁর প্রাকৃতিক বর্ণনা, সবই এই উৎস থেকে নিঃসৃত হয়েছে।" বুদ্ধদেব বসু

আর এই পশু-পাখির প্রেমের প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় আশ্চর্য, অবাক করা ছেলেমানুষিপনায় পরিপূর্ণ সেই উপাখ্যান, যা রানী চন্দ তাঁর 'শিল্পগুরু অবনীন্দ্র-নাথ'-এ ছাপিয়ে রেখেছেন চিরকালের জন্যে।

'আজ একটা বলাকা ধরেছি'—কৌতূহল জাগানো এই উক্তি দিয়ে উপাখ্যানের শুরু। যখন শেষ হয় তখন জানতে পারি—আসলে সেটা "ছোট্ট একটা কাঠের টুকরো বলাকা। মিহি তারে গাঁথা বলাকা, তার দু-প্রান্ত বাকসের দু-দিকে আটকানো। মধ্যিখানে ছোট্ট বলাকা চকচকে টিনের পাত-খানার উপরে, মনে হয় যেন আকাশে উড়ে চলেছে একাকী দুখানি ডানা দু-পাশে মেলে দিয়ে।

অবনীন্দ্রনাথের বাঁহাতে বলাকাসমেত বাকসখানি ধরা, হাতটি একটু তুলে

ধরলেন। বললেন, শোনো কেমন ডাকতে ডাকতে চলেছে—বলে হাতখানি খুব ধীরে ধীরে নাড়তে লাগলেন। তারের গিঁট সেই দোলায় বাক্সের টিনের গায়ে লেগে মৃদুস্বরে ধ্বনি তুলল—কঁ কঁ।"

এক পাখিতে এইভাবে দুই কবির মিল।

চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি

ইতিহাসের দুঃখের খনি ভেদ করে যিনি শুনতে পান 'শত জলঝর্ণার ধ্বনি', আর যিনি দেখতে পান 'চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধুরীতি মানুষের বিষণ্ণ হৃদয়', সেই জীবনানন্দে রবীন্দ্রনাথের বলাকার মতো সব সময়েই এক ঝাঁক পাখি উড়ে যায় আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য আকাশে। জীবনানন্দের আকাশে সব সময়েই পাখির ডানার আলোড়ন।

> "বুনো হাঁস পাখা মেলে—সাঁই সাঁই শব্দ শুনি তার ;
> একই—দু—তিন—চার—অজস্র—অপার
> রাত্রির কিনারা দিয়ে তাহাদের ক্ষিপ্র ডানা ঝাড়া
> এঞ্জিনের মতো শব্দে ; ছুটিতেছে-ছুটিতেছে তারা।"

সমালোচকরা যে-কবির গায়ে এঁটে দিয়েছে 'নির্জনতম' উপাধির লেবেল, তাঁর কবিতায় আমরা কেবলই প্রত্যক্ষ করি এক 'অস্থিরতম' হৃদয়কে, সর্বদাই যিনি অন্বেষণে ব্যস্ত। হেথা নয়, হোথা নয়, অন্য কোনখানে যেন রয়ে গেছে

আলোকময়, মঙ্গলময়, শান্তিকল্যাণময় কিছু, তাকে পেতেই তিনি এবং তাঁর পাখিরা আকাশ চিরে, বাতাস ছিঁড়ে চলেছে প্রত্যহ এবং প্রতিক্ষণ। আর সেই অন্বেষণের পরিণামে আমাদের সঙ্গে, এবং কবির সঙ্গেও সাক্ষাৎ ঘটে যায় এমন সব সিন্ধুসারসদের যাদের জন্যে নতুন নতুন সমুদ্র নির্মাণ করে চলেছে নতুন নতুন গান। পাছে তার চলা থেমে যায়, পাছে যে সব গহন ক্ষতি মানুষকে ক্লান্ত বিরস করে তুলেছে তার খবর পেয়ে সে গুটিয়ে নেয় ডানা, এই সন্দেহে মালাবার ফেনার সন্তান সেই পাখির প্রতি অনুরোধ জানান তিনি—

> "তুমি পিছে চাহো নাকো তোমার অতীত নেই, স্মৃতি নেই,
> বুকে নেই আকীর্ণ ধূসর পাণ্ডুলিপি"

তখন· যেন কানে বেজে ওঠে রবীন্দ্রনাথের 'দুঃসময়ে'র সেই ঐকান্তিক আবেদন—

> 'এখনই অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা'।

তাঁর যে-কোন একটা কবিতার বই হাতে তুলে নিলেই আমাদের চোখে পড়বে সেই সব ক্রিয়াপদের আধিপত্য, যা কেবলই আমাদের হাত ধরে টেনে আনে বাইরের ব্যাপ্ত দিগন্তে। কেবলই কানে শোনায় এমন স্বর যা আমাদের অস্তিত্বের সমস্ত অনুভূতিকে করে তোলে আকাশমুখী। এই মুহূর্তে আমরা হাতে তুলে নিলাম একটিই বই, বনলতা সেন। এবার চোখ ছড়ানো যাক তার পাতায় পাতায় ক্রিয়াপদের সন্ধানে।

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি, এই স্বীকারোক্তি দিয়েই বইটির শুরু। তারপর থেকে ক্রমাগত—

সন্ধ্যায় কাক ঘরে ফেরে, হামাগুড়ি দিয়ে পেঁচা নামে মাঠে, বিছানা ছিঁড়ে মশারী উড়ে যেতে চেয়েছে নক্ষত্রের দিকে, শাদা বকের মতো উড়েছে সে মশারী স্বাতী তারার কোল ঘেঁষে, পৃথিবী ছিঁড়ে উঠে গেছে হৃদয়, দুরন্ত শকুনের মতো তারায় তারায় উড়িয়ে নিয়ে চলল দূর নক্ষত্রের মাস্তুল, ধানসিড়ি নদীর পাশে উড়ে উড়ে কাঁদছে সোনালী ডানার চিল, নক্ষত্রের পানে উড়ে যাচ্ছে পেঁচার ধূসর পাখা, শাদা শাদাছিট কালো পায়রারা ওড়াউড়ি করে জ্যোৎস্নায়, নিখিলের দরকারে পাখি উড়ে যায় প্রেম অপ্রেম থেকে দূরে।

তাঁর কবিতায় এই উড়ে-যাওয়া যেন কোনোদিন ফুরোবার নয়।

জীবনানন্দে উড়ে-চলা পাখির ঝাঁকের বর্ণনা—

১। "শরের জঙ্গলে-নদী ছেড়ে দিয়ে বুনো হাঁস উড়ে চলিতেছে ক্রমাগত
চাঁদ থেকে আরো দূর চাঁদে চাঁদে—কত হাঁস চাঁদ কত মত।"

২। "আমরা দেখেছি যারা বুনো হাঁস শিকারীর গুলির আঘাত
এড়ায়ে উড়িয়া যায় দিগন্তের নম্র নীল জ্যোৎস্নার ভিতরে।"

৩। "সোনার বলের মতো সূর্য ছিলো পূবের আকাশে
সেই পটভূমিকায় ঢের
ফেণাশীর্ষ ঢেউ,
উড়ন্ত ফেণার মতো অগণন পাখি"

৪। "কামনার উর্ধ্বে রৌদ্রে নীলাকাশে অমল মরাল
ভারতসাগর ছেড়ে উড়ে যায় অন্য এক সমুদ্রের পানে—"

৫। "মাথার উপর দিয়ে অনেক সন্ধ্যার কাক
প্রথম ইশারা নিয়ে উড়ে যায় আবির্ভূত গম্বুজের দিকে।"

৬। "শহরের গ্যাসের আলো ও উঁচু উঁচু মিনারের ওপরেও দেখেছি,
নক্ষত্রেরা—
অজস্র বুনো হাঁসের মত কোন দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে উড়ে চলেছে।"

৭। "—সে আকাশ পাখনায় নিঙড়ায়ে লয়ে
কোথায় ভোরের বক মাছরাঙা উড়ে যায় আশ্বিনের মাসে।"

৮। "ভোরের আকাশখানা রাজহাঁস
ভ'রে গেছে নব কোলাহলে।"

অবনীন্দ্রনাথের রচনার আকাশেও এমনি নব-নব কোলাহল, পাখির অঁভিযানের, পাখিদের ডানার ঝাপটের। আকাশ-বাতাস নিংড়িয়ে সেখানেও অবিরল চলেছে এক গতিময় অভিযান, আলোর দিকে অন্ধকারের, অজানার দিকে মানুষের, পূর্ণতার দিকে অপূর্ণতার।

১। "রেলগাড়ি যেমন দেশ-বিদেশের মধ্যে দিয়ে বাঁশি দিতে দিতে স্টেশনে স্টেশনে নতুন-নতুন লোক ওঠাতে-ওঠাতে চলে, এই পাখির দলও তেমনি আকাশ দিয়ে ডাক দিতে-দিতে চলে, আর এ-গ্রাম সে-গ্রাম এ-দেশ সে-দেশ এ-বন ও-বন থেকে যাত্রী পাখি সব উড়ে গিয়ে ঝাঁকে মিশে আনন্দে মত্ত একটা দল বেঁধে চলতে থাকে। আকাশ দিয়ে একটার পর একটা ডাক-গাড়ির মতো সারাদিন এমনি দলে-দলে যাতায়াত করে ডাক হাঁক দিতে

দিতে—হাঁস, বক, সারস, পায়রা, টিয়া, শালিখ, ময়না, ডাহুক-ডাহুকী—ছোট বড় নানা পাখি।"

পাঠক একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন, জীবনানন্দের কবিতার এগুলির অনুষঙ্গ লুকিয়ে আছে এখানেও।

২। "বাতাস তোলপাড় করে চলেছে হাঁসের দল। কুড়ি-জোড়া দাঁড়ের মতো ঝপাঝপ উঠছে-পড়ছে জোরালো ডানা।"

৩। "তিনি আকাশে চেয়ে দেখলেন, মাথার উপর দিয়ে দুখানি পান্নার টুকরোর মতো একজোড়া শুক-সারী উড়ে চলেছে।"

৪। "সূর্যদেব সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার করে অস্ত গেলেন; রক্তমাংসের লোভে রণস্থলের উপর দলে দলে নিশাচর পাখি কালো ডানা মেলে উড়ে বেড়াতে লাগল!"

৫। "সোনা মাখানো মেঘের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে দুটি পাখি ছোটো-বড়ো দুজনের ডাক বয়ে, সূর্যের আভা আকাশ রাঙিয়ে তাদের দু'জোড়া ডানার পালকে এসে ঠেকেছে সাদা পালে হাওয়ার মতো।"

৬। "পেঁচারা সব ডানা মেলে বললে, 'আর আমরা কুঁকড়োকে একটুও ভালবাসি নে, কেননা—কেননা ওকিনা—সে কিনা, বলতে বলতে অন্ধকারের মধ্যে পেঁচারা উড়ে পড়ল নীল রাত্রির মধ্যে।"

৭। "চড়াই দেখলে অন্ধকারের মধ্যে কালো নৌকোর মতো দলে দলে পেঁচা গ্রাম ছাড়িয়ে ক্রমে পাহাড়ের গায়ে মিলিয়ে গেল।"

জীবনানন্দে শুধু পাখিই ওড়েনি। তাঁর 'হাওয়ার রাত' নামের এক বিখ্যাত কবিতায় একটা মশারিও একবার উড়ে যেতে চেয়েছিল নক্ষত্রের দিকে। উড়ে গিয়েও ছিল স্বাতী তারার কোল ঘেঁষে সাদা বকের মতো নীল হাওয়ার সমুদ্রে। সেই রাতে সিংহের হুঙ্কারে উৎক্ষিপ্ত অজস্র জেব্রার মতো জানলার ভিতরে বাতাস ঢুকেছিল শাঁই শাঁই করে। সেদিনের রাত ছিল অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারে প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির ভেজা চোখের মতো ঝলমল করছিল আকাশের নক্ষত্রেরা।

অবনীন্দ্রনাথেও রয়েছে এমনি এক বিস্ময়কর হাওয়ার রাত। কিন্তু সে রাতে উড়ে যেতে চায়নি কিছু। চেয়েছিল ভেসে যেতে অন্ধকারের নীল সমুদ্রে। তার "আপন কথা"য় রয়েছে সেই রহস্যময়ী রাতের ঘটনা।

"যে-তিনতলার উপর উত্তর-পশ্চিম থেকে বয় গঙ্গার হাওয়া, পূব দিয়ে আসে বাদলের ঠাণ্ডা বাতাস, উত্তর জানলায় শীতের খবর আসে, দক্ষিণ বাতায়নে হুহে-হুহে বয় সমুদ্রের হাওয়া, সেখানটাতে একটা রাত নয়—আরব্য উপন্যাসের অনেকগুলো রাতের মজলিসের আলো, সারি সারি খোলা জানলার বাইরে রাতের গায়ে ফেলত একটার পর একটা সোনালি আভার সোজা টান। আর সমস্ত তিন তলাটা দেখাত যেন মস্ত একটা নৌকো অনেকগুলো সোনার দাঁড় কালো জলে ফেলে প্রতীক্ষা করছে বন্দর ছেড়ে বার হবার হুকুম ও ঘণ্টা।"

ছেলেবেলার কথায় আরও একবার এমনি ভেসে যাওয়ার বর্ণনা রয়েছে। সেটা বাড়ির নয়। একটা দোলনা খাটের।

"একটা দোলনা খাট—ছোট্ট, সেটা খাট থাকতে থাকতে হঠাৎ কবে জাহাজ হয়ে উঠল এবং দুলে দুলে আমাদের নিয়ে সমুদ্রে চলাচল শুরু করলে। মস্ত জাজিম বিছানা ক'জোড়া ছোট হাতের তাড়ায় যেন ফুলে ফুলে উঠল—যেন ক্ষীর সাগরে ঢেউ তুলে।"

তাঁর ঐ 'হাওয়ার রাত' কবিতায় জীবনানন্দ যখন বলেন—

"কাল রাতের প্রবল নীল অত্যাচার আমাকে ছিঁড়ে ফেলেছে যেন"

অথবা

"দূরে-দূরে—আরো দূরে—আরো দূরে চলিলাম উড়ে
নিঃসহায় মানুষের শিশু একা—অন্তরের শুক্র অন্তঃপুরে
অসীমের আঁচলের তলে
স্ফীত সমুদ্রের মতো আনন্দের আর্ত কোলাহলে
উঠিলাম উথলিয়া দুরন্ত সৈকতে—
দূর ছায়াপথে।"

অথবা

"আমার হৃদয় পৃথিবী ছিঁড়ে উড়ে গেল"

সেই উড়ে-যাওয়ারই ভিন্ন এক বর্ণনা খুঁজে পাই অবনীন্দ্রনাথে।

"বিরাট রাত্রির এই প্রকাণ্ড বৈচিত্র্যহীনতার ভিতর দিয়ে উড়ে চলেছি বললে ভুল হয়। নিশাচর পাখিরা রাত্রির নীরব নীলের মধ্যে আপনাদের নিশ্চল পাখা মেলে নিঃশব্দে যেন ভেসে যায়, এ তেমন করে যাওয়া নয়, এ যেন উন্মত্ত দৈত্য

চাকা-দেওয়া লোহার খাঁচায় আমাকে বন্ধ করে পৃথিবীর উপর দিয়ে দৌড়ে চলেছে; তার প্রকাণ্ড বেগে লোহার খাঁচাটা পৃথিবীর আঁচড়ে, চারিদিকে রক্তকণা ছিটিয়ে, অন্ধকুহরের ভিতর ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলেছে।" পথে বিপথে

মানুষেরও উড়ে যাওয়ার, ভেসে যাওয়ার কথা জীবনানন্দে বারবার।

"বাকী সব মানুষেরা অন্ধকারে অবিরল পাতার মতন
কোথাও নদীর পানে উড়ে যেতে চায়।"

আবার কখনো বলেন—

"সকলেই আজ এই বিকেলের পরে এক তিমির রাত্রির
সমুদ্রের যাত্রীর মতন।"

তাঁর কবিতায় সিন্ধু, সমুদ্র, জল, জাহাজ, ফেনারও উল্লেখ মিলেমিশে থাকে, মানুষকে যখনই শোনাতে বসেন কোনো উত্তরণের সমাচার।

অবনীন্দ্রনাথেও কখনো কখনো সেই স্বাদ।

"হরিণ যেমন বহু পথ দৌড়িয়া হঠাৎ একবার উৎকর্ণ উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়ায়, তার পরে পথের ঠিকানা পাইয়া তীরের মতো সেইদিকে চলিয়া যায়, তেমনি করিয়া উড়িয়া চলিয়াছি—সিন্ধুতীরের নিষ্কলুষ ধবলতার উপর দিয়া, একটা বিশাল গম্ভীর কল্লোলের মুখে নির্ভয়ে বাতাসে বুক ফুলাইয়া।" পথে বিপথে

এসব ব্যাপ্ত-গভীর অনুভূতির বাইরেও শিশু সাহিত্যের পরমাশ্চর্য জাদুকর মানুষকে আকাশে উড়িয়েছেন অনেকবার। বুড়ো আংলা তো রিদয় নামের একটি বালকের আকাশ-ভ্রমণের মহাকাব্য। সেখানে শুধু রিদয় ওড়েনি। উড়েছে হাঁস, পাখি, মেঘ, আকাশ, নদী, অরণ্য সব কিছুই। আকাশ ছুঁয়ে সে-যেন গোটা পৃথিবীরই এক মহা অভিযান! এই উড়ন্ত-কাহিনীর শেষ নয় 'বুড়ো-আংলা'তেই। আরো আছে। ভূতপতরীর দেশ-এ হারুন্দে আর কিচকিন্দে সতরঞ্চির উপরে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে ঘুরে বেড়িয়েছিল শুধু দেশদেশান্তর নয়, কালকালান্তরও। নইলে খাটিয়া পেতে ছাতে ঘুমনো রণজিৎ সিং অথবা লাঠি হাতে বুড়ো ঔরঙ্গজেব অথবা এলাহাবাদের কেল্লায় মদ আর আতরের খোসবো-য় ভরা জলসার টানে জাহাঙ্গিরের খাস মজলিস তারপর নূরজাহানের সঙ্গে হারুন্দের গভীরতর শলাগরামর্শ, এসব ঘটনা ঘটবে কি করে? কল্পনার বেলুনে ফুঁ দিয়ে মানুষকে আকাশে ওড়ানোর হাসি-ঠাট্টা, রঙ্গ-রসিকতায় আমাদের যিনি মাতিয়ে রাখেন, সেই মানুষই আবার অবলীলায়

রচনা করেন উড়ে চলার ভিন্ন স্বর, ভিন্ন প্রয়োজনে। জীবনানন্দের পাখিদের মতো হয়তো নিখিলের প্রয়োজনেই। তখন নালক দেখতে পান—

"নীল আকাশের গায়ে পারিজাত ফুলের মালার মতো একদল হাঁস সারি বেঁধে উড়ে চলেছে—কী তাদের আনন্দ। হাজার হাজার ডানা এক তালে উঠছে এক সুরে হাজার হাঁস ডেকে চলেছে—চল, চল, চলরে, চল! আকাশ তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছে; মেঘ চলেছে শাদা পাল তুলে, বাতাস চলেছে মেঘের পর মেঘ ঠেলে, পৃথিবী তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছে। নদী চলেছে সমুদ্রের দিকে, সমুদ্র আসছে নদীর দিকে—পাহাড় ভেঙে বালি ঠেলে।"

আরো আছে। উড়ে বেড়াবার সাধ জেগেছে তাঁর কাহিনীর আরো অনেকের মনে। ভোমরার মতো উড়তে চেয়েছিল নালক, কাঁটাগাছের ফুলের উপরে ভোমরার ভনভন ওড়াউড়ি দেখে। আর সেই দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভেবেছিল—

"ওদের মতো যদি ডানা পেতাম তবে কি আর আমায় ঘরে বন্ধ করে রাখতে পারতেন?"

পাখি হয়ে ওড়ার বাসনা 'নালক'-এ সিদ্ধার্থের মনের ভিতরেও। যখন তিনি বালক, যখন হরিণের ছাল-ঢাকা গজদন্তের সিংহাসনে পিতা শুদ্ধোদনের কোল আলো করে বসে আছেন, সিংহাসনের দুপাশে চারজন করে গনৎকার, সামনে হোমের আগুন, ওদিকে গৌতমী মা, ধান দুর্বো, শাঁখ-ঘণ্টা, ফুল-চন্দন, ধুপ-ধুনোর সৌরভে রাজসভার বাতাস হয়ে উঠেছে মন্দিরের ভিতরকার সুগন্ধী-সুষমার মতো পবিত্র, সেই সময় আট গনৎকার শিশু রাজপুত্রের ভাগ্য গণনা করে

"যেদিন এঁর চোখে এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধ মানুষ, রোগাকীর্ণ দুঃখী মানুষ, একটি মরা মানুষ আর এক সন্ন্যাসী ভিখারী পড়বে, সেদিন আপনার সোনার সংসার অন্ধকার করে কুমার সিদ্ধার্থ চলে যাবেন—সোনার শিকল কেটে পাখি যেমন উড়ে যায়।"

উড়ে-চলার এক গভীরতর বাসনা থেকেই জন্ম নিয়েছে তাঁর 'খাজাঞ্চির খাতা'-র এক অবিস্মরণীয় চরিত্র, পুতু। সে অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক পাখি। মানুষের জগতে সে পাখি। পাখির জগতে মানুষ। এই পুতু-র আয়নায় আমরা দেখতে পাই অবনীন্দ্রনাথের নিজের ভিতরে লুকনো এক চির শিশুকে,

তিনি একই সঙ্গে পুতুর জনক এবং স্বয়ং পুতু। পুতু এমন সব জায়গায় যেতে পারে যেখানে আর কেউ যেতে পারে না। তাহলে পুতু পারে কি করে? পুতু তার উত্তরে বলে—

"আমি বড় হয়ে উঠতে চাইনি বলে। দুধে দাঁত উঠতে না উঠতে সব ছেলেরা ঠোঁটের উপর লুকিয়ে-লুকিয়ে হাত বুলিয়ে দেখে, গোঁফ উঠল কিনা। কিন্তু আমিই কেবল ঠোঁটে হাত বোলাতুম আর ভাবতুম—এই রে! বুঝি গোঁফ উঠে পড়ল! বড় হবার ভয় আমার এমনি ছিল যে দুটি দুধে-দাঁত যেমন ওঠা, অমনি আমি দুধের বাটি ফেলে উড়ে পালাবার চেষ্টায় রইলুম।"

আমরা যেন শুনতে পাই পুতুর রচয়িতারই কণ্ঠস্বর। যেন অবনীন্দ্রনাথেরই নিজের কথা এসব। সেই দুধে-দাঁত ওঠার বয়স থেকে আজীবন উড়ে-উড়ে যা দেখেছেন, তাইই যেন তাঁর রচনায় অক্ষরে-অক্ষরে সাজানো। আর সেই সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত শিশুদের ফাঁস করেও দিয়ে গেছেন উড়তে পারার, উড়তে-না-পারার সব গোপন রহস্য।

"এমন ছেলেমেয়ে কে আছে যে ওড়বার চেষ্টা না করেছে? ওড়বার জন্যে তাদের পিঠ সুড়সুড় করে, কিন্তু ভুলে গেছে কেমন করে উড়তে হয়। তা ছাড়া কচি ছেলেদের পায়ে তাদের মা এমনি ভারি-ভারি মল পরিয়ে দেন যে সে নিয়ে ওড়া ভারি শক্ত। দেখতে দেখতে সব পালক শক্ত দুধে-দাঁত হয়ে যায়—তখন আর পালকও ওঠবার আশা থাকে না, মাসিপিসিও বার হয় না। তার উপর ডাক্তার টিকে দিয়ে পালকের জড় মেরে দেয়। তখন দুধে-দাঁত পড়ে গজদাঁত গজায়। গজদাঁত দিয়ে খোঁড়া যায়, ওড়া তো হতে পারে না।"

কত যে উড়ে-চলার কথা ঐ একটা লেখায়, তার আভাস দেওয়া কঠিন। দিতে গেলে উপুড় করে দিতে হয় গোটা বইটাকেই। ঠক্ বাছতে গাঁ উজোড়ের মতো, দৃষ্টান্ত বাছতে গল্প উজাড় হয়ে যাবার দশা। তবুও কিছু টুকরো-টাকরা উড়ন্ত ছবি জড়ো করা হল এখানে 'খাজাঞ্চির খাতা' ঘেঁটে।

১। "বাড়ি ছেড়ে উড়ে পড়েই প্রথমটা ভারি ভয় হল। দেখলুম বাড়ির পর বাড়ি, সব জানলাগুলো খুলে আমায় গিলতে চাচ্ছে। আমি সোঁ করে আকাশে উঠে পড়লুম।···আমার ঠিক মনে হচ্ছে যেন পাখি হয়ে গেছি···।"

২। "কাগ বললেন, মন ভারি হয়ে গেলে কি কেউ উড়তে পারে? মন হাল্কা রাখা চাই বাতাসের মতো। পাখিদের মন কখনো ভারী হয় না। যে

পাখিটার দেখবে ডানা দুটো ঝুলে পড়ল সে পাখিটা মোলো—আর তার ওড়াও শেষ হল জানবে।"

৩। "ক্রমে আমি পাখি বিদ্যেতে পাখিদের চেয়েও পণ্ডিত হয়ে পড়লুম। আমি গন্ধ পেলেই বুঝতে পারি হাওয়া পশ্চিম থেকে এল না পুব থেকে।"

৪। "একদিন একখানা রুইতনের মতো কাগজের একটা কি পাখি আকাশ থেকে লাট খেতে খেতে যেন ডানাভাঙা পায়রার মতো এসে পড়ল। পাখিরা চেঁচিয়ে উঠল, 'ঘুড়ি ঘুড়ি! ···সেই দেখে আমার মাথায় এক বুদ্ধি এল, আমি পাখিদের বললুম, 'আমি ঘুড়ি ধরে ঝুলব আর তোরা সুতো ধরে ঘুড়ি-শুদ্ধ আমাকে ওড়া।' একশো পাখি আমাকে ঘুড়ির সঙ্গে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে চলল।"

৫। "শিবের মন গলে জটা বেয়ে ঝরনার মতো ঝর ঝর করে পিচকিরি দিয়ে পড়তে থাকল সবার গায়ে। তখন পরীরা খুশি হয়ে আমার পিঠ চাপড়াতে লাগল। যেমনি পিঠ লাল হয়ে উঠল, অমনি আমি উড়তে আরম্ভ করলুম।"

৬। "সোনা বললে, 'ওমা! আমি তো উড়তে পারি নে, পড়ে যাব যে!' পুতু সোনার হাত ধরে বললে, 'ভয় কি? উড়তে শিখিয়ে দেব। পক্ষিরাজ ঘোড়ার মতো আকাশ দিয়ে বোঁ করে উড়ে যাবে।' "

৭। "সোজা উড়ে চল, পৃথিবী যখন গোলাকার, তখন যেখান থেকে বেরিয়েছি ঘুরে ঠিক সেই শোবার ঘরেই পৌঁছব দেখো।"

পুতু যেমন মানুষ হয়েও উড়ে যেতে চেয়েছে পাখিদের সংসারে, অবনীন্দ্রনাথ আবার ঠিক তেমনি এমন কাহিনী লিখেছেন যেখানে পাখি উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে চেয়েছে, বেড়িয়েছে মানুষের তল্লাটে, জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞ হতে। 'বাবুই-পাখির ওড়ন বৃত্তান্ত' তারই সরস বৃত্তান্ত।

এত সব উড়ন্ত-চরিত্রের যিনি পিতা, তিনিও আক্ষেপে আতুর হয়েছেন অনেকবার, 'মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই'। নিজের পিঠে পাখির দুটো পালকময় ডানা প্রার্থনা করেছেন অনেকবার। দূরে কোথাও পৌঁছবার ডাক এলে তিনি ভাবতেন, আসা-যাওয়ার ধকলটা থেকে রেহাই পাওয়া যেতো কতখানি, পৌঁছে যাওয়া যেতো যখন ইচ্ছে তখন, দুখানা পাখির ডানা বানিয়ে নেওয়া যেতো যদি। নন্দলালের শিষ্য ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণকে লেখা চিঠিতে নিজের সে বাসনা লিখেও জানিয়েছেন কয়েকবার।

একবার লিখলেন—

"তোমরা সেখানে (শান্তিনিকেতনে) ছাড়া পাখি আর আমি তো খাঁচায় ধরা পাখি, আমি যদি পালাতে পারতুম তো তোমাদের সঙ্গে গিয়ে মিলে নববর্ষে আনন্দ করতুম।"

আরেকবার—

"তোমাদের কাছে তো যেতে চাই কিন্তু ডানা পাই না যে? সব আর্টিস্ট মিলে দুখানা ডানা আমাকে বানিয়ে দিতে পার না কি? কিন্তু মনে রেখো ডানা পেলে ওড়ার ইচ্ছে আমাকে হয়তো কোন পারে নিয়ে ফেলে দেবে, বোলপুর ছাড়িয়ে ভীষণ একটা উড়োকলের মতো।

তোমরা থাকবে মাটিতে দাঁড়িয়ে আকাশে চেয়ে। আমি চলে যাবো ডানায় ভর করে। অতএব ডানায় কাজ নেই, একটা পুষ্পক রথের জোগাড় করে দেখ, যাতে দলসুদ্ধ উড়ে পড়া যায়।"

পুষ্পক রথের বদলে আরেকবার এল পক্ষিরাজ-এর প্রসঙ্গ।

"তোমার দেশের সত্যিকার রাজকন্যা একটির সঙ্গে তোমার বিয়েটা হয়ে গেলে হয়, আমরা তা হলে গুরু-শিষ্য সবাই মিলে আনন্দ বাধাই। আমার পক্ষিরাজ ঘোড়া এখন খোঁড়া হয়েছে আগরতলার গড়ের আগড় টপকাতে পারবে না বিয়ের নিমন্ত্রণের দিনে, কিন্তু হয়তো সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে তোমাদের দুজনকে দেখতে আর একবার আমাকে নিয়ে বোলপুর উপস্থিত হতে পারে শীতের দিনে।"

বাংলা সাহিত্যের নির্জনতম কবি আর বাংলা চিত্রকলার নির্জনতম শিল্পী এঁরা দুজনেই, দুই ভিন্ন মেজাজের মানুষ হয়েও, আমাদের যেন ক্রমাগত শুনিয়ে যেতে চেয়েছেন ঊর্ধ্বলোকে অভিযানের একটা মন্ত্র—

"চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষণ্ন হৃদয়।"
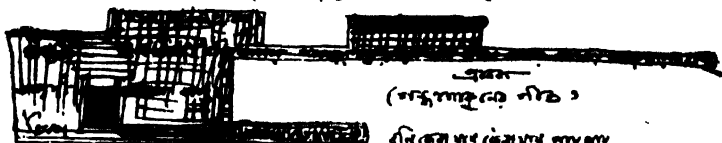
উদয়-অস্তের আলো

> "Behind me, field and medow sleeping
> I leave in deep, prophetic night
> Within whose dread and holy keeping
> The better soul awakes to light."

ফাউস্ট নাটকের তৃতীয় দৃশ্যের আরম্ভে ফাউস্টের মুখে এই সংলাপ জুগিয়েছেন যিনি, নিজের জীবনের অন্তিম দৃশ্যে সেই গ্যেটে তাঁর শেষতম সংলাপ হিসেবে উচ্চারণ করেছিলেন 'Mehr licht', অর্থাৎ আরো আলো। যাবার বেলায় পৃথিবীকে কোনো দার্শনিক বাণী শোনাবার জন্যে একথা উচ্চারণ করেননি তিনি। গৃহভৃত্যকে ঐ কথাটি বুলে নির্দেশ দিয়েছিলেন ঘরের জানলার বন্ধ পাল্লাটা খুলে দিতে, যাতে আলো আসে ঘরে। তবুও যে ঐ আটপৌরে কথাটা পৃথিবীর মুখে গভীর বাণীর প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল তার কারণ সম্ভবত একটাই এবং এই যে, পৃথিবী অথবা সভ্যতা চিরদিনই আলোর কাঙাল। আর হয়তো সেই কারণেই পৃথিবীর

better soul-দের কাছে পৃথিবীর চিরকালের দাবী, আলোর গান। আলোর স্তব, আলোর পিপাসা, আলোকহীনতার প্রতি ধিক্কার পৃথিবীর প্রায় সব মহত্তম কবিরই লক্ষণ।

রবীন্দ্রনাথের গানকে ভাগ করা হয়েছে পূজা, প্রকৃতি এবং প্রেম-এ। যদি তাঁর সমস্ত গান থেকে কেবল আলোর গানগুলোকে আলাদা করে বাছা হতো, দেখা যেতো সংখ্যাধিক্যে তারাই তাঁর গানের সাম্রাজ্যের সম্রাট।

এমনকি বোদলেয়ার, যিনি কবিতার ফুল তুলতে নেমে যান এক গলা পাঁকে, যাঁর কবিতার প্রধান চরিত্রেরা হল বেশ্যা, রোগী, মাতাল, বন্দী, পশু, বৃদ্ধ, ভাঁড়, উন্মাদ নারী, প্রধান প্রতীকেরা হল শব, কফিন, কবর, কঙ্কাল, ডাইনী, পিশাচী অন্ধকার—সেই তিনিও সূর্যের উপাসক।

"যাকে রবীন্দ্রনাথ আবাহন করেছেন 'বন্ধু' ও 'জ্যোতির 'কনকপদ্ম' বলেছেন, সেই সূর্য, বোদলেয়ারের কবিতায় 'উদার রাজার মতো, একা, বিনা পাত্র-পারিষদে আসে সব হাসপাতালে, আর সব বিশাল প্রাসাদে'। ···বোদলেয়ারের সূর্য খঞ্জকেও 'শিশুর আহ্লাদে' মাতিয়ে তোলে, এবং 'কবির মতো' হীন বস্তুকে মূল্য দেয়···"

-বুদ্ধদেব বসু

জীবনানন্দ কি অন্ধকারের কবি? তিনি কবি কি কেবল বিষাদের, শূন্যতার, নির্জনতার? অথবা বিদ্রূপের এবং ঘৃণার? না। এর কোনোটাই কিংবা সবটাই তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। সেটা ভাবলে ক্ষুদ্র করা হবে তাঁকে।

জীবনানন্দ আলোরও কবি। তাঁর কবিতায় রৌদ্রের অফুরন্ত উৎসব। তাঁর কবিতার কথা বলতে গিয়ে অমিয় চক্রবর্তী যখন জানান, "যখনই জীবনানন্দের কোনো কবিতা পড়েছি মনে হয়েছে স্নিগ্ধ রোদ্দুরে আপ্লুত", সেটাকে বিশ্বাস-যোগ্য মনে করার অজস্র উপাদান-উপকরণ কবি নিজেই ছড়িয়ে রেখে গেছেন তাঁর রচনায়।

১। "রৌদ্র ঝিলমিল
উষার আকাশ, মধ্য নিশীথের নীল,
অপার ঐশ্বর্যবেশে দেখা দাও, তুমি বারে বারে।"

২। "শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে"

৩। "চারিদিকে এখন সকাল
রোদের নরম রঙ শিশুর গালের মতো লাল।"

৪। "সূর্যের রশ্মির মতো অগনন চুলে
রৌদ্রের বেলার মতো শরীরের রঙে"

৫। "নক্ষত্রের রূপালী আগুন ভরা রাতে ;"

৬। "আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি এই ঘাসে
বসে থাকি ;..."

৭। "রাতের আকাশ
নক্ষত্রের নীল ফুলে ফুটে রবে।"

৮। "হৃদয় ভরে গিয়েছে আমার বিস্তীর্ণ ফেল্টের সবুজ ঘাসের গন্ধে
দিগন্ত-প্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে।"

৯। "এই নীল আকাশের নিচে সূর্যের সোনার
বর্শার মতো জেগে উঠে..."

আলো, রোদ, সূর্য, নীলিমা, জ্যোৎস্না, সকাল, বিকেল, রাত্রি, অস্ত ও উদয়ের উল্লেখ বারে বারে, প্রায় প্রত্যেকটি কবিতায়, পংক্তিতে পংক্তিতে। তাঁর একাধিক কবিতার নামকরণেও রয়েছে সূর্য অথবা আলো অথবা আকাশ অথবা রাত্রির উল্লেখ।

যথা :

আকাশলীনা, গোধূলি সন্ধির নৃত্য, রাত্রি, অস্তসূর্যের গান, তিমিরহননের গান, সৌরকরোজ্জ্বল, সূর্যতামসী, রাত্রির কোরাস, দীপ্তি, সূর্যপ্রতিম, সূর্যসাগর-তীরে, উদয়াস্ত, সূর্য নক্ষত্র নারী, পৃথিবীর রৌদ্রে, সূর্য রাত্রি নক্ষত্র, জয়-জয়ন্তীর সূর্য, পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে, মহা গোধূলি ইত্যাদি।

নিতান্তই কৌতূহলের খিদে মেটাতে একবার গুনে দেখেছিলাম তাঁর একটি বিশেষ কবিতায় আলো অথবা আলোর সঙ্গে যুক্ত যে-কোনো অনুষঙ্গের উল্লেখ। নীচে তার ফলাফল।

কবিতার নাম, 'এইখানে সূর্যের'। এই একটি মাত্র কবিতায় সূর্যের উল্লেখ রয়েছে ৭ বার। আলো শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে ১২ বার, উজ্জ্বলতা ৩ বার, আলোক ১ বার, আভা ১ বার, আকাশ ২ বার, নক্ষত্র ৩ বার, নীলিমা ১ বার, ভোর ২ বার, প্রদীপ ১ বার, আগুন ১ বার, স্ফুলিঙ্গ ১ বার, ভাস্বরতা ১ বার, জ্যোৎস্না ১ বার, এবং সকাল ১ বার।

আর বহুরূপে বিচ্ছুরিত এই আলোকে তিনি দেখেছেন বহু রঙে। আলোর

রঙ কখনো কচি লেবুপাতার মতো সবুজ। কখনো রোদের রঙ কমলা। আকাশের রঙ ঘাস ফড়িংয়ের দেহের মতো কোমল নীল। ভোরের রঙ ধানের গুচ্ছের মতো সহজ সবুজ। হেমন্তের সন্ধ্যায় তিনি কোনো কোনোদিন যে সূর্যাস্ত দেখেন, তার রঙ জাফরান। চাঁদ হয়ে যায় কখনো কস্তুরীর আভা, কখনো রূপোলী, কখনো ম্লান নীল।

তাঁর 'আবেগরঞ্জিত বেদনাময় বর্ণনার' কবিতাগুলো একদা তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। প্রথমভাগে ছিল সান্ধ্য বা নৈশ কবিতা। 'যে-কবিতায় সকল সময়কেই সন্ধ্যার মতো মনে হয়, যেখানে আলো ম্লান ছায়া ঘন, কুয়াশার পর্দা ঝুলে আছে।' দ্বিতীয় ভাগে ছিল আলোর কবিতা। 'আলো যেখানে উজ্জ্বল অবয়ব নিয়ে প্রাণ পেয়েছে।' তৃতীয় ভাগে ছিল সেই সব কবিতা, যেখানে আলো এবং অন্ধকার, রৌদ্র এবং রাত্রি, কান্তি, এবং অবগুণ্ঠন মিলে-মিশে একাকার। তাঁর এমন অজস্র কবিতা রয়েছে যেখানে অন্ধকার রাত্রির মধ্যেও ঢুকে পড়েছে সূর্যের বলীয়ান রোদ, রোদের প্রবল ঘ্রাণ, রক্তাভ রোদের বিচ্ছুরিত স্বেদ।

আকাশ এবং আলো এবং সূর্যালোককে তিনি যে তপোবনের ঋষির মতো এমন সর্বাঙ্গ ছুঁয়ে দেখবেন, মাখবেন, সেটা অনুমান করতে কষ্ট হয় না যখন তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী আমাদের জানিয়ে দেয়—

"প্রত্যূষে ঘুম থেকে উঠে পিতার উপনিষদ আবৃত্তি, ও মায়ের গান শুনতেন।"

বোন সুচরিতার স্মৃতিচিত্রে তাঁর সেই শৈশবের রৌদ্রকরোজ্জ্বল ছবি আরও গাঢ়তর।

"বাবার কথা মনে পড়লেই তাঁর ধ্যানগম্ভীর প্রশান্ত উদার মুখচ্ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমাদের ঋষিকল্প বাবা যেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মিক শিষ্য, ও তাঁরই আত্মজ দাদা তাঁর জ্ঞানের গভীরতার মননের ঔজ্জ্বল্যের, মানসিকতার স্বচ্ছতার উত্তরাধিকারী। তাঁর প্রজ্ঞার আলোকে প্রতিভাসিত দাদা তাঁর আজীবন সত্য সন্ধানের উত্তরসাধক।...শিশির স্নানের শেষে নম্র কোমল প্রত্যূষা পূর্বগগনে আবির্ভূত হতে-না-হতেই বাবার মন্দ্রমধুর কণ্ঠে ধ্বনিত হোতো ঔপনিষদিক শ্লোক। সহসা সমস্ত পটভূমি প্রসারতায় থমথম করত

নিলয়স্রোতে, থরথর করে কাঁপত যেন সার্বিক-প্রকৃতি ছন্দ—প্রকৃতির ছোট বড়ো সখা-সদস্য ফুল, লতা, ঘাস। বাতাসের আড়ালে যেন কে আসছেন, আসছেন বলে মনে হতো।...মনে হয়, সেই গম্ভীর গাঢ় আনন্দের আবহাওয়ায় বুঝি দাদারই স্বচ্ছন্দতা ছিল বেশী।...বাবাকে ঘিরে যে-শান্তি-সমাহিতির জীবনস্থিতি—তাতে যেন দাদার সানন্দ স্বচ্ছলতা তাঁর পরবর্তী জীবনের নিষ্ঠ অভিনিবেশের, শান্ত মগ্নতার অঙ্কুরোদ্গমে জলবায়ুর প্রশ্রয় দিয়েছিল।"

আর এই ঋষিতুল্য পিতা সম্পর্কে পুত্রের শ্রদ্ধানিবেদন—

"একমাত্র জ্ঞানযোগই যে বাবার অন্বিষ্ট ছিল সে-কথা সত্য নয়, কিন্তু মধ্য বয়স পেরিয়েও অনেকদিন পর্যন্ত সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান—এমন কি গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় তাঁকে প্রগাঢ় হয়ে থাকতে দেখেছি—মানুষের জীবন ও চরাচর সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব একটা বিশুদ্ধ ধারণায় পৌছনোর জন্যে। নিজের হিসেবে পৌছতে পেরেছিলেন তিনি। উচ্ছ্বাস দেখিনি কখনও তাঁর, কিন্তু জীবনে অন্তঃশীল আনন্দ স্বভাবতই ছিল—সব সময় প্রায়। কিছু গদ্য ছাড়া বাবা সাহিত্য সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেননি, কিন্তু পাঠ করেছিলেন অনেক, আলোচনার প্রসারে ও গাঢ়তায় আমাদের ভাবতে শিখিয়েছিলেন, দৃষ্টি তিনিই খুলে দিয়েছিলেন।"

সেদিনের বালক জীবনানন্দ যখন পরিণত এবং কবি হিসেবে প্রসিদ্ধ, নিজের কবিতার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি যেন পিতার সত্যসন্ধানকেই স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন—

"কোনো কিছুকে 'চরম' মনে করে সুস্থিরতা লাভ করবার চেষ্টায় আত্মতৃপ্তি নেই, রয়েছে বিশুদ্ধ জগৎ সৃষ্টি করবার প্রয়াস—যাকে কবি-জগৎ বলা যেতে পারে।"

তাঁর তিমির-ভরা কবিতার বই 'সাতটি তারার তিমির'-এর শেষ কবিতার নাম, সূর্যপ্রতিম। আর বাল্যকালের সেই পিতৃকণ্ঠে উচ্চারিত উপনিষদই হয়তো তাঁকে মনে করিয়ে দেয়, অমৃত সূর্যের স্মৃতি।

"শুনেছি কিন্নরকণ্ঠ দেবদারু গাছে
দেখেছি অমৃত সূর্য আছে।"

স্বরচিত বিশুদ্ধ পৃথিবীর মুখোমুখি হওয়া অথবা তাকে গড়ে নেওয়ার পিছনে এই প্রত্যূষকালটিই বহুদিন, হয়তো চিরদিন, তাঁর কাছে হয়ে উঠেছিল পরম

লগন। তাঁর সহধর্মিণীর স্মৃতিচারণা থেকে আমরা জানতে পারি, প্রথম আলো ফোটার মুহূর্তে তিনি প্রতিদিন এসে বসতেন নিজের বাগানে চেয়ারে গা এলিয়ে। আর এরই সঙ্গে মিলিয়ে আমরা যখন পড়ি—

"শস্যের ভিতরে রৌদ্রে পৃথিবীর সকালবেলায়
কোন এক কবি বসে আছে"

তাঁর কবি-স্বভাবকে চিনে নিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব ঘটে না আমাদের।

অবনীন্দ্রনাথও অমনি ভোরের আবহাওয়ায় মানুষ। আর আলো তাঁরও প্রাণের জিনিস। নিজের জীবনের ভোরবেলা থেকেই ভোরের সঙ্গে তাঁর পরিচয়।

"বাবামশায় ওঠেন রোজ ভোর চারটের সময়ে। উঠে হাত-মুখ ধুয়ে সিঁড়ির উপরে ঘড়ির ঘরে বসে কালী সিংহের মহাভারত পড়েন, সঙ্গে থাকেন ঈশ্বরবাবু। ওই একটি সময়ে আমরা বাবামশায়ের কাছে যেতে পেতুম। চাকররা আমাদের ভোর না হতে তুলে হাত-মুখ ধুইয়ে নিয়েই আসত বাবা-মশায়ের কাছে। তিনি পড়তেন, আমাদের শুনতে হত। এই গল্প শোনা দিয়ে শিক্ষা শুরু করেছি তখন।" জোড়াসাঁকোর ধারে

জীবনের প্রৌঢ়ত্ব-পর্বে যখন পা, তখনও সেই বাল্যকালের স্বভাব। কন্যা উমা দেবী স্মৃতিকথায় অবনীন্দ্রনাথের সেই সময়কার ছবি—

"আমি তখন খুব ছোট, ভোর হলেই দেখতুম বাবা দোতলায় নেমে আসতেন। ...বাবা মুখ ধুয়ে বাগানে বেড়াতেন। দিনের সূচনায় বোধ হয় তাঁর প্রথম কাজ ছিল ভোরবেলাকার সৌন্দর্যকে মনের মধ্যে ধরে রাখা। গোলাকার বাগানে খানিক পায়চারি করে লোহার বেঞ্চে বসতেন।... বাবা তখন আমায় কাছে ডেকে নিয়ে আকাশের রং দেখাতেন...।" বাবার কথা

সেই ভোর, সেই আকাশ তাঁর সমগ্র রচনাবলীর ভিতরে আলোয় আলোময়।

১। "তারপর গুরু গুরু গভীর গর্জনে সমস্ত আকাশ কাঁপিয়ে, চারিদিক আলোয় আলোময় করে সেই মন্দিরের পাথরের দেওয়াল, লোহার দরজা যেন আগুনে-আগুনে গলিয়ে দিয়ে সাতটা সবুজ ঘোড়ার পিঠে আলোর রথে কোটি কোটি আগুনের সমান জ্যোতির্ময় আলোময় সূর্যদেব দর্শন দিলেন।"

২। "সকালের সোনায় মাখা, দুপুরের রোদে পোড়া, সন্ধ্যার মেঘ, আর আলোর চিত্র-বিচিত্র দিনের মধ্যে দিয়ে রাত্রির নীল-গোল অন্ধকার আকাশ।

৩। "কমলমীর—যেখানে তাঁর তারারাণী একা রয়েছেন, সেইদিকে চেয়ে তাঁর প্রাণ হঠাৎ বেরিয়ে গেল দূরে-দূরে-কতদূরে সকালের আগুনবরণ আলোর মাঝে নীল আকাশের শুকতারার অন্তপথ ধরে।"

৪। "এমন সময় অন্ধকারে আলো ফুটল—ফুল যেমন করে ফোটে, চাঁদ যেমন করে ওঠে—একটু, একটু, আরো একটু। সমস্ত পৃথিবী দুলে উঠল পদ্মপাতায় জল যেমন দুলতে থাকে—এদিকে সেদিক এ-ধার ও-ধার সে-ধার। ঋষি চোখ মেলে চাইলেন, দেখলেন আকাশে এক আশ্চর্য আলো! চাঁদের আলো নয়। সূর্যের আলো নয়, সমস্ত আলো মিশিয়ে এক আলোর আলো! এমন আলো কেউ কখনো দেখেনি! আকাশ জুড়ে কে যেন সাত রঙের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছেন। কোন দেবতা পৃথিবীতে নেমে আসবেন তাই কে যেন শূন্যের উপরে আলোয় একটি একটি ধাপ গেঁথে দিয়েছে।"

৫। "রাত আসছে বসন্তকালের পূর্ণিমার রাত! পশ্চিমে সূর্য ডুবছেন, পূবে চাঁদ উঠি উঠি করছেন। পৃথিবীর এক পারে সোনার শিখা, আর একপারে রূপোর রেখা দেখা যাচ্ছে।"

৬। "পূবে পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হলেন—শালগাছটির উপরে যেন একটি সোনার ছাতা! ঠিক সেই সময় বুদ্ধদেব জন্ম নিলেন।"

৭। অতু-ল ফু-উল। আলোর ফুল! আলো, প্রাণের ফুলকি আলো, চোখের দৃষ্টি আলো, এসো ফুলের উপর দিয়ে, শিশির মুছে দিয়ে, এসো পাতায়-লতায় ফুলে ঝিকমিক। আলোতে ঝিকমিক—দেখা দিক, সব দেখা দিক, ভিতরে থাক তোমার প্রভা, বাইরে থাক তোমার আভা, একই আলো ফিরে যাক্ শতদিক শতধারে, অনেক আলোর এক আলো, অনেক ছেলের এক মা। তোমার স্তুতি গাই আলোকবাদিন, আলোকের স্তোত্র। তোমায় দেখি ছোট হতে ছোট, বড়ো হতে বড়ো, নানাতে, নানা কালে, কাচে, মাণিকে, মাটিতে, আকাশে, জলে-স্থলে; সকালে জলজল, সন্ধ্যায় ঝিলমিল মন্দিরে, কুটীরে, পথে-বিপথে। ভিখারীর কাঁথায় শোভা, রাজার পতাকায় প্রভা—আলো। বনের তলায় সোনার লেখা, সবুজ ঘাসে সোনার চুমকি, আলোর ফুলকি, আলপনা, অ-তু-উল অমূল আলো।"

৮। "অন্ধকারের মধ্যে থেকে ভোররাতের হিম মাটি এই যে কাঁদন জানাচ্ছে, আকাশের কাছে তার অর্থ কী সোনালিয়া, সে আলো ভিক্ষে

করছে, একটুখানি সোনার আলো মাখা দিন তারি প্রার্থনা। ভোরবেলায় সবাই কাঁদছে, দেখবে, আলো চেয়ে, গোলাপের কুঁড়ি সে অন্ধকারে কাঁদছে, আর বলছে, আলো দিয়ে ফোটাও। ওই যে খেতের মাঝে একটা কাস্তে চাষারা ভুলে ফেলে এসেছে, সে ভিজে মাটিতে পড়ে মরচে ধরে মরার ভয়ে চাচ্ছে আলো, একটু আলো এসে যেন রামধনুকের রঙে চারিদিকের ধানের শিষ রাঙিয়ে দেয়।"

উদ্ধৃতি-র লোভ সামলানো কঠিন। তবু উদ্ধৃতি বাড়িয়ে কাজ নেই। কেন না আলো-র বিষয়ে হীরে-পান্নার মতো এমন অজস্র উক্তি তাঁর রচনাবলীর আকাশকে অনন্ত নক্ষত্রবীথি-র মতো সাজিয়ে রেখেছে।

আলোকিত আকাশের প্রসঙ্গে জীবনানন্দ মাত্র একবার উল্লেখ করেছেন শালের। চিতার চামড়ার শাল।

অবনীন্দ্রনাথে এই শাল বহুবার। কখনো কখনো শালের বদলে শাড়ি। যেমন—"দেখতে দেখতে সূর্যি উঠল, আলো পেয়ে মাটি যেন সোনা রূপো আর নানা রঙের উলে বোনা কাশ্মিরী শালের মতো দেখতে লাগল।"

আর

"আকাশ দেখতে হয়েছে যেন হলুদ আর কালো ডুরে শাড়িখানি।"

জীবনানন্দে বহু জায়গায় একটি সিঁড়ির উল্লেখ। আলোর সিঁড়ি। মাটির দিক থেকে আকাশের দিকে উঠে গেছে।

১। "একটি অমেয় সিঁড়ি মাটির উপর থেকে নক্ষত্রের
আকাশে উঠেছে;
উঠে ভেঙে গেছে।"

২। আমাদের এ শতাব্দী আজ পৃথিবীর সাথে
নক্ষত্রলোকের এক অবিরল সিঁড়ির পসরা খুলে
আত্মক্রড়া হল ;—।"

৩। "কোথায় সমাজ, অর্থনীতি?—স্বর্গগামী সিঁড়ি
ভেঙে গিয়ে পায়ের নিচে রক্তনদীর মতো ;—"

৪। "সেই সিঁড়ি ঘুরে প্রায় নীলিমার গায়ে গিয়ে লাগে;
সিঁড়ি উদ্ভাসিত করে রোদ;
সিঁড়ি ধরে ওপরে ওঠার পথে আরেক রকম
বাতাস ও আলোকের আসা-যাওয়া স্থির করে কী অসাধারণ—"

৫। "নগরীর সিঁড়ি প্রায় নীলিমার গায়ে লেগে আছে ;
অথচ নগরী মৃত।
সে-সিঁড়ির আশ্চর্য নির্জন
দিগন্তরে এক মহীয়সী,..."

৬। "কোথাও বিকেলবেলা নগরীর উৎসারণে উচল সিঁড়ির
উপরে রৌদ্রের রং জ্বলে ওঠে—"

৭। "ঘুরানো সিঁড়ির পথ বেয়ে যারা উঠে যায় ধবল মিনারে"

অবনীন্দ্রনাথে এই আলোকিত সিঁড়ির আবির্ভাব মাত্র একবারই। আর তার গড়নটা বিপরীতমুখী। আকাশ থেকে মাটির দিকে।

"কোন দেবতা পৃথিবীতে নেমে আসবেন তাই কে যেন শূন্যের উপরে আলোর একটি একটি ধাপ গেঁথে গিয়েছে!"

এতক্ষণ যে আলোর আলোচনা, সে আলো কেবল চোখে দেখার, আকাশ যতটুকু দেয় পৃথিবীকে, পৃথিবী যতটুকু পায় মহা-পৃথিবীর সৌজন্যে। কিন্তু আরো এক আলো রয়ে গেছে চোখের দেখার বাইরে। সে যেন অন্য পৃথিবীর। তাকে যেন দেখতে হয় অন্য-চোখে, জাগ্রত স্বপ্নে, Vision-এ। রবীন্দ্রনাথ যখন প্রশ্ন করেন—

'কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে
তুমি ধরায় আসো?'

অথবা রিলকে যখন তাঁর বুদ্ধ স্তোত্র রচনা করতে গিয়ে লেখেন—

"তাঁকে ঘিরে থাকেন অন্যান্য সব বিশাল নক্ষত্র
যারা আমাদের দর্শনীয় নয়।"

তখন সেই লোকোত্তর অন্য আলো-র অভিজ্ঞায় চকিত হয়ে ওঠে আমাদের অনুভূতিমালা। অবনীন্দ্রনাথ তাকেই নাম দিয়েছেন 'আলোর আলো'। আর জীবনানন্দ, 'আর-এক-আলো।'

"অম্বপালী সুজাতা ও সংঘমিত্রা পৃথিবীর লৌকিক সূর্যের
আড়ালে আর-এক-আলো দেখেছিলো ;
হয়তো তা লুপ্ত এক বড়ো পৃথিবীর
আলোকের নিজ গুণ।"

অন্য জায়গায়—

"চোখ না এড়ায়ে তবু অকস্মাৎ কখনো ভোরের জনান্তিকে

চোখে থেকে যায়

আরো-এক আভা

আমাদের এই পৃথিবীর এই ধৃষ্ট শতাব্দীর

হৃদয়ের নয়—তবু হৃদয়ের নিজের জিনিস—"

এই 'আর-এক আলো', আর-এক-আভাই জীবনানন্দের 'শুভ মানবিকতার ভোর'। এই ভোরের প্রার্থনায় কখনো কখনো তাঁকে দেখতে পাই যেন পুষ্পাঞ্জলির ভঙ্গীতে হাঁটু মুড়ে বসেছেন তিনি সময়ের কাছে।

"মানুষেরা বার বার পৃথিবীর আয়ুতে জন্মেছে ;

নব নব ইতিহাস সৈকতে ভিড়েছে ;

তবু কোথাও সেই অনির্বচনীয়

স্বপনের সফলতা—নবীনতা—শুভ মানবিকতার ভোর।"

'এই শুভ মানবিকতার আলো'র সঙ্গেই আমাদের চাক্ষুষ পরিচয় করিয়ে দেন অবনীন্দ্রনাথ, তাঁর নালকে।

"দেখতে দেখতে সিদ্ধার্থের চোখের সামনে থেকে—মনের উপর থেকে জগৎ-জোড়া মহাভয়ের ছবি আলোর আগে অন্ধকারের মতো মিলিয়ে গেল। তিনি দেখলেন, আকাশের কুয়াশা আলো হয়ে পৃথিবীর উপর এসে পড়েছে।...পাখিদের গানে গানে বনে-উপবনে সেই আলো। বাহিরে বাঁশী হয়ে বেজে উঠছে, অন্তরে সুখ হয়ে উথলে পড়ছে, শান্তি হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, সেই আলো।"

জীবনানন্দের 'সুতীর্থ' উপন্যাস যখন শেষ পরিচ্ছেদে পা দেয়, তখন দেখি তার অন্যতম নায়িকা জয়তী নিজের চোখকে অন্ধ করে তুলেছে সরাসরি সূর্যের দিকে তাকিয়ে।

অবনীন্দ্রনাথের 'মাসি' যখন শেষ হয়, আমাদের কানে বেজে ওঠে মাসির গলার একটি স্মরণীয় উক্তি—

"প্রভু যেখানেই যাই যেন উদয়-অস্ত, চাঁদ-সূর্যির আলো পাই।"

অবনীন্দ্রনাথ এবং জীবনানন্দ পড়ার পর আলো সম্পর্কে আমাদের অবিশ্বাসের সবটুকু সংশয়ই মুছে যায় যেন। আমরা যেন সর্বশরীরে অনুভব করতে থাকি উদয়-অস্ত, চাঁদ-সূর্যির আলো।
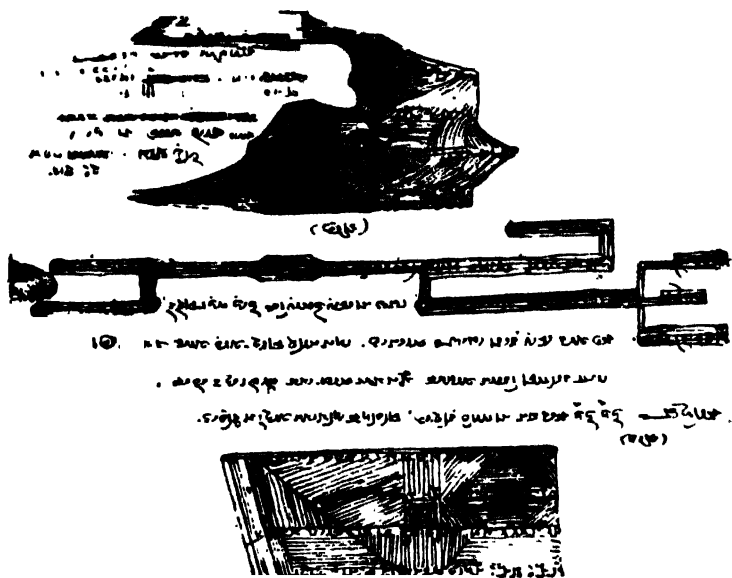
অদ্ভুত আঁধার এক

রবীন্দ্রনাথ আগুনকে বলেছিলেন ভাই। স্পেনের বেদনার্ত দার্শনিক উনামুনো বলেছিলেন, বেদনা হল জীবনের ভগিনী। জীবনানন্দ আঁধারকে বলেছিলেন, আলোর রহস্যময়ী সহোদরা। আলোর সঙ্গে অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা গড়ে তোলার পথেই অন্ধকারের সঙ্গে জীবনানন্দের নিবিড় পরিচয়। আর হয়তো রহস্যময়ী বলেই তার প্রতি আরো একটু অতিরিক্ত টান। আসলে পর্বতচূড়ায় পৌঁছবার পথ যেমন পাথুরে এবং পিছল, আলোর অমরাবতীতে পৌঁছবার পথ তেমনি অন্ধকার, অমঙ্গল দিয়ে মোড়া। আলোর আত্মাটুকুই সুন্দর, তার বাইরের চামড়া পাড়াগাঁর ফকিরের আলখাল্লার মতো কালো, কুৎসিত আর বীভৎস নানান অসুন্দরের জোড়াতালি দিয়ে বোনা।

জীবনানন্দ এবং অবনীন্দ্রনাথ, দুজনেই আলোর যাত্রী। আর সেই কারণেই যত কিছু অন্ধকার, যত অমঙ্গল, যত বিনাশ এবং সর্বনাশ, যত রক্ত এবং রণ, যত হত্যা এবং ধ্বংস সম্বন্ধে এঁরা দুজনেই প্রখররূপে সচেতন। নানা উপমায়,

নানা প্রতীকে অন্ধকার যে কত অজস্রবার এঁদের দুজনের রচনায় ছায়া ফেলেছে, তা পরিমাপের বাইরে। যদিও জানি, অবনীন্দ্রনাথের অন্ধকার প্রধানত বর্ণনার। জীবনানন্দের অন্ধকারবোধে সংক্রামিত হয়ে আছে বহু অবিশ্বাস, বহু অশুভ ভাবনা। এই ব্যবধান সত্ত্বেও তাঁদের মিলটাও আশ্চর্য।

জীবনানন্দকে কেউ কখনো অন্ধকারের কবি বলেননি। ইচ্ছে করলে তাও বলা যেতো। কেননা এতো অন্ধকার আমাদের দেশের কবিতায় আর কেউ জড়ো করেননি কখনো। তাঁর সব উল্লেখযোগ্য কবিতাতেই উটের গ্রীবার মতো মুখ বাড়িয়ে দিয়েছে অন্ধকার। তাঁর সমস্ত স্মরণীয় কবিতার শরীরের সবচেয়ে ঝলমলে, সবচেয়ে প্রখর, সবচেয়ে আকর্ষক পোশাক অথবা অলঙ্কারটি হল অন্ধকার। আর অন্ধকারের এই রত্নহার গাঁথার জন্যেই তার অধিকাংশ কবিতার পটভূমি সন্ধ্যে থেকে রাত্রি।

অনুমান করতে পারি, অন্ধকারকে বড় প্রয়োজন ছিল তাঁর। নিজস্ব নিখিলের প্রয়োজনেই তাঁর অন্ধকার ঘেঁটে বেড়ানো। কত মাইল অন্ধকার হাঁটার পর আলোয় উত্তীর্ণ হতে পারবেন তিনি অথবা আলোর বর্শাকে কতখানি ধারালো করলে ভেদ করতে পারবেন অন্ধকার দুর্গের দরজা, এই অঙ্কের উত্তর মেলাবার জন্যেই তাঁর মেধা অথবা প্রজ্ঞার আগুন যজ্ঞের মতো জ্বলে গেছে অবিরল। অন্ধকার আহরণ, তাঁর কাছে সত্য আহরণেরই সমতুল্য।

তাঁর অন্ধকার দু জাতের। একটা অন্ধকার পৃথিবীর অস্তিত্বের ভিতরকার। যেন যুগ যুগান্তরব্যাপী সময় অথবা ইতিহাসচেতনার সারাৎসার সে। যেন কালকালান্তরব্যাপী মানুষের, মর্মমূলের সবচেয়ে গভীর এবং গোপনীয় সত্য সংবাদ। যথা—

১। "অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশী আজ চোখে দেখে তারা"

২। "অন্ধকারে ইতিহাস-পুরুষের সপ্রতিভ আঘাতের মতো মনে হয়
যতই শান্তিতে স্থির হয়ে যেতে চাই।"

৩। "সহসা দেখেছি তারে দিনশেষে,
মুখে তার সব প্রশ্ন সম্পূর্ণ নিহত ;

চাঁদের ওপিঠ থেকে নেমেছে এ পৃথিবীর
অন্ধকার স্থাস্তুতার মতো।"

৪। "পাখি নেই, সেই পাখির কঙ্কালের গুঞ্জরন
কোন গাছ নেই, সেই তুঁতের পল্লবের ভিতর থেকে
অন্ধ-অন্ধকার তুষার পিচ্ছিল এক শোন নদীর নির্দেশে।"

৫। "চারদিকে অন্ধকার বেড়ে গেছে
মানুষের হৃদয় কঠিনতর হয়ে গেছে
বিজ্ঞান নিজেও এসে শোকাবহ প্রতারণা করেই ক্ষমতাশীল দেৎ।"

আরেক ধরনের অন্ধকার হল পৃথিবীর বাইরের শরীরের। অর্থাৎ দৃশ্যময় অন্ধকার। প্রথমটাকে যদি বলি চেতনার অন্ধকার, দ্বিতীয়টিকে বলা যেতে পারে চিত্রের অন্ধকার। চিত্ররূপময়, বর্ণাঢ্য, বর্ণনাযোগ্য।

১। "চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা।"

২। "ধূসর প্যাঁচার মতো ডানা মেলে আঘ্রাণের অন্ধকারে…"

৩। "নক্ষত্রহীন, মেহগনির মতো অন্ধকারে
সুন্দরীর বন থেকে অর্জুনের বনে ঘুরে ঘুরে…"

৪। "অন্ধকারকে ছোট ছোট বলের মতো থাবা দিয়ে
লুফে আনল সে…"

৫। "তবু তুমি শীত-রাতে আড়ষ্ট সাপের মতো শুয়ে
হৃদয়ের অন্ধকারে পড়ে থাক, কুণ্ডলী পাকায়ে।"

আমাদের আলোচনার অন্তর্গত যে-অন্ধকার, তা প্রধানত প্রাকৃতিক। অর্থাৎ যে অন্ধকারে আমরা থাকি, বসি, উঠি, হাঁটি, মাখি, ছুঁই, ঘাঁটি এবং স্বপ্ন দেখি আলোর। আমরা খুঁজবো, আমাদের দুই আলোচ্য কবি সেই অন্ধকারকে এঁকেছেন কে কেমন রঙে, বাজিয়েছেন কে কেমন সুরে।

জীবননান্দ যত এগিয়েছেন অন্ধকার থেকে অমৃত সূর্যের দিকে, ততই দেখা যায় তাঁর কবিতায় অন্ধকারের উল্লেখ চলেছে বেড়ে।

বনলতা সেন-এর পঙ্‌ক্তি সংখ্যা-১৮। সেখানে 'অন্ধকার' এই শব্দটির উল্লেখ ৫ বার। সাতটি তারার তিমির-এ 'উন্মেষ' নামের কবিতাটির শেষ ১৮ লাইনে তিমির, অন্ধকার আঁধার এবং রাত্রির বেবুন মিলিয়ে অন্ধকারের অনুষঙ্গ ৮ বার। জীবনানন্দ যখন লেখেন—

"পথ চলি, ঢেউ ভেঙে পায়ে
রাতের বাতাস ভেসে আসে
আকাশে আকাশে
নক্ষত্রের পরে
এই হাওয়া যেন হা-হা করে
হু হু করে অন্ধকার"

তখন অবনীন্দ্রনাথেও খুঁজে পাই একই অন্ধ হাওয়ার ছবি, অন্য সুরে।

"মথুরাপুরের ঝড়ের বাতাস দেবকীর কারাগারে লোহার কপাট নাড়া দিয়ে নগরবাসীদের ঘর-দুয়ার ভেঙে চুরে শিকল-ছেঁড়া পাগলের মতো হু হু করে হা-হা করে হেসে সারা শহর ঘুরে বেড়াতে লাগল।"

অবনীন্দ্রনাথ যখন বলছেন,

"আকাশে একটা কালো সূর্যি উঠেছে।"

তখন জীবনানন্দ লিখেছেন,

"আমার আকাশ কালো হতে চায়
সময়ের নির্মম আঘাতে।"

অবনীন্দ্রনাথ—

"রাত্রি অন্ধকার, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের খিলান, তার মাঝে গজদন্তের কাজ করা বড়ো বড়ো দরোজা খোলা…হাঁ হাঁ করছে,—"

জীবনানন্দ—

"ফাল্গুনের অন্ধকার নিয়ে আসে সেই সমুদ্র পারের কাহিনী
অপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা।"

অবনীন্দ্রনাথ আঁকছেন এমন জ্যোৎস্না, যার—

"ম্লান পাণ্ডুতা একখানি শোণিতহীন মুখচ্ছবির মতো"

অথবা এমন সূর্য, যাকে দেখতে—

"একখানা কলঙ্কধরা থালার মতো।"

জীবনানন্দ আঁকছেন এমন রাত্রি, যা শোণিতহীন নয় কিন্তু রুগ্ন, ফ্যাকাশে, অসুস্থ।

"ফ্যাকাশে মেঘের মতো চাঁদের আকাশ পিছে রেখে
চলে যাই, কোনও এক রুগ্ন হাত আমাদের টানে।"

অথবা এমন আকাশ যার রঙ মড়ার চোখের রঙের মতো।

তাঁর গল্পেও অন্ধকারের আসা-যাওয়ার দরজাটা খুলে-রাখা। কখনো আঁকছেন চরিত্রের ভিতরকার অস্থি-মজ্জার অন্ধকার। কখনো পৃথিবীর অন্ধকার। কখনো আবার পৃথিবীর অন্ধকার এসে তাঁর চরিত্রদের অবয়বে-অনুভবে আলপনা কিংবা আঁকচারা কেটে যাচ্ছে যখন যেমন খুশী।

১। স্মিতা হাসতে-হাসতে অন্ধ হয়ে পড়েছিল যেন—না, সন্ধ্যার অন্ধকার হয়ে গেল।" বিলাস

২। "চাতাল দেয়াল, মশারি কখন যে অন্ধকার হয়ে গেল ঘুমের ভিতর, শান্তিশেখর তা বুঝতেই পারল না; নির্জন, অন্ধকার নিজেও এখন সে—" বিলাস

৩। "কতকগুলো আলমারির লবেজান অন্ধকার—অন্ধকারের তিব্বতী পবিত্রতা তবু—ধুপের আবছায়া আর মনিপদ্মেহুম—টেবিল ডেস্ক ও একটা বৈরাট্যের ছায়ান্ধকার ছাড়া কিছুই দেখছিল না সে তবুও।" বিলাস

৪। "বাংলার পাড়াগাঁর উচ্ছন্ন-যাওয়া ভিটের ওপরেও যে অন্ধকার নেমে আসে, যে-ঘেঁটু ফুল ফণীমনসা বাসা বাঁধে তা কী নরম—নিবিড়।"

গ্রাম ও শহরের গল্প

৫। "মাল্যবান ঘরের বাতি নিভিয়ে দিল। কিন্তু বাইরের একটা আলো ঘরের ভেতরে ঠিকরে পড়ছে, অমরেশের সাইকেলটা ঝিকঝিক করে উঠেছে তাই। যখনই সাত-পাঁচ ভাবে মাল্যবান—অন্ধকারের ভেতর চলে যায়; সুফলা ফলার মতো অন্ধকারটা কেটে সাইকেলটা ঝলসে ওঠে আবার"

মাল্যবান

৬। "স্বপ্ন হচ্ছে অন্তিম জিনিস-এর পর আর কিছু নেই; ছোট অন্ধকার আর বড় অন্ধকারের টানা-পোড়েনে রাতের আলোয় অন্তিম ঘনিয়ে উঠলে স্বপ্ন দেখা যায়—দুঃস্বপ্ন; ভালো স্বপ্নও, আশ্চর্য রকমের স্নিগ্ধ স্বপ্ন সব।" মাল্যবান

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় তাঁর কবিতার মধ্যেকার অন্য এক মন্ত্রোচ্চারণ

"হয়তো বা অন্ধকারই সৃষ্টির অন্তিমতম কথা।"

যদিও আমরা জানি তাঁর নিজের সৃষ্টিতে অন্ধকার অন্তিমতম কথা নয়। অন্তিমতম উপলব্ধি হল, আলো। সেই আলোকে অন্তরতমরূপে পাওয়ার জন্যেই পৃথিবীর অন্ধকার পথ ধরে তাঁর এমন দীর্ঘ, দীর্ণ হাঁটা।

অবনীন্দ্রনাথ তো তাঁর 'আপন কথা' শুরুই করেছেন অন্ধকার দিয়ে।

"রাতের অন্ধকারের মাঝে দাঁড়িয়ে সারি সারি পাল তোলা থাম, এরই ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে আমাদের তেতলার উত্তর-পূর্ব কোণের ছোট ঘরটা…"

অথবা

"একেবারে রাতের অন্ধকারের মতো কালো ছিল আমার দাসী—সে কাছে বসেই ঘুম পাড়াত কিন্তু অন্ধকারে মিলিয়ে থাকত সে, দেখতে পেতেম না তাকে।"

অথবা

"প্রায় রাতের মতো চুপচাপ আর অন্ধকার হয়ে যেত ঘরখানা দিন দুপুরে। …কাজেই এই সময়ে আমাদের সঙ্গে ছাড়া পেয়ে জিনিসগুলোও যেন হঠাৎ বেঁচে উঠত এবং তারাও বেরিয়েছে দিন-দুপুরের অন্ধকারে খেলার চেষ্টায়।"

স্মৃতি-কথায় বাইরে নিজের সৃষ্টি করা যে রাজ্যপাট, যে-রাজত্বের সম্রাট তিনি,অর্থাৎ তাঁর শিশু সাহিত্যে অন্ধকারের ছবি যে কত বার, কত রঙে এঁকেছেন, তার হিসেব-নিকেশ নেই। তাঁর 'আলোর ফুলকি'র অনেকখানি জুড়ে অন্ধকার রাত। সেখানে যেই ঘনিয়ে এল রাত্রির নীল অন্ধকার, নিশুতি হল চারদিক অমনি কালো বেড়ালের সবুজ চোখ দুটো ঝকঝক করে উঠল অন্ধকারে। অন্ধকারে বাদুড়গুলো জাদুকরের হাতের তাসের মতো দেখা দিচ্ছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। রাত্রির অন্ধকারকে বিকৃত শব্দে ভরে দিয়ে পেঁচারা ডানা ঝাপটায় আর জয়ধ্বনি দেয় অন্ধকারের। তাদের 'চোপ' বলে ধমকে দিয়ে হুতুম প্যাঁচা নিজেই গায়ত্রী পাঠ করে যার অন্ধকারের—

"নিঝুম রাত, দুপুর রাত, নিশুত রাত। কেষ্ট পক্ষের কষ্টিপাথর কালো আকাশের কালো রাত। বর্ষাকালের কাজলমাখা পিছল রাত। নিখুঁত রাত। কালোর পরে একটি খুঁত তারার টিপ। ভয়ংকরী নিশীথিনী, বিরূপা ঘোর, ছায়ার মায়ায়, থাকুন, তিনি রাখুন। নিশাচর নিশাচরী, রক্তপাত করি, আচম্বিতে নিঝুম রাতে দুপুর রাতে। নষ্ট চন্দ্র, ভ্রষ্ট তারা, ভিতর-বার অন্ধকার-রাত সারা রাত। নিঝুম দুপুর, নিখুঁত দুপুর, অফুর রাত।"

আর এই অন্ধকারের মধ্যেই ডাইনীর কালো চুলের মতো জট পাকাতে থাকে একটা ষড়যন্ত্র, কুঁকড়োর বিরুদ্ধে, কুঁকড়োকে হত্যার জন্যে, যে-কুঁকড়ো আলোর গান গেয়ে পৃথিবীতে ডেকে আনে সাদা ফুলের মতো সাদা আলোর, রাঙা ফুলের মতো রাঙা আলোর ভোরবেলা।

নাতি বীরুর প্রতিকৃতি

তাঁর 'রাজকাহিনী'তে অধিকাংশ প্রধান ঘটনাই ঘটে অন্ধকারে।

পৌষ মাসের প্রথমে ঘন কুয়াশায় পৃথিবী যখন অন্ধকার, যখন আদিত্য-মন্দিরের সূর্য-পুরোহিত ভীমের বুকপাটাখানার মতো মন্দিরের দরজাটা বন্ধ করেছেন বহু কষ্টে, সেই সময়েই দেবাদিত্যের একমাত্র কন্যা সুভগা, বিয়ের রাতেই যিনি বিধবা, তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায় আশ্রয় মেগে। আবার সেই ব্রাহ্মণ যখন আরতি-শেষের নিভন্ত প্রদীপের মতো নিভে গেলেন তখনও পৃথিবী অন্ধকার, অস্ত গেলেন সূর্য। 'বাপ্পাদিত্যে' নাগাদিত্য মারা গেলেন অন্ধকারে। বাপ্পাদিত্যকে যখন মহারানীর কোল থেকে ছিনিয়ে নিতে এল ভীল সর্দার, তখনও আকাশে ঘোর অন্ধকার। 'পদ্মিনী'তে একদিন গভীর রাত্রে ভীম সিং পদ্মিনীকে ডেকে নিয়ে এলেন কেল্লার ছাদে, সমুদ্র দেখাতে।

"অন্ধকার আকাশ—চন্দ্র নেই, তারা নেই, পদ্মিনী দেখলেন সেই অন্ধকার আকাশের নীচে আর একখানা কালো অন্ধকার কেল্লার সম্মুখ থেকে মরুভূমির ওপর পর্যন্ত জুড়ে রয়েছে। পদ্মিনী বলে উঠলেন, 'রানা এখানে সমুদ্র ছিল, আমি তো জানি না, মাগো, সাদা সাদা ঢেউ উঠছে দেখ।'

ভীম সিং হেসে বললেন, 'পদ্মিনী এ যে-সে সমুদ্র নয়, এ পাঠান-বাদশার চতুরঙ্গ সৈন্যবল! ঐ দেখ, তরঙ্গের মতো শিবিরশ্রেণী জল-কল্লোলের মতো ঐ সৈন্যের কোলাহল!···

ভীম সিং আরো বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ একটা কালো-পেঁচা চিৎকার করে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল, তার প্রকাণ্ড দুখানা কালো ডানার ঠাণ্ডা বাতাস অন্ধকার ছাদে রাজা-রানীর মুখের উপর কার যেন দুখানা ঠাণ্ডা হাতের মতো বুলিয়ে গেল।"

ঐ 'পদ্মিনী' উপাখ্যানেই আবার—

"অমাবস্যার রাত্রি, আকাশে শুধু তারার আলো, পৃথিবীতে কালো অন্ধকার; ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ—"

এরই কয়েক লাইন পরে

"তখন রাত্রি আরো অন্ধকার হয়েছে; পাহাড়ের গায়ে বড়ো-বড়ো নিম গাছ কালো-কালো দৈত্যের মতো রাস্তায় দুই ধারে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে।"

আরো খানিক পরে—

"মহারাজা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন—ঘরের এককোণে

সোনার দীপদানে একটি মাত্র প্রদীপ জলছিল, প্রকাণ্ড ঘরের আর সমস্তটা অন্ধকার। খিলানের পর খিলান, থামের পর থামের সারি অন্ধকার থেকে গাঢ় অন্ধকারে মিশে গেছে—"

প্রচুর অন্ধকার ছড়ানো রয়েছে 'নালকেও'।

১। "রাগে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করে বিকট হুঙ্কার দিয়ে তখন আকাশ ধরে টান দিলে 'মার'। তার নখের আঁচড়ে অমন-যে চাঁদ-তারায় সাজানো নীল আকাশ সেও ছিঁড়ে পড়ল শত টুকরো হয়ে একখানি নীলাম্বরী শাড়ির মতো। মাথার উপরে আর চাঁদ নেই, তারা নেই; রয়েছে কেবল মহাশূন্য, মহা অন্ধকার।"

২। "আজ মারের ডাকে রসাতলের কাজল অন্ধকার কাঁথার মতো সর্বাঙ্গে উড়িয়ে নিয়ে আর্তনাদ করে ছুটে আসছে সে 'মারী'।"

ভূত-পত্রীর দেশেও অন্ধকার। সে অন্ধকার আরো বিচিত্র। সেখানকার অন্ধকারে কালো বেড়ালের মতো গুঁড়ি মেরে বসে থাকে শেওড়া গাছের ঝোপ। সেখানে অন্ধকারে নেমে আসে লণ্ঠন-ভূত, ঘোড়া-ভূতেরা। জলন্ত বালি তুবড়ি-বাজির মতো ফস করে জলে ওঠে অন্ধকারে। ভূত-বেহারারা পাল্কী বয়ে নিয়ে যায় হাড় খটখট, দাঁত কিটমিট সুরের কাতরানিতে—

ভূত পেরেতে
চলছে রেতে
হনহনিয়ে
ভূত পেরেতে।
সব ভূতুড়ে
সব ভূতুড়ে
আলো আলেয়া
জলছে দূরে।

অন্ধকারের এত অফুরান বর্ণনা আঁকতে আঁকতে হঠাৎ আমাদের চমকে দিয়ে বলে উঠলেন—

"ভূতচতুর্দশীর রাত্রি এমন অন্ধকার যে, ভূতকে পর্যন্ত দেখা যায় না।"

অবনীন্দ্রনাথ শুধু অন্ধকারের ছবি আঁকেননি। ছবি আঁকার বেলাতেও অন্ধকারের কতখানি দরকার, তাও জানিয়েছেন অনেকবার। সরকারী আর্ট

স্কুল থেকে একদল ছাত্র গেছে দেখা করতে। কথায় কথায় বললেন—

—কি এনেছ দাও।

অর্থাৎ ছাত্রদের আঁকা কাজের নমুনা দেখতে চাইলেন। আর সেই কাজ দেখতে দেখতেই বলে উঠলেন

—কোন্ রঙ সেরা রঙ বলতো? কালো, কথায় বলে জগতের আলো। জান না? দেখো জাপানীরা চীনারা রঙ ছেড়ে কালি ধরেছে। শুধু কালি দিয়ে কি চমৎকার ছবি আঁকছে।

আরেক দিনের ঘটনা রানী চন্দে-র লেখায়—

"আমার বড়দা নিজের আঁকা ছবি একখানা নিয়ে এলেন অবনীন্দ্রনাথকে দেখাতে। ছবির সাবজেকট, তীর্থযাত্রী। স্ত্রী পুত্র ও বৃদ্ধা মাকে নিয়ে চলেছে পুরুষ তীর্থের পথে। বনপথ, রাত্রিবেলা; পুরুষটির হাতে লণ্ঠন, সেই লণ্ঠনের আলোয় পথ চলেছে সবাই।

অবনীন্দ্রনাথ তুলিভরা কালো রঙ তুলে বন, পথ আকাশ সব ঢেকে দিলেন।

বড়দা তখন কলকাতার আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর নিয়ে শান্তিনিকেতনে বসবাস করছেন। তাঁর প্রৌঢ় বয়সের ফিনিশ করা ছবি, তার উপরে অবনীন্দ্রনাথ কালি ঢালছেন আর বড়দা নিঃসাড়ে পাশে বসে দেখছেন। যেন পাঠশালার বালক ধমক খেয়ে থতমত হয়ে আছে। অবনীন্দ্রনাথ কালো রঙ দিয়ে সব কিছু ঢাকছেন আর বলছেন, লণ্ঠন ঝুলিয়ে দিলেই বুঝি হল? আলো বোঝাবে কী দিয়ে? কালো করো আগে চারিদিক। যেখানে আলো সেইখানেই অন্ধকার। অন্ধকার নইলে আলো ফুটবে কী করে।"

শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ

অবনীন্দ্রনাথ এবং জীবনানন্দ দুজনেই আলো ফোটানোর জন্যে, কালো অন্ধকারকে বুনে গেছেন তাঁদের রচনার মর্মে মর্মে।

জীবনানন্দের সুতীর্থ উপন্যাস যত এগিয়ে চলে শেষের দিকে, ঘন হয়ে ওঠে অন্ধকার। গাছপালা, আকাশের উঠোন, শহরের অলিগলি, ঘরের দরজা-জানলা —চৌকাঠ-বারান্দা পার হয়ে অন্ধকার ঢুকে পড়ে জীবনে, শ্বাস-প্রশ্বাসে, চিন্তায়, জীবন-ভাবনায়, ইতিহাস-চেতনায়। ঘরের আলো জ্বালালেও চোখের সামনে এঁটে থাকে, সে অন্ধকার এমন। বড়ো-আকারের বিপ্লব, মাঝারী-রকমের ধর্মঘট, অথবা এসবের চেয়ে অনেক বেশী সাধারণ গড়নের ঠুনকো

কথাবার্তা, সমস্ত কিছুর মাঝখানেই সুতীর্থ অনুভব কিংবা প্রত্যক্ষ করে এক অবধারিত, নিরবলীন অন্ধকারের যেন শরীরময় উপস্থিতি। তার মনে হয়—

"আজকাল পৃথিবীটাই এমন অন্ধকার, আঁশটে যে নির্মল মন খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তা পুড়ে যাবার আগে খুব উজ্জ্বলতা ফলিয়ে যায়, খুব তেজস্ক্রিয় তাপ; কিন্তু তার পরে কালো ছাই পড়ে থাকে।...শান্ত ঠাণ্ডা হয়ে থাকার চেয়ে ভালো জিনিষ এই অন্ধকার আঁশটে পৃথিবীতে থাকতে পারে না কিছু আর; বেশ তিরিক্ষে তামাশাবোধ ছাড়া কেউ শান্ত হয়ে থাকতে পারে না এই কাদা রক্ত আগুন বিষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।"

অবনীন্দ্রনাথ যখন শান্ত এবং ঠাণ্ডা হয়ে, ছবিতে যা কিছু উজ্জ্বলতা অথবা তেজস্ক্রিয় তাপ জ্বালিয়ে দেওয়ার পর, একরকম তামাশাবোধ থেকেই রচনা করে বলেছিলেন উদ্ভট-অদ্ভুত যাত্রাপালা আর কুটুম-কাটাম-এর অনাসৃষ্টি, তখন তিনিও কি সময়ের অথবা পৃথিবীর কিংবা ইতিহাসের রক্ত আগুন বিষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেখতে পেয়েছিলেন অমনি তমো অন্ধকার, যা কোনো লৌকিক সূর্যের আলোয় পরাভূত হওয়ার নয়?
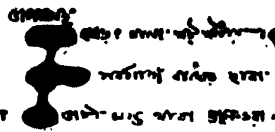
শীত রাতের স্তব

কোনদিন ফুরুবে না শীত, রাত, আমাদের ঘুম ?
না, না, ফুরুবে না।
কোনদিন ফুরুবে না শীত, রাত, আমাদের ঘুম ?
ফুরুবে না, ফুরুবে না।
কোনদিন ফুরুবে না শীত, রাত, আমাদের ঘুম ?
না, না ফুরুবে না।
কোনদিন ফুরুবে না শীত, রাত, আমাদের ঘুম ?
ফুরুবে না, ফুরুবে না। কোনদিন—

জীবনানন্দ তাঁর 'মাল্যবান'-উপন্যাসটির শেষ দিকে রচনা করেছিলেন এমনি এক স্তবক, অন্ধকার শীতরাতের স্তব।

এই রকম মোহময় স্তবক ফিরে এসেছে তাঁর পরবর্তী উপন্যাস, সুতীর্থেও, ভিন্ন আকৃতিতে।

"বিরূপাক্ষ চুরুট জ্বালাতে গিয়ে দেখল তার হাত কাঁপছে, সমস্ত শরীর একটা আশ্চর্য উত্তেজনায় কাঁটা দিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে তার।

—'আপনি আমাকে এতটা বিশ্বাস করবেন না বিরূপাক্ষ বাবু'।

'আপনি ছাড়া কাউকেই—বড্ড শীত—'

'স্থতীর্থের কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নিন'

'না কম্বল লাগবে আমার'।

'আজ শীত নেই তো।'

'শীত নেই তো, শীত করছে বড্ড।'

'দিনটা তো আজ গরম—'

'কিন্তু আপনি তো শীত পুকুরের বর্ত করেছেন বিরূপাক্ষ বাবু।'

'শীতটা কমছে' বিরূপাক্ষ বললে।

'কমবে, বাড়বে, ওটা শীত রাতের শীত নয়।'

'তবে?'

'ওটা নাভীর শীত।'

বিরূপাক্ষ বিস্ময়ে একটা বেড়াল শেয়ালের মতো অবোল মিনি মণিকা দেবীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শেষে বললে,

'শীতটা যে ভেতরের সেটা সত্যি।"

এলিয়টের কবিতা আলোচনা করতে গিয়ে আমেরিকার কবি ও সমালোচক লিওনার্দ আনজার তাঁর প্রবন্ধের শুরুতেই প্রস্তুত করেছিলেন একটা তালিকা, যে-সব 'images, themes, concepts' এলিয়টের কবিতায় বারে বারে আসা-যাওয়া করে, নানা সময়ে নানান সাজে সেজে অথবা একেক সময়ে একেক রকম তাৎপর্যের মেঘ ও রৌদ্র ফুটিয়ে, তাদের এক জায়গায় এনে। সে-তালিকার দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই বহুবিধ বস্তু ও বিষয়। যেমন, ফুল ও বাগান, বিশেষ করে গোলাপের। যেমন জলের উপর-তল এবং ভিতর-তলের ঢেউ বা আলোড়ন। বছর, মাস, সপ্তাহ, দিন অথবা দিনের নির্দিষ্ট সময়ের অর্থাৎ সকাল, সন্ধ্যে, রাত্রির উল্লেখ। মানুষের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। মানুষের মাথার চুল। সিঁড়ি। সঙ্গীতের শব্দ ও স্পন্দন। গন্ধ। এবং এ-সব ছাড়াও সে তালিকায় রয়েছে আরো একটি জিনিস, 'smoke & fog', অর্থাৎ ধোঁয়া আর কুয়াশা।

ইচ্ছে করলে জীবনানন্দের কবিতাকেও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করে আমরাও প্রস্তুত করতে পারি এমনি এক তালিকা। এবং নক্ষত্র, নীলিমা, সিঁড়ি, সমুদ্র, পাখি, রোদ, তিমির ইত্যাদি নিয়ে গড়ে-ওঠা সে তালিকায় কুয়াশা অথবা শীত-রাত অথবা হেমন্তের শিশিরের জন্যে যে একটা নির্দিষ্ট জায়গা থাকবে, সেটা অনুমান করে নেওয়া যায় সহজেই। জীবনানন্দের গদ্যে-পদ্যের সঙ্গে শীত-হেমন্তের শিশির এবং কুয়াশার আত্মীয়তা যেন অন্য সকলের চেয়ে অনেক বেশী গাঢ় এবং আন্তরিক। তাঁর কবিতার হোলিখেলায় শিশিরই যেন রঙীন জল, কুয়াশাই যেন আবীর।

শীত অথবা শীতের সহোদর হেমন্ত কি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ঋতু? আর সেই জন্যেই কি ধূসর তাঁর এতখানি প্রিয় রঙ? কবিতা-গল্প-উপন্যাসের বাইরে আর কোথাও কি সমর্থনযোগ্য সংবাদ রয়েছে এর স্বপক্ষে? হ্যাঁ। স্মৃতিকথায়। তাঁর নিজের লেখা স্মৃতিকথায় নয়, তাঁর সম্পর্কে তাঁর ঘনিষ্ঠজনের স্মৃতি-চারণে।

"আসে ধানের আর শিশিরের মাস হেমন্ত। পাতায় ফুলে ধানের গুচ্ছে আকাশের স্নেহ শিশির হয়ে লেগে থাকে। গাছে গাছে পাতারা হলুদ হয়, ধানে জাগে গেরুয়া রঙ, রদ্দুরের রঙ নিভু নিভু নরম হয়ে আসে। শিশিরের গন্ধ মেখে অশ্বত্থের জানালায় উঁকি দেয় পাখিরা নীড়ের সন্ধানে। স্বর্ণশস্যের সফলতায়, শিশিরের ক্লান্তিতে, শান্ত প্রকৃতির সব ঐশ্বর্যে নিবন্ত ম্লানতায় এই ঋতুটি বিশিষ্ট হয়ে থেকে যায় তাঁর মনে। সব শুভ্র স্বপ্ন, সব মুগ্ধ স্বপ্ন, স্বপ্নের মত বাস্তবতার শেষে অতুল সম্পন্নতার আতুর ধ্বংসাবশেষের সমারোহের মধ্যে যে স্পর্শকাতর মনটি ব্যথিত হতে থাকে, হেমন্তের নিভে নিভে যাওয়া রূপের দীনতায় তা যেন বেশি করে ক্লান্ত হোত। ঋতুগুলির মধ্যে হেমন্ত সবচেয়ে রিক্ত, নিঃস্ব, অবহেলিত যাকে তিনি 'সুররিয়ালিস্টিক' মন বলছেন, তা বুঝি এই সব হারাবার হাহাকারে জাগতে শুরু করেছিল, তাই হেমন্তে যতটা একান্ত তেমনটা যেন আর কিছুতেই নয়।"

সুচরিতা দাশ

"কান পাতলেই কবিতায় অন্তহীন এক অরণ্যের মর্মর শুনতে পাই যেন, ঝর ঝর করে গায়ে মাথায় রাশি রাশি হলুদ হেমন্তের পাতা ঝরে পড়ে।"

নরেশ গুহ

শুধু হেমন্ত নয়, হেমন্ত আর শীত, কুয়াশা আর শিশির কার্তিক-অঘ্রান-পৌষ এই তিনটে মাস, খয়েরী ডানা শালিখের মতো সন্ধ্যা, সাদা উঠোনে হিজলের

পাতা ঝরানো অপরাহ্ণ, রাজহংসদের নব-কোলাহলে ভরে-ওঠা ভোর শিরীষের অথবা জামের অথবা ঝাউয়ের অথবা আমের কালো কালো ডালপালার ফাঁকে মাঝরাতের চাঁদ অথবা জ্যোৎস্না ; এই সবের মধ্যে বারংবার ফিরে যেতে পারলে, জলচৌকী পেতে বসতে পারলেই যেন সবচেয়ে তৃপ্ত হয় তাঁর সুখ-সাধ।

শীত-রাতের প্রতি তাঁর ছিল একটা অমোঘ টান। তাঁর কবিতায় এ-সত্য যতটা উজ্জ্বল, তাঁর গদ্য রচনায় ঠিক ততখানিই ভাস্বর। তাঁর প্রায় সমস্ত গদ্য-রচনার পিছনে সময়ের অথবা ঋতুর পটভূমি হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে শীত। তিনটে গল্পের মধ্যে 'ছায়ানট'-এ কোনো বিশেষ ঋতুর ইশারা নেই, কিন্তু 'গ্রাম ও শহরের গল্প' নামের গল্পের শুরুর লাইনটাই হল--

"শীতের রাত।"

তারপর অজস্র উল্লেখ।

১। "হঠাৎ পাড়াগাঁয় কুয়াশা, ধানের ক্ষেত, পালংশাক, কপি, বীট, গাজর, শিউলী, বেঁটে খেঁজুর গাছ শুয়োপোকা, প্রজাপতি, কাঁচপোকা, জোনাকী —আট-দশ বছর আগের কত কী মনে পড়ে যাচ্ছে ; পাড়াগাঁর রাত এমন নিস্তব্ধ হয়ে যায় যে সুপুরীর কুঁড়ি ঝরবার শব্দ অবদি শোনা যায় ; আমের মুকুলও আওয়াজ করে ঝরে—টুপ টাপ—টুপ টাপ—টুপ টাপ…"

২। "প্রকাশের কথা মনে হলেই বহির্বাংলার অজস্র স্টেশনের কথা মনে হয়—শীতে বৃষ্টিতে অন্ধকারে বিরাট অলেস্টার গায় দিয়ে হ্যাট মাথায় সমস্ত দুর্দান্ত দুঃসাধ্য ভিড়ের সর্ববাদীসম্মত অধিনায়কের মতো শচীকে নিয়ে চরে-ফিরে বেড়িয়েছে প্রকাশ।"

৩। "তারপর গভীর রাতে—শীতের গভীর রাতে—বুঝতে পারে না শচী —সোমেন বলে একটা লোক আছে কিনা—তার কোনো মূল্য আছে কিনা —পৃথিবীর কোনো দরকারেই তার কোনো প্রয়োজন আছে কিনা—বাস্তবিক রক্ত মাংসের কোনো অবয়ব বা মুণ্ডও আছে কিনা সোমেনের—এইভাবে শচী : শীতের রাত, শীতের গভীর রাত—বাংলার শীতের গভীর রাত, প্রকাশ তাকে নিয়ে যেন কোনো বাংলার মাঠে আমনের ক্ষেতের পাশে টাপুব-টুপুর শিশিরের ভিতর কোনো মধুমতী কর্ণফুলী আড়িয়াল খাঁ নদীর কিনারে প্রোথিত করে রাখে —হা ভগবান, প্রোথিত করে রাখে যেন।"

'বিলাস' গল্পের সময়কালও শীত। এবং শীতের রাত। নায়ক শান্তি-

শেখরের জীবনে এই শীতের রাতটুকুই মনের মধ্যে যত উৎকৃষ্ট ফসল ফলাবার সময়। সে লুপ্ত হয়ে যায় তার নিকট-পৃথিবী থেকে। অন্য পৃথিবী, তার মন-গহনের পৃথিবী তাকে ডেকে নিয়ে যায় স্বপ্নের চরাচরে, স্বপ্নকে বাস্তবের শরীরের স্বাদ গন্ধে পেয়ে যাওয়ার এক সুস্বাদু আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে।

১। "চাতাল, দেয়াল, বাতাস, মশারি কখন যে অন্ধকার হয়ে গেল ঘুমের ভিতর, শান্তিশেখর তা বুঝতেই পারল না। নির্মল অন্ধকার নিজেও এখন সে—মনে করে দেখবার, বা বিচার করবার মন নয়। মঞ্চের ওপর কেউ নেই এখন আর—মাস্টারমশাই—লাইব্রেরী—বইয়ের ঘ্রাণ—সমস্তই এমন নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়েছে যে, এগুলো যে কোথাও কোনোদিন ছিল, আজ শীতের রাতের গাঢ় রাতের স্বপ্নে এখুনি যে দেখা দিয়ে গেছে, মুহূর্তের ভিতরেই শান্তিশেখরের মন থেকে সে-সত্য মিলিয়ে গেল সব ; যেন এসব কিছুই কোনোদিন ছিল না আবার যদি সময়ের খেয়ালে রাতের স্বপ্নে কোনো দিন দেখা হয়, তা হলে হবে, নইলে এসব কিছুই কোনো দিন থাকবে না আর।"

২। "পৌষের রাত প্রায় তিনটে হবে। কলকাতায় এবারে শীত পড়েছে খুব। শান্তিশেখর যে-ঘরটায় থাকে, সেখানে দিনের বেলা কম রোদ পড়ে বলেই রাত খুব প্রখর ভাবে ঠাণ্ডা। কুঁকড়ে-মুকড়ে নিজের অজ্ঞাতসারে অবোধভাবে ছেঁড়া লেপ জড়িয়ে শুয়ে আছে সে। বাইরে কোথাও জল ঝরার শব্দ—প্রায় সারা রাতই শুনতে পাওয়া যায় ; কার বিরাট চৌবাচ্চা ভরছে হয়তো—কিংবা অন্যমনস্কভাবে কল খুলে রেখে গেছে কেউ—হয়তো রসাতলবাহী পাইপের জলধারা রাতের নিস্তব্ধতায় মানুষের আধোঘুমের কাজে ছলছলিয়ে চলকে ছলছলিয়ে কোথার থেকে কোথায় চলে যাচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন। ···আধো ঘুমন্ত মানুষের হৃদয় এমন নির্জন রাতে একজন দেবিকাকেই চায় তবুও—জলের থেকে উঠে আসুক—উঠে আসুক রাস্তার শামদানের বিদ্যুতের থেকে। কিন্তু কেউই এল না। ঘুমিয়ে পড়ল শান্তিশেখর আবার।"

অবশেষে, এই গল্পে, শীতেরই এক গভীর রাতে শান্তিশেখর নিজের মৃত্যু কামনা করতে করতে কীভাবে যে মারা গেল, তার কোনো পরিষ্কার হিসেব না দিতে পারল ডাক্তার, না খুঁজে পেল কোনো অনির্বচনীয় কারণ তার ফ্ল্যাটের অন্য ভাড়াটেরা। আমরা শুধু জানলাম, মৃত্যুর আগে কী চেয়েছিল, কী ভেবেছিল শান্তিশেখর।

৩। "এই ঘুম মৃত্যু হোক। ঘুমের আগে অনেক বইয়ের কথা মনে হল, অনেক নারীর কথা মনে পড়ল তার ; চেনা, অচেনা, আধো চেনা, বিদ্যুৎ প্রতীক কারো, কারো-বা জবারঙের শাড়ি, কারো নেবুবনের মিষ্টি প্রভৃতি, রোদের বলয়ে নগরীর মতো কেউ, অন্ধকারে কেউ ঘাসের মতো, শিশিরের মতো।"

সাল নেই। কিন্তু মাস আর তারিখটা আছে। বিশে অঘ্রান। এই তারিখ থেকে 'মাল্যবান' উপন্যাসের শুরু। মাল্যবানের জন্ম-তারিখ এটা। জীবনানন্দ নিজে জন্মেছিলেন ফাল্গুনে। ফাল্গুনের কবি তাঁর স্বরচিত চরিত্রটির জন্মলগ্নে টাঙিয়ে দিলেন শীত-কুয়াশার এবং শিশিরের পটভূমি। আর তাঁর অন্য সব গদ্য রচনার মতোই এটিরও শুরু হল রাতে। রাত একটায়। এখানেও নায়ক চরিত্রটি ঘুম-না-পাওয়া মানুষ। রাত দশটায় শুয়েছিল কম্বল মুড়ি দিয়ে। ঘুম আসেনি। ঘুমের বদলে স্বপ্নের মতো স্মৃতির আসা-যাওয়ায়, গল্পগুজবে ডুবে রয়েছে সে।

"আজ ছিল তার জন্মদিনের তারিখ। বেয়াল্লিশ বছর আগে—এমনি অঘ্রান মাসের বিশ তারিখে কলকাতা থেকে প্রায় দেড়শো মাইল দূরে বাংলাদেশের একটা পাড়াগাঁয়ে সে জন্মেছিল। সেখানে খেজুরের জাঙ্গাল বেশী, তালের বন কম, সুপুরীর গন্ধ হয়তো সবচেয়ে বেশী। এমনি শীতে খেজুর গাছের মাথা চেঁছে একটা নল বসিয়ে গলায় হাঁড়ি বেঁধে দেওয়া হয়, সমস্ত শীতের রাতে ফোঁটা ফোঁটা রস ঝরতে থাকে, মাছি-মৌমাছি ছোটো ছোটো রেতো প্রজাপতি, বড়গুলোও সেই হাঁড়ির রসে সাঁতার কাটছে। পাখনা নাড়ছে, মরে আছে, কুয়াশায় নির্জন ঠাণ্ডা নিবিড় শেষ রাতে দেখা যায় এই সব। এমনি শীতের রাতে ধানের ক্ষেত শূন্য হয়ে পড়ে আছে—হলদে নাড়ায় গ্যাজে সমস্ত মাঠ রয়েছে ছেয়ে, শীত পেয়ে দু-একটা বাঘ নেমে আসে ; এমনি উদাস রাতে ফেউগুলো অন্তত খুব হাঁকড়ায়, শ্মশানে 'হরিবোল' যেন কোন দুর কুয়াশা পুরুষের রলরোল বলে মনে হয় ; লক্ষ্মীপেঁচা ডাকতে থাকে, ঘুম ভেঙে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালে দেখা যায় শীতের কুয়াশার সে কোন অন্তিম পোচড়ের ফাঁকে ফাঁকে বৃহস্পতি কালপুরুষ অভিজিৎ সিরিয়াস যেন লণ্ঠন হাতে করে এখান থেকে সেখানে, সেখান থেকে এখানে কোনো সুদূরযানের পথে চলেছে ; কেমন একটা আশ্চর্য দূর পরলোকের নিক্কণ শোনা যায় যেন।"

তাঁর 'মাল্যবান' উপন্যাসখানা যেন শীত কুয়াশা আর শিশির দিয়ে মোড়া।

হেমন্ত আর শীতের স্মৃতি শিশির-কুয়াশার মতই ছেয়ে রয়েছে এই উপন্যাসের দিগ-দিগন্ত। মাল্যবানের অন্তরাত্মার ভিতরে অবিরল শিশির-পাতের শব্দ শুনিয়ে জীবনানন্দ যেন শহরবাসী এই চরিত্রটিকে সমস্ত সময়সীমার ঊর্ধ্বে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রকৃতির নিজের সন্তানের মতো, পৌঁছে দিয়েছেন প্রকৃতির প্রাণস্রোতের ভিতরে। অথবা তাঁর অভিযান যেন দুঃসাহসী কোন প্রত্নতাত্ত্বিকের মতো। মানুষের মর্মমূলের মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে তিনি নেমেছেন অনুসন্ধানে, মানুষ নামক জীবের মগ্ন-চৈতন্যে প্রকৃতির অস্তিত্ব কতখানি সুপ্রাচীন তা জেনে নিতে। একেবারে আধুনিককালের পটভূমিকায় স্থাপন করেও মাল্যবানকে তিনি এমন-ভাবে গড়েছেন, সে যেন পৃথিবীর সদ্যোজাত মানুষ। পৃথিবীকে গোল হয়ে ঘিরে রয়েছে যে অন্ধকার রহস্য, তাকে বুঝে উঠতে না পেরে, চিনে উঠতে না পেরে সে আদি-মানবের মতোই উত্তেজিত, কখনো হিংস্র, কখনো নিজের উপলব্ধির বর্শা-বল্লম নিয়ে আক্রমণে উদ্যত। আর মাল্যবানের রচয়িতা গোড়া থেকেই জানেন, মাল্যবানের পক্ষে পৃথিবীকে সম্পূর্ণরূপে জানা সম্ভব হবে না কোনদিন। মহেনজোদাড়োর প্রস্তরলিপির মতো সে রয়ে যাবে পাঠোদ্ধারহীন। তাই তার চারপাশে প্রকৃতির রহস্যময়তার প্রতীক হিসেবে যেমন টাঙিয়ে দিয়েছেন কুয়াশা-শিশিরের পর্দা, তেমনি টাঙিয়ে দিয়েছে নাগরিকতার প্রতীক হিসেবে মশারি। মাল্যবানের অতীতকে যতখানি ঘিরে রয়েছে কুয়াশা-শিশির, তার বর্তমানকে ঘিরে রয়েছে তেমনি মশারি। মাল্যবান উপাখ্যানে বারংবার ব্যবহৃত হতে হতে মশারিও হয়ে উঠেছে কুয়াশা-শিশিরেরই যেন একটা নাগরিক সংস্করণ। আমরা এবার ব্যাখ্যা ছেড়ে দৃষ্টান্তে আসি। চোখ পেতে দেখে নিই তাঁর শীত- হেমন্ত-কুয়াশা শিশিরের রূপ।

১। "আকাশে অনেক তারা, বাইরে অনেক শীত, ঘরের ভেতরে প্রচুর নিঃশব্দতা, সময়ের কালো শেরওয়ানীর গন্ধের মতো অন্ধকার; বাইরে শিশির পড়ার শব্দ, নাকি সময় বয়ে যাচ্ছে; কোথাও বালুঘড়ি নেই, সেই বালুঘড়ির ঝিরি ঝিরি শিরি-শিরি ঝিরি ঝিরি শব্দ : উৎপলার ঠাণ্ডা সমুদ্র শঙ্খের মতো কান থেকে ঠিকরে মাল্যবানের অন্তরাত্মায়।"

২। "বেশ চমৎকার দাম্পত্য জীবনই জমিয়ে বসেছে বটে মাল্যবানরা; কুয়াশার ভেতর থেকে কুয়াশার দিকে তাকিয়ে যেন উৎপলার দিকে তাকিয়ে রইল মাল্যবান।"

৩। "উৎপলাকে নিজের ঘরে আনার থেকে আজ পর্যন্ত যখনই কোনো মানুষের স্ত্রীবিয়োগের কথা শুনেছে, মাল্যবান সে-মানুষটিকে জাদুঘরের কুল-কিনারায় দেখা অতীব মৃত জিনিসের মতো অতীতের আনন্ত্যের কুয়াশা-ঘরে লীন হয়ে থাকতে দেখেছে সে—অনুভব করেছে ও-মানুষের কোনো ভবিষ্যৎ নেই—"

৪। "এক একদিন শেষ-রাতে গভীর অন্ধকার ও শীতের ভেতর ঘুমের বিছানা এতো ভালো লাগে, জীবনের হৈ-হুটপাট কলরোল এতো নিরর্থও মনে হয় যে, ভোরের আলোর কথা মনে করে ভয় করে তার।"

৫। "মাল্যবানের আশ্চর্য লাগছিল। কোনোদিনও যে জেগে উঠতে হবে না আর, শীত যা সবচেয়ে ভালো, এই বিশৃঙ্খল অধঃপতিত সময়ে সমানে রাতের বিছানা যা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, সেই শীত রাতের কোনো দিন শেষ হবে না আর, উৎপলা সব সময়ই মাল্যবানের সময় ঘেঁষে যাবে অনিঃশেষ শীত ঋতুর ভেতর।"

আরো গভীরতর শীত তাঁর আরো এক উপন্যাসে। শীত সেখানে দুভাবেই উপস্থিত। প্রকৃতির এবং অস্তিত্বের। নায়ক সুতীর্থ লেখা-টেখা ছেড়ে দিয়ে, 'নিরেট পৃথিবীতে টাকা রোজগার করতে গিয়ে মূর্খ ও বেকুবদের সঙ্গে দিনরাত গা ঘেঁষা করে' হারিয়ে ফেলেছে মনের শান্তিসমতা। মন তার ধাতে নেই। নিজের প্রতিভার তুষ-তাপ গেছে নিভে। তার ভিতরকার সেই সব জল, যা হতে পারতো অল্প ঢেউ-এর দীঘি অথবা বেশী ঢেউ-এর প্লাবন, জমে বরফ। সুতীর্থ উপন্যাসে শুধু সুতীর্থ নয়, প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্রই জীবনের অসার্থকতার শীতে আক্রান্ত। প্রত্যেকেই কোথাও যেতে চায়, কিছু পেতে চায়, বাড়ি-বদলের মতো বদলে নিতে চায় জীবনের জন্যে নতুন কক্ষ-কক্ষান্তর। পারে না। শীত তাদের অন্তরাত্মাকে করে রাখে আড়ষ্ট, মন্থর, নির্জীব।

সুতীর্থ উপন্যাসে, ভিতর এবং বাইরের এই শীত এগিয়ে চলেছে সমান তালে, একটা নাড়ির ভিতর দিয়ে, আর একটা চামড়ার গা ছুঁয়ে।

১। "খেয়ে-দেয়ে কোথাও ঢুকে পড়ে দিনটা কাটিয়ে দেওয়া যাক, রাতটাও। দু-তিন দিন থাকতে পারলে তো ভালো। খুব অন্ধকার চাই—খুব চুপ-চাপ। যেন জীবনটা একটা শীতের ঘুমটানা রাত ছাড়া আর কিছু নয়—দেশ গাঁয়ের শীতের চারদিকে খেজুর গাছ কুয়াশা পেঁচা; রাত কোনদিন ফুরোবে না।

ঘুমের থেকে অন্য ঘুমের ভেতর চলে যাবার পথে মাঝে মাঝে একটু জেগে ওঠা—এই স্বাদ, এছাড়া ঘুমের কোন শেষ নেই।"

২। "শীতের এ কটা রাত শুয়োরের মতো সঙ্গ সুখ খুঁজেছে বিরূপাক্ষ; না পেলে আহত হয়েছে—শুয়োরের মতো, মানুষের মতো নয়।"

৩। "কলকাতার মানুষের এরকম চোখ মারার অভ্যেস আছে—খুব বেশী। ভারি নিঘিন্নে মানুষ সব'। বলতে বলতে সিগারেট জ্বালাল বিরূপাক্ষ।

'ভালই করেছেন জানালা বন্ধ করে।' মণিকা বললেন, 'ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল। খুব শীত করছিল।'

'শীত? শীত তো বটেই। তা ছাড়া বাড়ির খোলা জানালা; মানুষের চোখের নজরে আপনি বিশ্বাস করেন না বুঝি?'

'শালটা ভুলে ফেলে এসেছি'।

আলনার থেকে সুতীর্থের একটা ধোসা টেনে ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে মণিকা বললেন, 'আমার মতো মেয়েমানুষের শীতবোধ বড় বেশী বিরূপাক্ষ বাবু, শীত ছাড়া আর কিছুতে আমার এসে যায় না। পাড়া পড়শীর চোখ তো আমার লক্ষ্মী'।"

৪। "শীত রাতে স্ত্রীলোকের মুখে কথিকা শুনে তৃপ্ত হয় ওর মন, কিন্তু এর চেয়েও বেশী কিছু ও চায়; সে সব পাবে না কিছু,…। শীতের খুব বেশী রাতে মনে পড়ে আমাদের ছেলেবেলার বনঝাউ গ্রামে কোকিল ডাকত; গত বছরও গিয়েছিলাম গাঁয়ে, তেমনি ডাকছে কোকিল পউষের মাঝরাতে। কোকিল যখন ডাকে তখন চারদিকে লোচ্চারা কান পেতে শুনছে বলে কোকিলের চরিত্র নষ্ট হয় না।"

৫। অন্ধকারের ভেতর, শীতের ভেতর মণিকা কোনো কথা বলতে গেলেন না আর। বিরূপাক্ষ বলল না কিছু।

মণিকা নিজেকে ঠিকভাবে গুছিয়ে বসে বললেন, 'এমন অন্ধকার যেন কোনোদিন দেখিনি আমি। মনে হয় অন্ধকার যেন বিরাজ করছে।' "

৬। "মণিকাকে আজ রাতে সুতীর্থও খুব হৃদ্যতার সঙ্গে চেয়েছিল বটে; কিন্তু ঠিক এমনভাবে চায়নি। কিংবা এরকম ভাবে পেলেও মন্দ হত কি? কে এই লোকটা সুতীর্থের ইচ্ছাস্বর্গের অপরিসর ধোঁয়া কেটে ফেলে নিজের সপরিসর বস্তুস্বর্গ রচনা করে বসেছে এমন রাতে—এমন পাপরিক্ত অতল

অনিমেষ শীতের রাতে।”

৭। “সুতীর্থ প্রায় বেড়ালের পায়ের নিঃশব্দ পায়ে হেঁটে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল তার ঘর শূন্য নয়, শূন্য তো নয়ই, বেশ সরগরম। দুজন মানুষ পাশাপাশি এক সোফায়ই বসে আছে—ঘুমিয়েই আছে হয়তো—কিংবা আমেজ আড়ষ্ট হয়ে আছে। হয়তো ঘুমিয়ে আছে। এমন শীতের রাতে কতখানি আবেগের ডুব মেরে মেরে সর করতে পারলে—উতরোল রক্তকে খোরাক জুগিয়ে জুগিয়ে অবশেষে শান্ত করে নিতে পারলে মানুষ এমন অদ্ভুত নিঝুম হয়ে পরস্পরের গা ঘেঁষে ঘুমিয়ে পড়তে পারে সোফার ওপর!”

শীতের এই সব একাধিক অতল এবং অনিমেষ রাতের ভিতর দিয়ে এগোতে এগোতে আমরা যখন এই উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে পা দিই তখন কানে আসে দুটি নরনারীর আশ্চর্য এক কথোপকথন, অদ্ভুত এক অভিপ্রায়। প্রাচীন কালে, যখন বর্ষ গণনা হতো বৈশাখ থেকে নয়, শরৎ থেকে, তখন মানুষের মুখে কল্যাণ-কামনার ভাষা ছিল, ‘জীবতু শরদং শতং’। অর্থাৎ শত শরত পরমায়ু হোক তোমার। জীবনানন্দ অথবা তাঁর স্বরচিত চরিত্রেরা এখানে শরতের অথবা বৈশাখের বদলে বেছে নিয়েছে নিজেদেব প্রিয় ঋতু—শীতকেই।

জয়তীকে প্রশ্ন করল সুতীর্থ, চুরুট মুখে দিয়ে—

—পৃথিবীর শীত ঋতুতে গভীর তো সে নিয়ম। তুমি আমার সঙ্গে শেষ দিন পর্যন্ত থাকবে গ্রামে?

জয়তী তার উত্তরে যেন কথা বলল না। যেন পৃথিবীর যাবতীয় প্রেমিকার পক্ষ থেকে পৃথিবীর যাবতীয় প্রেমিকের জন্যে প্রার্থনা করল, প্রার্থনার স্বরে উচ্চারণ করল

—পৃথিবীতে আরো চল্লিশটা শীত ঋতু বাঁচবো আমরা—তুমি আর আমি।

পৃথিবীর সব কবিরই এক একটা প্রিয় ঋতু থাকে। আমরা জেনেছি, রবীন্দ্রনাথের ছিল গ্রীষ্ম। প্রচণ্ড রৌদ্রদাহকে আলিঙ্গন করেছেন তিনি সানন্দে। আর ঐ শুকনো, জ্বলন্ত ঋতুতেই তাঁর কলমে নেমে এসেছে সৃষ্টির বর্ষাধারা। কবিদের প্রকৃতিই বুঝি এই! নিজেরাই গড়ে নেন নিজেদের ঋতু, প্রকৃতির দয়া-দাক্ষিণ্যকে পরোয়া না করে। উপন্যাস ছেড়ে এবার আমরা তাকাবো তাঁর কবিতার দিকে।

তাঁর কবিতার মহাপৃথিবীতে কোন ঋতুরা দীর্ঘজীবী? কোন ঋতুর দিকে

তাঁর ভালবাসার টান? কাদের প্রসঙ্গে তিনি নদীর মতো মুখর, বাতাসের মতো উদ্বেল? এর উত্তর আমাদের জানা। পৃথিবীর সব কবিরাই যে-দুটি মোহিনী ঋতুর প্রেমে আত্মহারা, ইংরেজি সাহিত্যে যা আনন্দের 'অটাম', ফরাসীরা যাকে আদর আদর করে বলে 'লাতন', যে ঋতুর দিকে তাকিয়ে বোদলেয়ার বলেছিলেন—

"তোমরা—নিদ্রালু ঋতু, যারা ম্লান কুয়াশার
আচ্ছাদনে লীন
করে দাও আমার হৃদয় মন যেন এক
অস্পষ্ট কফিনে
লুপ্ত করে কবরে নামিয়ে দাও—
মুগ্ধ আমি তোমাদের গুণে"

বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ

অথবা রিলকে শুনেছিলেন এক অনির্বচনীয় পতনের নিক্কণ—

"পাতা ঝরে, পাতা ঝরে, শূন্য থেকে ঝরে পড়ে যায়
যেন দূর আকাশে বিশীর্ণ হলো অনেক বাগান;
এমন ভঙ্গীতে ঝরে, প্রত্যাখ্যানে যেন প্রতিশ্রুত।"

বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ

আর এমন কি চির-বসন্তের কবি রবীন্দ্রনাথও তাঁর গানে গানে যে দুটি ঋতুর গলায় পরিয়ে দিয়ে গেছেন বরণমালা, যার প্রথমটির মধ্যে তিনি দেখেছেন 'অমৃত নৃত্য' আর দ্বিতীয়টিতে প্রণাম জানিয়েছেন 'সর্বনাশা, 'নমো নমো নমঃ' মন্ত্রোচ্চরণে, সেই হেমন্ত আর শীত জীবনানন্দের কবিতার জল-স্থল-অন্তরীক্ষকে জড়িয়ে আছে এমন করে যেন নারীর শরীরের চিত্রিত কোনো শাড়ি। রবীন্দ্র-নাথের গল্প উপন্যাস বা নানাবিধ গদ্য-রচনা তছনছ করে ঘাঁটার পর আমরা শীত-হেমন্তের কিছু কিছু দৃশ্য খুঁজে পাবো হয়তো। কিন্তু তাদের ক্ষীণতম পরিমাণের মধ্যে দিয়েই ধরা পড়ে যাবে, এদের প্রসঙ্গে কবির নিরুচ্ছ্বাস অনাত্মীয়তা, নিরতিশয় কুণ্ঠা। শুধু যেন সৌজন্য বজায় রাখার খাতিরেই প্রয়োজনমত মিত-সম্ভাষণ, সুস্মিত আতিথেয়তা অথবা আপ্যায়ন। শীত-হেমন্ত-র বেলায় তাঁর এই অস্বাভাবিক দূরত্ব অথবা কৃপণতার বিরুদ্ধে অতৃপ্তির অভিযোগ পেশ করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু হঠাৎ উপলব্ধি করেন—

"হেমন্তের সে-রকম কোনো অভিজ্ঞান—শুধু রবীন্দ্রনাথে কেন, আমাদের কোনো কবিতেই কখনো আমরা পাইনি, যতদিন না জীবনানন্দ দাশ তাঁর চাঁদ, প্যাঁচা, কুয়াশার অদ্ভুত নতুন পাঁচালি আমাদের শোনালেন। এই উপেক্ষিতকে বরণ করলেন জীবনানন্দ; তাঁর কাব্যে আলোর চেয়ে ছায়া বেশী। দিনের চেয়ে রাত্রি বেশী, বেগের চেয়ে বিরাম বেশী;—আমাদের কবিদের মধ্যে তিনিই একমাত্র হৈমন্তিক।"

আমাদের দেশের আর সব কবিদের কাছে যা বিষণ্ণ, ম্লান, রক্তহীন, নিঃসাড়, আর বিধবার শাদা শাড়ির মতো শোক-চিহ্নময়, জীবনানন্দের কাছে, অবশ্যই আবাল্য প্রণয়ের সূত্রে, তা হয়ে উঠলো আজীবন ভালবাসার যোগ্য কোনো রমনীর মতো রমনীয়। তাঁর কবিতায় শীতের রাত অপরূপ কেননা সেই রাত মাঠে মাঠে ডানা ভাসাবার গভীর আহ্লাদে ভরা। নির্জন খড়ের মাঠে পৌষ সন্ধ্যায় তিনি হেঁটে বেড়িয়েছেন অবিরল, কেননা ঐ সময়েই দেখা যায় নরম নদীর নারীরা মাঠের পারে ছড়িয়ে চলেছে কুয়াশার ফুল। তাঁর কবিতায় বারে বারে ফুটে ওঠে যে ধূসরতা, নির্জনতা, নিস্তব্ধতা, নিঃশব্দতার ছবি, তা ঐ কুয়াশার রাত, শিশিরের রাত, শীতের নক্ষত্রের রাতের নিজের হাতে বোনা।

১। "যখন ঝরিয়া যাবো হেমন্তের ঝড়ে
পথের পাতার মতো তুমিও তখন
আমার বুকের পরে শুয়ে রবে?"

২। "আমার বুকের পরে সেই রাতে জমেছে যে শিশিরের জল
তুমিও কি চেয়েছিলে শুধু তাই,…"

৩। "বাহিরের আকাশের শীতে
নক্ষত্রের হইতেছে ক্ষয়
নক্ষত্রের মতন হৃদয়
পড়িতেছে ঝরে
ক্লান্ত হয়ে—শিশিরের মতো শব্দ করে।"

৪। "শীতল চাঁদের মতো শিশিরের ভেজা পথ ধরে
আমরা চলিতে চাই, তারপর যেতে চাই মরে।"

৫। "হলুদ পাতার ভিড়ে বসে
শিশিরে পালক ঘষে ঘষে

পাখায় ছায়ায় শাখা ঢেকে
ঘুম আর ঘুমন্তের ছবি দেখে দেখে
মেঠো চাঁদ আর মেঠো তারাদের সাথে
জাগে একা অঘ্রানের রাতে
সেই পাখি"

৬। "গভীর নীলাভতম ইচ্ছা মানুষের—
ইন্দ্রধনু ধরিবার ক্লান্ত আয়োজন
হেমন্তের কুয়াশায় ফুরাতেছে অল্পপ্রাণ দিনের মতন"

"জীবনানন্দের কবিতা পড়তে পড়তে অজান্তে কখন আমরা সেই রূপসী হেমন্তের প্রেমে পড়ে যাই। ভেবে অবাক লাগে—কৃষির সোনার কৌটোতে আমাদের প্রাণের ভ্রমরটি যদিও রাখা আছে, তাহলেও ফলন্ত ধানের ঋতু হেমন্তের গাথা বাংলা কবিতায় একরকম ব্যতিক্রম বললেই চলে। শুধু কি দৃশ্যের? গন্ধের, শস্যের, আলস্যপূর্ণতা বিষাদের করুণতামাখা লাবণ্যময়ী ঋতু হেমন্ত। বাংলা কাব্য বর্ষার স্তুতিতে, বসন্তের বন্দনায় মুখর। এবং সে দুটি বিখ্যাত ঋতুই—বিখ্যাত আরো অনেক কিছুর মতোই, জীবনানন্দের কবিতায় অনুপস্থিত। হেমন্তের গভীর গম্ভীর রূপ কীটস-এরও প্রাণ ভুলিয়েছিল। শেষ পর্বে জীবনানন্দের কাব্যে যখন জন্মান্তর ঘটেছে, হেমন্ত তখনো তাঁর উপকরণ হয়েছিল, তার ব্যবহার যদিও তখন ভিন্ন।...হেমন্তর আসলে একই কালে জীবন-মৃত্যু, সভ্যতা-সঙ্কট, পূর্ণতা ও বিনষ্টির একাত্ম প্রতীক।" নরেশ গুহ

অবনীন্দ্রনাথ, চিত্রকর হিসেবে যিনি নিজেকে একবার কৌতুক করে উপাধি দিয়েছিলেন 'মুঘল-সিদ্ধ', যাঁর ছবিতে সাজাহানের পাথর-পুরী মণিমুক্তোর ছটায় অমন উজ্জ্বল, যিনি আরব্যোপন্যাসের রহস্য-রজনীগুলো আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়ে দেন বর্ণ-গন্ধ-দৃশ্য-স্থাপত্য-গঠন-এর অপরূপ সুষমায়, যাঁর ছবিতে অশোক, বিম্বিসার, বুদ্ধ-সুজাতা, কচ-দেবযানী, অভিসারিকা রাধা, অতীতকালের ধূসর যবনিকা ঠেলে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় রক্তমাংসের তাপ-উত্তাপ নিয়ে, সেই অবনীন্দ্রনাথের লেখায় হেমন্তের কুয়াশা, শীতের শিশির, যা কিনা ম্লান, ধূসর, ভিজে-ভিজে, বর্ণহীন, যা কিনা রক্তের বিপরীত বর্ণের প্রশ্রয়দাতা, কাঁথায় গায়ের নকশার মতো সর্বাঙ্গজুড়ে জড়িয়ে থাকে কেমন করে? তাহলে কী কথাশিল্পী আর চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ দুটো স্বতন্ত্র সত্তা?

না। এঁরা দুজনেই এক। দুয়ে মিলে এক।

যে অবনীন্দ্রনাথ চিত্রকর, তিনিও কুয়াশাকে চিনতেন। জানতেন। ধূসরতার সঙ্গেও পরিচয় ছিল তাঁর। তাঁর ছবি সম্বন্ধে অনেকের অভিযোগ, সেখানে সূর্যকরোজ্জ্বল দেশের আলো অনুপস্থিত। অর্থাৎ, তাঁর ছবি বর্ণাঢ্য নয়। যেন কুয়াশার এপার থেকে দেখা।

অবশ্য এ কথা আদৌ সত্য নয় যে, তাঁর সমস্ত ছবিই উজ্জ্বলতাহীন। বর্ণাঢ্য ছবিও এঁকেছেন অজস্র। যেমন আরব্যরজনীর চিত্রমালা। যেমন শেষ বয়সের চণ্ডীমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল। রঙের প্রখর দীপ্তি ঝিলিক দিয়ে উঠেছে তাঁর প্যাস্টেলের ছবিতে বহুবার। প্যারিস প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত নিজের পুত্র অলকেন্দ্রনাথের বালক বয়সের প্রতিকৃতি তো এর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সে ছবির গা ফেটেফুটে বেরোচ্ছে ভারতীয় রৌদ্রের আভা। কিংবা প্যাস্টেলের একাধিক পাখির ছবি। কিংবা পাখি হাতে নাতি বাঁরুর বৃহৎ ছবিখানি। নিজের কোনো কোনো, অপ্রকাশিত, প্রতিকৃতিতেও তাবাক-করা রঙের ব্যবহার মাতিয়ে দিয়েছে চোখ। রবিকাকার কিছু কিছু প্রতিকৃতি যেমন স্বপ্নের ধূসরতা দিয়ে আঁকা, তেমনি কিছু কিছু আবার সূর্যের সাত রঙে ডোবানো।

"তাঁর সবচেয়ে সার্থক ল্যাণ্ডস্কেপ হয়েছে পূর্ববঙ্গের দৃশ্যরাজিতে, যে ছবির সারিতে তিনি পূর্ববঙ্গের নদ, নদী, জল, গাছপালা, ঘাস, চর, নৌকো, গ্রাম উদ্ভিদের বর্ণনার এক অপূর্ব স্থানীয় ভাব এনেছিল, যে-ধরনের স্থানীয় ভাব এসেছে রবীন্দ্রনাথের পদ্মার বুকে লেখা শিলাইদহের চিঠিতে বা তারাশঙ্করের উপন্যাসে। অথচ ম্লান, ম্যাড়মেড়ে, ধূসর এবং ব্রাউন রঙের উপরে সামান্য উজ্জ্বল রঙের ছিটে এনে সমস্ত ছবি অপূর্ব ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত করার যে রীতি পরাকাষ্ঠা তিনি পূর্ববঙ্গের ল্যাণ্ডস্কেপে ফুটিয়েছেন তা নিতান্তই শুদ্ধ ইউরোপীয় রীতি। যেমন পূর্ববঙ্গের নদীর পাশে গাছের ছায়াঘেরা ম্লান গ্রামের পাণ্ডুর আকাশের ছবির মধ্যে তিনি নিশ্চিত হাতে এঁকে দিলেন টকটকে লাল একটি ঘুড়ি, ফলে সারা ছবি ভাস্বর উজ্জ্বল হয়ে উঠল।...ভারতবর্ষের আলোয় তেলরঙের কাজ হওয়া শক্ত, আলো এত উজ্জ্বল আর কড়া যে সূর্যের স্বাভাবিক আলো ঠেকিয়ে নিজস্ব ঔজ্জ্বল্যে ছবিকে দাঁড়াতে হলে রঙ খুব সাবধানে বাছা দরকার।... এই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে অবনীন্দ্রনাথ তেলরঙ থেকে এমন রঙ বাছলেন, যা ম্লান, গম্ভীর, ধূসর বা ছাই, ব্রাউন, মোটেই মুখর বা গমগমে নয়, তাতে

উজ্জ্বল রঙের সামান্য স্পর্শ দিয়ে উজিয়ে দিলেন। কিন্তু প্যাস্টেল পোর্ট্রেটে শরীরে চামড়ার বুহুনি বা টেক্‌সচার তিনি যেমন আনলেন তা ভারতবর্ষে বর্তমান যুগে আর কেউ আনতে পারেননি। এখানেও তিনি রঙের লেপের পর লেপ দিয়ে বর্ণের সঙ্গে বর্ণ মিশিয়ে, আস্তে আস্তে টোন আনলেন, তার সংশ্লেষণে আনলেন বর্ণালিবিভঙ্গ বা টোনালিটি। শেষে যেটি দাঁড়াত তাতে থাকত হীরে জহরতের দ্যুতি, যাকে ইংরেজীতে বলে 'জেমে'র মতো গুণ, মার্জিত স্পর্শ।"

অশোক মিত্র

এ সব সত্ত্বেও স্বীকার করতে হয়, তাঁর ছবিতে রঙের ব্যবহার কখনোই সমারোহ পূর্ণ নয়। রঙ যেন কুয়াশার মতো আলতোভাবে ছুঁয়ে থাকে তাঁর অনেক ছবি। রঙ শাড়ির মতো পাকে পাকে জড়িয়ে থাকে না, ওড়নার মতো ভেসে থাকে। রঙ এসে যেন উগ্র উত্তপ্ত আলিঙ্গনের বদলে আদর করে যায় তাঁর রেখাকে। এই ধূসরতা তাঁর স্বেচ্ছাকৃত। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলও বলা যায়। ছবিতে এই ধূসরতা অথবা নীচু টোন আনার জন্যে জাপানী প্রথায় ওয়াশ শিখে, জাপানী প্রথার ওয়াশকে ভুলে গিয়ে নিজেই আবিষ্কার করেছিলেন নিজস্ব ওয়াশ পদ্ধতি। জাপানীদের মতো ছবি আঁকার কাগজকে মাউন্ট করতেন না কাঠে বা বোর্ডে। কাঠের উপরে আলগাভাবে এঁটে নিতেন বা ফেলে রাখতেন। জাপানীদের ব্রাশ টেনে ওয়াশ করার বদলে তিনি সরাসরি জলের পাত্রে ডুবিয়ে নিতেন ছবিটা। আবার রঙ চাপানো। আবার জলে ডোবানো। তাঁর রঙের ব্যবহার আর এই ওয়াশ পদ্ধতির অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে রাণী চন্দের 'শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ'-এ।

১। "ওয়াশের ছবি, এর টেকনিক অবনীন্দ্রনাথেরই আবিষ্কার। নিয়েছিলেন অবশ্য জাপানীদের ছবি আঁকার পদ্ধতি থেকেই। ওকাকুরার ছাত্ররা—টাইক্কান, হিশিদা এলেন এ দেশের আর্ট স্টাডি করতে। তাঁরা যখন ছবি আঁকতেন, তুলিতে জল নিয়ে কাগজ বা সিল্ক অল্প অল্প ভিজিয়ে নিতেন। অবনীন্দ্রনাথ দেখলেন। একদিন নিজের আঁকা পুরো ছবিটাই জলে ডুবিয়ে দিলেন। সবাই ভাবলেন, গেল ছবিটা নষ্ট হয়ে।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, ছবিটা জল থেকে তুলে দেখি ছবি নষ্ট তো হয়নি, বরং রঙের 'হার্ডনেস'টা চলে গেছে। বেশ একটা সফ্‌ট এফেক্ট এসেছে। সেই শুরু হল ওয়াশের ছবি। ছবি এঁকে জলে ডুবিয়ে আবার আঁকতেন।

আবার ডোবাতেন। ছবির রঙ পাকা হয়ে যেত। ছবি জলে ভিজলেও রঙ উঠে যাবার ভয় থাকত না। আর ছবিও যেন আলো হাওয়া নিয়ে প্রাণের রসে ভরে উঠত।"

২। "বেশি করে রঙ গোলা তিনি পছন্দ করেন না। প্যালেটের উপরে রঙের কেক একটু ছোঁয়ানো হয় কি হয় না, তিনি বলে ওঠেন, ব্যস ব্যস, আর না। রঙ কি নষ্ট করে কখনো? এই রঙেই দেখো কত বড় আকাশ হয়ে যাবে। রঙ বেশী দিলেই কি রঙ ফোটে ছবিতে? তুলির ডগায় একটু-খানি রঙ নিয়ে কাগজে ছোঁয়াবে, সূর্যাস্তের রঙ পশ্চিম আকাশ ছেয়ে ফেলবে। এক ফোঁটা রঙে দেখা-না-দেখার দুই জগৎ কথা কয়ে উঠবে।"

আরও একটা দৃষ্টান্ত নাতি মোহনলালের 'দক্ষিণের বারান্দা' থেকে।

"আরব্য উপন্যাসের ছবি যখন তেজে আঁকা চলেছে, তখন এক-একটা ছবি আঁকতে দাদামশায় পাঁচ-ছ' দিন লাগত। কিন্তু প্রথম ছবিটা যেখানে উজির কন্যা শাহজাদী বাদশাকে গল্প বলছেন, সেখানে একবার আঁকতে শুরু করে আর শেষ হতে চায় না। কুড়ি দিনের উপর লেগেছিল সেটাকে শেষ করতে। এমন ঘষা ঘষেছিলেন যে, ভিজলে ব্লটিং পেপারের মতো দেখাত। ছবিটা একবার করে জলে ডুবত আর প্রশান্তবাবু দেখে ভয়ে কেঁপে উঠতেন —এই ছিঁড়ে যায় বুঝি! কিন্তু শুকোলেই আবার বেশ খড়খড়ে হয়ে উঠত।"

এতক্ষণ চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথের ছবি-আঁকার যে পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করলাম সেই অবনীন্দ্রনাথ যখন কথাশিল্পী, তখনও দেখতে পাই তাঁর অক্ষরে-আঁকা ছবিকেও তিনি জলে ডোবানোর মতো ডুবিয়ে নেন হেমন্তের কুয়াশায়, শীতের শিশিরে, গোধূলি-সন্ধ্যার আবছায়ায়। তাঁরও প্রায় অধিকাংশ রচনার সময়-কাল শীত। এক এক করে সেগুলোর দিকে তাকানো যাক। আলোর ফুলকি-তে শিশির ঝরল শিউলির মতো, দুজনে মিলেমিশে।

"চিনি-দিদি ভীমরুলের সঙ্গে খানিক ছুটে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে একটু কপি পাতা খাচ্ছেন এমন সময় হাওয়াতে টুপটাপ করে পাতার শিশিরের সঙ্গে একটি শিউলি ফুল ঝরে পড়ল। চিনি-দিদি অমনি বলে উঠলেন, অ শিউলি, অ শিশির, এতক্ষণে বুঝি আসতে হয়?"

ঐ আলোর ফুলকি-তেই কুঁকড়োর নিজের মুখের বচন—

"যখন সোনালির কালো চোখ দুটি ঘুমে ঢলে পড়ে, যখন তার সোনার দেহটি আলিসে লুটিয়ে চমৎকার দেখতে হয়,...সেই সময় আমি পা টিপে-টিপে শিশিরের উপর দিয়ে দূরে গিয়ে, আলোর জন্যে যে-কটি গাছ সব ক'টি চেয়ে যেমনি দেখি অন্ধকার ফিকে হচ্ছে, অমনি আস্তে আস্তে বাসায় ফিরি! কি বলছ? শিশিরে পা ভিজে দেখে সে সন্দেহ করবে? তাই যদি হবে ডানার পালকগুলো আছে কী করতে? পা দুটো মুছে নিতে কতক্ষণ?..."

এর পরে স্বপন পাখির গান শুনে বনের সমস্ত পশু-পাখি যখন বেরিয়ে এসেছে চাঁদের আলোয়, কুঁকড়ো সেই অনির্বচনীয় গানে যেন মোমের আলোর মতো গলে যেতে-যেতে বললে, 'এ যে জগৎ-জোড়া গান, এর তো জুড়ি নেই। স্বপন পাখি কার কানে তুমি কী কথা বলে যাচ্ছ কে তা জানে।" তখন কাঠ-বেড়ালি বলে উঠেছিল, গান বলছে, ছুটি হল, খেলা করো। আর খরগোশ বলেছিল—

"আমি শুনছি, শিশিরে ভেজা সবুজ মাঠে চলো।"

এর পর আমাদের কানে বাজে সোনালির সেই কান্না, সেই করুণা-সুরের মিনতি সোনার পাখা ধুলোয় লুটিয়ে—

"হিমে সব ভিজিয়ে দাও, বারুদ না জ্বলুক, ভিজে ঘাসে শিকারীর পা পিছলে যাক অন্যদিকে।"

'খাতাঞ্চির খাতা'য় গ্রীনরুম নামের গল্পটা যখন আরম্ভ হচ্ছে—

"তখন শীতকাল। পুতু সোনাকে নিয়ে শীতকালের সাদা আসরের একধারে শুইয়ে দিয়ে বাঁশি বাজিয়ে দিলেন, আর একধার থেকে শীতের কনসার্ট বেজে উঠল, 'হিম সিম হিম সিম'।...অমনি শীতের ঝিঁঝিঁপোকা চারদিকে বাজনা বাজিয়ে দিলে, 'হিম সিম হিম সিম, শিল শিলাতি শিলাকা শিলা, সিম সিমাতি ঝিমাতা ঝিমা'..."

এরই একটু আগে রয়েছে পুতুর আসরের বর্ণনা।

"ভিজে মাটির ঠাণ্ডা রঙের সপ দিয়ে মোড়া, আসর সপ সপ করছে গোলাপ জলের পিচকিরিতে। তারপরের আসর সব নীলের উপরে তারা পদ্মফুল দিয়ে আগাগোড়া মোড়া। এর পর সবুজ আর ধানি রঙের সাজে মোড়া আসর, তারপর কুয়াশা আর বরফের মতো সাদা সাজানো আসর।..."

'বুড়ো আংলা'র যখন আরম্ভ, তখন শীত গিয়ে গরম পড়তে শুরু হয়েছে।

কুয়াশা আর মেঘ কেটে গিয়ে খুলে গেছে নীল আকাশের কবাট। কিন্তু আমতলির রিদয় যখন ভুঁড়ো-গণেশের অভিশাপে এক ফোঁটা বুড়ো আংলা হয়ে খোঁড়া হাঁসের পিঠে চেপে বেরিয়ে পড়েছে দূরপাল্লার আকাশ ভ্রমণে, তখন থেকেই শীত, শিশির, কুয়াশার হিম-ছোঁয়ায় বারেবারে শিহরিত হই আমরা।

১। "বাতাসের এক-একটা পথ এমন ঠাণ্ডা যে সেখানে খুব শক্ত পাখিরা ছাড়া আর কেউ যেতে পারে না—শীতে জমে যাবে।"

২। জলে-ধোঁয়ায়-ঝাপসা এই সব মেঘের রাস্তা কাটিয়ে পাখিদের চলতে হল; না হলে ডানা ভিজে ভারি হয়ে, কুয়াশায়, ধোঁয়ায় দিক ভুল হয়ে, একদিকে যেতে আর-একদিকে গিয়ে পড়বে।"

৩। "রিদয়কে নিয়ে চলতি হাঁসেরা পাহাড় থেকে একদল ফিরতি হাঁসকে শুধিয়ে জানলে—ওধারে এখনো কুয়াশা কাটেনি; শিল পড়ছে; জলে হিম, গাছে এখনো ফল ধরেনি।"

৪। "এবড়ো-খেবড়ো ভাঙাচোরা পিছল চর; খানা, ডোবা, নালা, এখানে-ওখানে, এরই উপরে সন্ধ্যের হিম হাওয়া বইছে। রিদয়ের গা কাঁটা দিয়ে উঠল শীতে।"

৫। "সূর্য লুকিয়ে গেছেন; জল থেকে উঠছে কুয়াশা; আকাশ থেকে নামছে অন্ধকার, চারদিকে ঘনিয়ে আসছে ভয়।"

৬। "ঝাউ গাছের সরু ডালে পা ঝুলিয়ে শীতের রাতে জেগে বসে থাকা যে কী কষ্ট আজ রিদয় বুজলে। শীতে তার হাত-পা অসাড় হয়ে গেছে, চোখ ঢুলে পড়েছে, কিন্তু ঘুমোবার জো নেই—পড়ে যাবার ভয়ে। আর বনের মধ্যে অন্ধকারই বা কত! দু হাত তফাতে নজর চলে না—মিশকালো ঘুটঘুটে চারদিক! মনে হল, যেন গাছপালা সব শীতে কালো পাথরের মতো পাষাণ হয়ে গেছে! একটি পাখি ডাকছে না, একটি পাতা নড়ছে না—সব নিথর নিঝুম! রিদয়ের মনে হচ্ছে রাত যেন ফুরোতে চায় না!"

৭। "ক্রমে মেঘে মেঘে আলো পড়ল—রঙ ধরল, গাছের পাতা, ঘাসের শিস, ফোটা-ফুলের পাপড়ি, তার উপরে শিশিরের ফোঁটা—সব আলোতে ঝলক দিয়ে উঠল।"

৮। "এইবার রিদয়ের শীত আরম্ভ হল। খোঁড়া হাঁস, ডানা ছড়িয়ে উড়ে চলছে, পালকের মধ্যে ঢোকবার যো নেই, জলে-শীতে থরথর করে বেচারা

কাঁপতে লাগল, খোঁড়াও বাংলা দেশের মানুষ, পাহাড়ের শীতে তারও ডানার পালকগুলো কাঁটা দিয়ে উঠল—সে ডাক দিলে—'শীত-শীত-হংপাল, শীতে গেল !"

৯। "তার ঝকঝকে পালকে শিশিরের মতো জলের ফোঁটাগুলি আলো পেয়ে হীরের মতো ঝকঝক করছে, রিদয়ের মনে হল যেন জলদেবী জল থেকে উঠে এলেন।"

বিশ্বভারতী পত্রিকার সাম্প্রতিক অবনীন্দ্রনাথ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর চল্লিশটি অপ্রকাশিত ছোট রচনা। আশ্চর্য ঘটনা এই যে, সেই চল্লিশটি রচনার প্রায় প্রত্যেকটিতেই রয়েছে শীত আর কুয়াশার কথা।

১। "আগে পিছে দুর্গম দুর্জয় পর্বত, তার মাঝ দিয়ে চা-বাগানের শুঁড়ি পথটি গভীর খাদের বুকে যেখানে রাতের কুয়াশা জমাট বেঁধে রয়েছে, তারি তলায় ডুব দিয়েছে। সেই কুয়াশার আড়াল থেকে একটি সানাই সুরে বলে যাচ্ছে শুনছি—সুদূর পাহাড়তলির অজানা গাঁয়ের না-দেখা বর কনের বিয়ের কথা।"

২। "শুধু জানলেম পৌষ মাসে কুয়াশার মধ্যে একদিন সে জন্মেছিল, আজ শীতের সন্ধ্যায় ঘন কুয়াশায় ঢাকা পাহাড়ের কোন্ একটা কোনে খেলতে বার হয়ে গেছে—"

৩। "পর্বত চোখের আড়াল হতেই সূর্যাস্ত শীতের কুয়াশাকে আপনার মনের কথা জানিয়ে গেল। ঝরে পড়া গোলাপ ফুলের পাপড়ির মতো সেই কথা জলে ভেজা সাদা আঁচলে জড়িয়ে নিয়ে চলে গেল কুয়াশা রাত্রিমুখে ছায়া-পথের দিকে অভিসারে।

৪। "কাজল রাতের বুকে সোনার তরী—প্রতিপদের চাঁদ সে স্বপ্নের পসরা বহে আসতে আসতে পর্বতের একখানা পাথরের ঠেকে অতল আলোক সাগরে তলিয়ে গেল, ঝর্নাতলার ঝাউবন নিশ্বাস ফেলে এই কথা জানিয়ে দিলে শীতের কুয়াশায় কাতর চন্দ্রমল্লিকার মতো শুকতারাটিকে।"

৫। "সকালে ফোটা সূর্যমুখী ফুলটিকে নীল আকাশ আলোর খবর এনে দিতে না দিতে প্রথম পৌষের দুরন্ত কুয়াশা দিক-বিদিক ঘিরে নিলে। হিমজর্জর সন্ধ্যার আকাশ চেয়ে দেখলে অস্তমান সূর্যের আগুন-বরণ জয় পতাকা সকালের কুয়াশা ফুলের বনের পায়ের কাছে আস্তে আস্তে নামিয়ে ধরলে।"

জীবনানন্দের কবিতার এক জায়গায় আমরা পড়ি—"অন্ধকার, কুয়াশা ছুরি।"

অবনীন্দ্রনাথের 'নালক'এর একটি স্তবকের আরম্ভে সেই ছুরির ফলা।

"আজ সে বরফের হাওয়া ছুরির মতো বুকে লাগছিল। শীতের কুয়াশায় চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেছে—পৃথিবীর উপরে আর সূর্যের আলোও পড়ছে না, তারার আলোও আসছে না—দিনরাত্রি সমান বোধ হচ্ছে। ঝাপসা আলোতে সব রঙ বোধ হচ্ছে যেন কালো আর সাদা, সব জিনিস বোধ হচ্ছে যেন কতদূর থেকে দেখছি—অস্পষ্ট ধোঁয়া দিয়ে ঢাকা, শিশির দিয়ে মোছা!"

জীবনানন্দে শিশির, কুয়াশার যেন মহোৎসব। তাঁর কবিতার প্রকৃতিমণ্ডলে প্রধান চরিত্রদের প্রথম সারিতে তারাই। 'রূপসী বাংলা'য় এমন কবিতার সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প, যার গায়ে জড়ানো সেই কুয়াশার চাদর। কুয়াশা, তাঁর কবিতায়, কখনো হয়ে উঠেছে ধোঁয়াটে কিন্তু ধারালো।

"ধান-ক্ষেতে মাঠে
জমিছে ধোঁয়াটে
ধারালো কুয়াশা।"

কখনো যে কুমারীর আঙুলের মতো নিথর অলস অথচ ভাস্করের ছেনীর মতো ছেদনকারী।

"মোর দেহ ছেনে গেছে অলস আঙুল
কুমারী আঙুল
কুয়াশার।"

তাঁর কবিতায় কুয়াশা কখনো ঘর। কখনো পঞ্জর। কখনো আবার ঘোড়া।

"তোমারে তুলিয়া লবে কুয়াশার ঘোড়া।"

কখনো কুয়াশা হয়েছে ঢেউ। কখনো আবার 'করুণ নদী'।

অবনীন্দ্রনাথের কুয়াশা ভিন্ন জাতের। আরও দৃশ্যরূপময়। জীবনানন্দের মতো বিমূর্ত নয়। মূর্তিমন্ত।

"আজকের সকালটা একেবারে কুয়াশায় ঢাকা। এমন কুয়াশা এ শীতে একদিনেও হয়নি। জল স্থল আকাশ দুধে-গোলা আলোর মধ্যে ডুবে রয়েছে, যেদিকে দেখি মনে হচ্ছে, যেন নাকের সামনে প্রকাণ্ড একখানা ঘষা কাঁচ ঝুলছে। জাহাজের সব বেঞ্চিগুলো শিশিরে ভিজে উঠেছে···।"

এর পরেই কুয়াশার ঘষা কাঁচকে বদলে যেতে দেখি ছেঁড়া কাঁথায়।

"ভোরের হাওয়ায় হিম মাখানো; নদীর মাঝে ময়লা কুয়াশা গত শীতের ছেঁড়া কাঁথার একটা কোণের মতো এখনো ঝুলে রয়েছে।"

আবার এই ছেঁড়া কাঁথাই হয়ে যাচ্ছে কোথাও সাদা চাদর।

"পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখলেন, রাত আড়াই-পহরে জলে-স্থলে পাংশু কুয়াশার জাল পড়ে আসছে—কে যেন শাদা একখানা চাদর পৃথিবীর মুখ ঢেকে আস্তে আস্তে টেনে দিচ্ছে।"

কুয়াশার কথায় জীবনানন্দের মতোই অবনীন্দ্রনাথও ক্লান্তিহীন।

১। "শাদা বরফে, হিম কুয়াশায়, নিঝুম শীতে, সব চুপ হয়ে গেছে, স্থির হয়ে গেছে, পাষাণ হয়ে গেছে—পৃথিবী যেন মূর্ছা গেছে।"

২। "সিদ্ধার্থ দিনের পর দিন উত্তরের হিম কুয়াশায় শাদা বরফের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন—কুয়াশার জাল সরিয়ে দিয়ে আলো কি আর আসবে না?"

৩। "মরণ দেখা যাচ্ছে—বরফের মতো হিম শাদা চাদরে ঢাকা।"

৪। "আজ শীতের ক'মাস ধরে পুন্না ছায়ার মতো যেন পাতলা কুয়াশার ভিতর দিয়ে দেবতাকে দেখেছে।"

৫। "আধখানা নদীর উপর থেকে কুয়াশা সরে গিয়ে গিয়ে জলের গায়ে সকালের আকাশ থেকে বেলফুলের মতো সাদা আলো এসে পড়েছে।"

৬। "কোনো কোনো দিন ঘন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে পারাপার করবার সময় দেখেছি, কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না, হঠাৎ একখানা নৌকো তার দাঁড়িমাঝি মালপত্র রশারশি নিয়ে চকিতের মতো কুয়াশার গায়ে ফুটে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল; এ লোকটা ঠিক তেমনি করে আমাদের দেখা দিলে! আমার মনের মধ্যে কেমন যেন শীত করতে লাগল।"

এই সব শীত, জীবনানন্দের ভাষায়, 'শুধু সেন্টিগ্রেডের নয়'। 'আনরিয়েল সিটি'র ছবি আঁকতে গিয়ে এলিয়েট কুয়াশার গায়ে রঙ চাপিয়েছিলেন, ব্রাউন। আবার কখনো তাকে বানিয়েছিলেন হলুদ, যখন সে কুয়াশা পিঠ ঘসে যায় উইণ্ডোপেনে। অবনীন্দ্রনাথ এবং জীবনানন্দের রচনায় কখনো কখনো এই শতাব্দীর যাবতীয় আলোহীনতার, যাবতীয় মরণশীলতার প্রতীক হয়ে উঠতে চেয়েছে এই শীত, এই কুয়াশা, এই শিশির। কিন্তু সমস্ত অতিক্রম করে এই কুয়াশার ভিতর থেকেই আমাদের স্পর্শ করে যায় এক আশ্চর্য তাপ, মাতৃক্রোড়ের

মতো এক উষ্ণতা, গেয়ে শোনায় অন্ধকার যোনি ভেদ করে—সূর্যালোকের আগমনী গান। আমরা বুঝতে পারি জীবনের খেলায় তাঁরা শুধু সাময়িক প্রতিপক্ষ সাজানোর জন্যেই ব্যবহার করেছেন এদের। আসলে এরাও খেলার সাথী। এরাও বাল্যকাল থেকে, রোদ-জ্যোৎস্নার মতো অন্তরঙ্গ সহচর। জীবনস্মৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই কুয়াশার হাতছানিতে পৃথিবীর প্রান্তর থেকে আলোর ডানাগুলো দূর অন্ধকারে উড়ে গেলে যে কবিকে আমরা ম্রিয়মান হতে দেখি, সেই কবিই কলকাতার ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ভেঙে পড়েন শোকে, আর কোনোদিন কুয়াশার সঙ্গে গাঢ় মেলামেশার কথা মনে পড়বে না বলে।

"শিশিরের স্বর নক্ষত্রকে লঘু জোনাকীর মতো
খশিয়ে আনবে না
সৃষ্টিকে গহন কুয়াশা বলে বুঝতে পেরে চোখ
নিবিড় হয়ে উঠবে না তোমার।"

আর অবনীন্দ্রনাথ যখন মায়ের কোলের কচি ছেলে হয়ে মানুষ হচ্ছেন দাসীর কোলে, তখনই মশারির ভিতর থেকে বাইরের পৃথিবীটাকে সবুজ কুয়াশা-ঢাকা আকাশ মনে হয়েছিল তাঁর, সেই তিনিও কবিতায় হাতপাকানোর ভোরবেলায় শব্দ দিয়ে আঁকলেন কুয়াশার আলপনা।

"উত্তর-পাহাড়ের নিঃশ্বাস-যন্ত্র আগলে রাখে
কুয়াশার যাদু দিয়ে
পাখীকে চিনতে দেয় না, দেখতে দেয় না।"

আর সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়ে দিয়ে গেলেন এই পাখিকে ঝরনাতলায় নতুন ঝাউবনে যুগান্তরের শীতের সকাল ফিরে পাবে আবার, অকাল বসন্তের ভোর রাতে।

পৃথিবীর রণ রক্ত

রবীন্দ্রনাথকে উপনিষদের কবি আখ্যা দিয়ে একদা এক শ্রেণীর বিজ্ঞজন মূলত পরিহাস করেছিলেন তাঁর প্রতিভাকে। ও-রকম কোনো একটা সংকীর্ণ এবং নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে তাঁর সৃষ্টির অজস্রতাকে যে কোনোদিনই আঁটা যাবে না, এটা বুঝতে অনেকখানি সময় লেগেছে আমাদের। অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে চলতি উপাধিটাও আসলে ঐরকমই আরেক পরিহাসের প্রতিধ্বনি। অবনীন্দ্রনাথ শিশুসাহিত্যিক। সৌভাগ্যের কথা, যেমন অ্যাণ্ডারসন কিংবা লুই ক্যারেল কিংবা লিয়রের বেলায় ঘটেছে, তেমনি অবনীন্দ্রনাথের বেলাতেও ধরা পড়ে গেছে মুখোশটা। অথবা ছদ্মবেশ। আসলে ধরা পড়ে গেছে তাঁর সত্যিকারের মুখটা। সে-মুখের একদিকে যেমন জগতের যত শিশুর জন্যে ভালবাসা, আরেক-দিকে তেমনি জগতের যত মানুষের জন্যে মমতা। তাঁর শিশু-পাঠ্য রচনায় আপাতদৃষ্টিতে যা আজগুবি, তার ভিতরে কিন্তু ভরা রয়েছে চলতিকালের সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতির অভিজ্ঞতা, সমস্ত রক্ত রণের ইতিহাস এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্নের

পাখনা এবং পালক। মূলত তিনি কাদের জন্যে তুলির সঙ্গেই হাতে তুলে নিয়েছিলেন কলম, সে তত্ত্বের সন্ধান দিতে গিয়ে কেউ কেউ আমাদের জানিয়েছেন এক গভীরতর সত্য।

"তাঁর বিষয়ে একথাও ঠিক বলতে চাইনা যে তিনি ছোটদের বই লিখতে গিয়ে সকলের বই লিখে ফেলেছেন, বলতে চাই তিনি প্রথম থেকেই সকলের বই লিখেছেন, শিশুর বইয়ের ছল করে মানুষের বই লিখেছেন তিনি।...আর এই জাদুকর গদ্যে যা-কিছু লিখেছেন, তাতে বুদ্ধিঘটিত বস্তু কিছু নেই, তার আবেদন ভাবনার কাছে নয়, কল্পনার কাছে, আমাদের কৌতূহলে নয়, ইন্দ্রিয়—চেতনায়। এই লেখার রসগ্রহণের জন্যে 'শিক্ষিত' হতে হয় না, 'অভিজ্ঞ' হতে হয় না; মনের চোখ, মনের কান আর চলনসই গোছের হৃদয়টুকু থাকলেই যথেষ্ট। অর্থাৎ নানা বয়সের, নানা স্তরের মানুষের মধ্যে যে-অংশ সামান্য, সেই অংশই অবনীন্দ্রনাথের ছেঁড়া কাঁথার রাজপুত্তুর। তাই তাঁর শিশু গ্রন্থ সর্বজনীন।" বুদ্ধদেব বসু

এইটুকু শোনার পর প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, 'শিক্ষিত' এবং 'অভিজ্ঞ' না হয়েও যাঁর রচনার দুধ-সায়রে সাঁতার দিতে পারে যে-কেউ, সেই রচনাই আবার উল্টোভাবে জীবন অথবা সময় অথবা ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের 'শিক্ষিত' এবং 'অভিজ্ঞ' করে তোলে কোন্ মন্ত্রগুণে? কী সেই রহস্য যার ছোঁয়া পেয়ে তাঁর মন-মাতানো ভাষা একবার সুরের গুঞ্জরনে ভাসিয়ে দিয়ে আরেকবার মন কাঁদিয়ে দেয় ভিন্নতর উপলব্ধির ভারী বাতাসে? সেই সহজিয়া শিল্পী কি কারণে একটা সামান্য ধোড়াকাকের বুকের পাটকিলে ডোরার দাগ দেখাতে গিয়ে আমাদের জানিয়ে দেন—

"যেন কতকালের মহাযুদ্ধের রক্তের দাগ রাজটিকের মতো এর বুকে দাগা রয়েছে।"

হঠাৎ এই মহাযুদ্ধের অবতারণা কি শুধুই একটা উপমাকে রক্তাক্ত করার প্রয়োজনে? নাকি তাঁর বুকের ভিতরেও দগদগে ঘায়ের মতো লুকিয়ে ছিল সেই দাগ, যা পৃথিবীর রক্ত রণের দান?

এর উত্তর, তিনি শুধু পাঠকের বেলাতেই বেছে নেননি 'সর্বজনীন' মানুষ। লিখবার জন্যে বেছে নিয়েছেন 'সর্বজনীন' বিষয়। মানুষের সমস্ত কিছুকেই তিনি টেনে নিয়েছেন কাছে, মূল্য দিতে, মূল্যবান করতে। নিছক শিশু মনোরঞ্জনের সীমাবদ্ধ দায় টুকুই যদি ঘাড়ে নিতেন তিনি, তাহলে অনেক গভীর

কথাই না-শোনা রয়ে যেতো আমাদের। নিছক শিশু সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমাদের চক্ষু-কর্ণের তৃপ্তি জুটতো ঠিকই, কিন্তু বোধ-বুদ্ধিরা ফিরে যেতো অচরিতার্থতার দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেটা ঘটেনি বলেই তাঁর পাঠক অথবা রসগ্রাহীর সংখ্যা ছড়িয়ে পড়েছে সকল বয়সের স্তরে স্তরে, শৈশব-বার্ধক্যের গণ্ডীটানা সীমারেখাকে বাতিল করে দিয়ে।

সমগ্র অবনীন্দ্রনাথ নয়, তাঁর মাত্র দুটি রচনা, মারুতির পুঁথি এবং চাঁইবুড়োর পুঁথির প্রসঙ্গে মনস্বী সমালোচক অমলেন্দু বসু একবার প্রশ্ন তুলেছিলেন, এদুটো বই কি কেবল শিশুদের জন্যে ? এর পরেই তাঁর উত্তর।

"আমি অন্তত একজন বাঙালী পাঠকের কথা জানি, যার শৈশব আজ প্রায় অর্ধশতাব্দীর দূরত্বে ধূসর তবুও যার প্রৌঢ় চিত্ত এই বই দুখানার আহ্বানে অসংকোচে সাড়া দেয়। এমন প্রৌঢ় বাঙালী পাঠক সমাজে অবশ্যই বিরল নয়। বয়সের কোনো সীমানা নেই অবন ঠাকুরের কথকতায় আনন্দ পাবার জন্য। ছয় থেকে ষাট, আট থেকে আশী, সব সময়েই এ-কথকতায় আনন্দ পাওয়া যেতে পারে, শুধু যদি পাঠকের চিত্তে নমনীয় সংবেদন থেকে থাকে। তা ছাড়া 'মারুতির পুঁথি'ও চাঁইবুড়োর পুঁথিতে যে-অর্থঘনতা, যে-সূক্ষ্ম অর্থ-বৈচিত্র্য, যে স্পষ্ট বিদ্যমান তাদের মাহাত্ম্যে এ-বইগুলি শিশুসাহিত্যের সীমানা পেরিয়ে পৌঁচেছে সার্বজনিক সাহিত্যের স্তরে, প্রাকৃত উপকথা থেকে শালীন সাহিত্যের স্তরে।"

অবনীন্দ্রনাথে শিশু এবং বয়স্কের প্রশ্নটি সম্প্রতি আরও ভারী হয়েছে আরও এক সংবেদনশীল সমালোচকের নিরীক্ষায়। কবি শঙ্খ ঘোষ স্পষ্ট উচ্চারণে আমাদের জানিয়ে দিতে চেয়েছেন যে সত্যটি, তা হল, অবনীন্দ্রনাথের উত্তরপর্বের রচনায় কিশোর সাহিত্যের ভাগ অল্প, বয়স্ক মননের খোরাকটাই বেশী।

"কুটুম-কাটাম, যাত্রাপালা, পুঁথিপত্রের সমকালীন সেই গদ্যরচনাগুলিতে ভাবনা যেভাবে শব্দে শব্দে ঝাঁপ দিয়ে চলে ; শব্দের কৌতুককে যেভাবে লক্ষ্য করতে আহ্বান করেন লেখক, কিংবা যে ব্যক্তিগত নস্টালজিয়ায় ভেসে পড়তে চান কখনো কখনো, তার স্বাদ ঠিক কিশোরসেব্য নয়। কোনো কিশোর কখনোই পছন্দ করবে না এই লেখাগুলি, এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। বলা বাহুল্য যে অনেক কিশোরই অনেক সময়ে ছুঁতে পারে বয়স্কযোগ্য রচনা। বলতে চাই কেবল এইটুকু যে এই রচনাবলির প্রকৃতিকে বিশেষরূপে কিশোর

চিহ্নিত বলার মানে নেই কোনো।"

এই প্রসঙ্গে আরও একটা প্রশ্ন উঠতে পারে সঙ্গতভাবেই। তাঁর বয়স্ক-রচনার স্বাদ পেতে হলে আমাদের কি সব সময়েই নেমে আসতে হবে আসল বয়সকে পিছনে ফেলে সিঁড়ির নীচের ধাপগুলোয়? অর্থাৎ তিনি কখনো আমাদের পরিণত মনের কাছে এসে গল্প শোনাবেন না, আমরাই বারে বারে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর ঝুলি ঘেঁটে-ঘুঁটে খুঁজে নেবো আমাদের খিদে মেটানোর স্বাদু উপকরণ? এরও একটা ব্যতিক্রম রয়ে গেছে। সম্ভবত একবারই ঘটেছিল সেই দুর্লভ অঘটন। সরাসরি বড়দের জন্যে কলম ধরেছিলেন তিনি। ১৩২৭। তখন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় আর সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের যুগ্ম সম্পাদনায় বেরোচ্ছে 'ভারতী'। বৈশাখ থেকে শুরু হল এক বারোয়ারী উপন্যাস। বারো মাসে, বারো দফায় শেষ। সেই বারো মাসের লেখক সূচীর দিকে তাকাতে গিয়ে আমরা আকস্মিকভাবে দেখতে পেয়ে যাই অবনীন্দ্রনাথকেও। উপন্যাসের সপ্তম কিস্তীর লেখক হিসেবে তিনি সেখানে নিঃসঙ্কোচ উপস্থিত। অন্যেরা হলেন যথাক্রমে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং প্রমথ চৌধুরী।

"অবনীন্দ্রনাথের গাল্পিক প্রতিভার আর এক নতুন প্রকাশ এখানে। পল্লীগ্রামে নিরপরাধা নারীর জীবন নিয়ে স্বভাব-দুশ্চরিত্র পুরুষ সমাজের নির্মম পাশা খেলা,—তাই নিয়ে গড়েছিল বারোয়ারী উপন্যাসের উপাখ্যান।··· 'কোটরা'-র মতো সমাজের নিম্নতম পর্যায়ের কথা নয়, গ্রামীণ অভিজাত প্রতাপশালী সমাজের গল্প। তাতেও অবনীন্দ্রনাথ মর্মস্পর্শী দৃষ্টি-ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। সমাজকে নিয়ে—সমাজের অসঙ্গতি নিয়ে তাঁর বক্রোক্তির তীক্ষ্ণতাও মাঝে মাঝে বিস্ময়কর বাস্তবিকতাবোধের পরিচয় দিয়েছে।" ভূদেব চৌধুরী

উপরের উদ্ধৃতি থেকে আমাদের কানে পৌঁছল এক ভিন্ন রচনার নাম, 'কোট্‌রা'। 'কোটরা', একটা ছোট গল্প। এটিও ভারতীতে লেখা। উপন্যাসের কিস্তী লেখার কিছু আগে।

"'কোটরা' ছোটগল্পের সাধারণ পরিসর পেরিয়ে গেছে কেবল আদিম জীবনের রূপ-রস-সংগ্রহ করতে করতেই, তবু শেষ পর্যন্ত গিয়ে হল 'ইচ্ছাপূরণের'

এক নিটোল রূপকথা, রূপকথার মতো স্বপ্ন-ভরোভরো, রূপকথার মতোই বাস্তবের প্রতি পাশ-ফিরে-বসা অবাস্তব পরিণামের গল্প! অবনীন্দ্রনাথের হাতে আর কিছু হওয়াই অসম্ভব ছিল, তাঁর স্বভাবের ভেতরকার শিশুধর্ম—মায়ের মতো সন্তর্পণ তাঁর রমণীয় চিত্তপ্রবণতা, সে কেবল মিষ্টি রসের জীবনকে ছবি আর সুরে বাঁধতে ব্যস্ত ; অথচ বাস্তবিক জীবনকে উপেক্ষা করে যেতেও গররাজি।"

ভূদেব চৌধুরী

এ থেকে প্রমাণিত হয় দুটো সত্য। 'কোটরা' নামের গল্পের চরিত্ররা ছিল মুটে-মজুর, গরীব ফেরিওয়ালা, দোকানী-পশারী, বদমাস-গুণ্ডা। পরিবেশে ছিল মুদির দোকান, কাফিখানা, মদের আড্ডা, চালের আড়ৎ, ফল-ফুলুরীর বাজার। ছিল গরীব ভাড়াটের উপর মারোয়াড়ি বাড়িওয়ালার জোর-জুলুম। অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে, জীবনের কোনো কোনো পর্বে, ইচ্ছের ডালপালা ছড়িয়েছিল—শিশুর জন্যে যেমন রঙীন করে আঁকেন তেমন নয়, বড়োদের জন্যে এক রঙা কালো কালিতেও আঁকবেন এমন কিছু ছবি, যাতে ফুটে থাকবে সমকালের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলেন না। জয়ী হলেন কথার জাদুকর অবনীন্দ্রনাথ, বৃহত্তর জীবনের ভাষ্যকার অবনীন্দ্রনাথকে হারিয়ে দিয়ে। বৃহত্তর জীবনের অভিজ্ঞতাকে তিনি কি তাহলে ভুলে গেলেন? নাকি হারিয়ে ফেললেন অথবা উপড়ে ফেলে দিলেন বিস্মৃতির চোরা-কুটরির বদ্ধ অন্তরালে? না, তারা সঙ্গী হয়ে গেল রয়ে গেল চিরজীবনই। কিন্তু লোকচক্ষুর সামনে আসার সময় আপাদমস্তক নিজেদের মুড়ে দিল ছবির নক্‌শায়। অর্থাৎ তাঁর সর্বজনীনতা পরে নিল শিশুসাহিত্যের সোনালী পোশাক।

এবার প্রশ্ন তোলা যাক, তাঁর কাছ থেকে সর্বজনীনতার যোগ্য কি কি কথা শুনেছি আমরা? শুনেছি—

"বাঁচার কথা, মরার কথা, গরিবের ঘর আলো করে ছেলে-হওয়ার কথা, ঘর ছেড়ে চলে-যাওয়ার কথা, পাওয়ার কথা, হারানোর কথা। সুখের আশার কথা, দুঃস্বপ্নের জ্বালার কথা, হাসির নীচে নীচে কান্নার স্রোতের কথা, দুঃখের কালো মেঘের ধীরে ধীরে সোনালী পাড় লেগে থাকার কথা। মাঠে-ঘাটে ঘুরে এসে মায়ের কোলের কাছে দুধ-চিড়ে খাবার কথা, দূরে থেকে অস্ত্রের ঝনঝনানির অশান্তির কথা, গরিবের কথা, আর মখমল বালিশে মাথা রেখে রাজরানীদের চোখের জল ফেলার কথা।"

লীলা মজুমদার

আমি শুধু এই সঙ্গে জুড়ে দিতে চাই আরও একটি নাম। তা হল, রক্তের কথা।

রক্তের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের পরিচয় নিতান্ত শৈশবেই, যখন দিন কাটে মশারি-ঘেরা বিছানায় বালিশগুলোকে পাহাড়-পর্বত ভেবে।

"হঠাৎ দেখলেম আমার দাসী একটা ধাক্কা খেয়ে ঠিকরে পড়ল দেওয়ালের উপর। আবার তখনই সে ফিরে দাঁড়িয়ে আঁচলটা কোমরে জড়াতে লাগল। তখন তার কালো কপাল বেয়ে রক্ত পড়ছে, চুলগুলো উস্‌কো—চেহারা রাগে ভীষণ হয়ে উঠেছে, সিঁদুর-পরা যেন কালো পাথরের ভৈরবী মূর্তি সে একটি। আমি চিৎকার করে উঠলেম—'মারলে, আমার দাসীকে মারলে!' লোকজন ছুটে এল, ডাক্তার এল, একটা ছেঁড়া-কাপড়ের শাদা পটি দাসীর কপালে বেঁধে দিয়ে গেল, কিন্তু আমার মনে জেগে রইল সিঁড়ির ধারে সকালের দেখা রক্তমাখা কালো রূপটাই দাসীর! সেই আমার শেষ দেখা দাসীর সঙ্গে।" আপন কথা

সম্ভবত রক্তের সঙ্গে সেই তাঁর শেষ দেখা নয়। পৃথিবীর রক্ত-রণ-হত্যা-বিনাশ-সর্বনাশ সম্বন্ধে তাঁকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যতখানি নিস্তরঙ্গ, সম্ভবত ভিতরে ভিতরে ঢেউ-এর তোলপাড় ছিল ঠিক ততখানিই উদ্দীপক। তা না হলে তাঁর রচনাবলীতে কেন এতো রক্তের দাগ? তা না হলে, খামখেয়ালী লেখা 'জেন্তু সভা বা জন্তুজাতীয় মহাসমিতি'র ভিতরে রক্তমাখা, কটা চুল, ঝাঁকড়া মাথা সিংহ কেনই বা মেঘগর্জনে ফেটে পড়বে মানুষের বিরুদ্ধে।

"এই মানুষের হাত থেকে বাঁচবার এক রাস্তা, আর সে রাস্তা তোমাদের জন্যে খোলা রয়েছে। এসো আমার সঙ্গে জনমানবশূন্য সুদূর খাণ্ডব বনে। অতি নির্জন সে স্থান, তেপান্তর মাঠে ঘেরা, মরুভূমির মধ্যেকার ওয়েসিস সেটি, বর্বর মানুষগুলো তার ত্রিসীমানায় যেতে পারে না এমন দুর্গম ভীষণ সে স্থান। মানুষের যত বড়াই লোকালয়ের চারখানা দেয়ালের মধ্যে, ফাঁকায় আর নিরালায় গেলেই আমরা তাদের ঘাড় মটকে রক্তপান করি।"

সিংহের চেয়ে আরও ভয়াবহ সেখানে সুন্দরবনের বাঘের হুঙ্কার—"আমরা লড়াই দেব, খুন, জখম, রক্তপাত করব, মানুষের জাতকে জাত পৃথিবী থেকে লোপ করে দেব।"

জেন্তু-সভায় বাঘ-সিংহী-হাতী-ঘোড়া-ষাঁড়-শৃগালেরা মানুষের বিরুদ্ধে যেভাবে ঘোষণা করেছে তাদের বিদ্রূপ এবং বিদ্রোহ, তার সবটুকুই নিছক আমোদ

বিতরণের জরুরী প্রয়োজনে 'ফরাসী হইতে চুরি' করা, এটা মেনে নিতে মন রাজী নয়। বরং মনে হয়, তার নিজেরও মানুষ-সম্পর্কিত বেদনা-বিক্ষোভের খানিক আভাস তিনি মিশিয়ে দিয়েছিলেন, মিশিয়ে দিয়ে স্বস্থির হতে চেয়েছিলেন, এই-জাতীয় রচনায়।

'আলোর ফুলকি'র এক জায়গায় ঘাড়-হেঁট-করা কুঁকড়োর মুখেও তিনি বসিয়ে দিয়েছিলেন এক আর্তনাদময় উচ্চারণ—

"ওরে মানুষ কী নিষ্ঠুর। কী নির্দয়।"

মানুষের মধ্যে কোন জাতের মানুষ নিষ্ঠুর অথবা নির্দয় অপবাদের যোগ্য, তাদেরও যে তিনি চিনতেন না তা নয়। বিহার ভূকম্প-পীড়িতদের সাহায্যার্থে ১৯৩৪-এ কলকাতায় যখন আয়োজন চলেছে 'রক্তকরবী' অভিনয়ের, তারই স্মারক-পুস্তিকায় অবনীন্দ্রনাথ রক্তকরবী'র ব্যাখ্যা করে লিখলেন ভূমিকা।

"এখানকার 'মালিক' যে, সে আছে অষ্টপ্রহর অসংখ্য মানুষের সুখ দুঃখ থেকে দূরে, একটা অত্যন্ত জটিল জালের আবরণে ভীষণ অদৃশ্য শক্তি নিয়ে প্রচ্ছন্ন। প্রকৃতির বক্ষ থেকে, মানুষের প্রাণ থেকে শক্তি শোষণ করে নিয়ে স্ফীত হবার জাদু সে জানে—তাই নিয়ে অমানুষিক নির্মমতার পরীক্ষায় সে নিযুক্ত।"

অবনীন্দ্রনাথের রচনায় রক্তাক্ত যা কিছু ছবি তা যেন ক্রমাগতই আমাদের টেনে নিয়ে যেতে চায় জীবনানন্দের পীড়িত উপলব্ধির কাছাকাছি—

"আমরা অঙ্গার রক্ত
শতাব্দীর অন্তহীন আগুনের ভিতরে দাঁড়িয়ে।"

এবার আমরা ফিরে তাকাবো অবনীন্দ্রনাথের রক্তাক্ত বর্ণনার দিকে।

১। "সে বৎসর ফাল্গুনের দোল-পূর্ণিমা এই নরপাল নয়—নরকপাল বিলাসভবনের পিচকারির পরিবর্তে ছুরির ব্যবস্থা করিয়া হতাহত শত শত অন্তঃপুরচারিকার ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দেহ লইয়া বেতালের মতো বিকট তাণ্ডবলীলায় মগ্ন আছেন। নব-শোণিতের রক্তিমা কুঙ্কুমের রক্তবর্ণকে ধিক্কার দিয়া রাজার উষ্ণীষে উত্তরীয়ে, রাজ-প্রাসাদের গৃহে গৃহে ধবলমণি ভিত্তিতে, শ্যামল পুষ্পকাননে, নির্মল কেলি সরোবরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। খণ্ডবিখণ্ড অভ্রমালায় রক্ত আভা। দূরদিগন্তে রক্ত ধূলিজাল।"

২। "পূর্ণিমার আলোর উপরে কালোর পর্দা টেনে দিয়েছে—'মার'। সেই কালোর ভিতর থেকে পূর্ণিমার চাঁদ চেয়ে রয়েছে—যেন একটা লাল চোখ! তা

থেকে ঝরে পড়ছে পৃথিবীর উপর আলোর বদলে রক্ত-বৃষ্টি। সেই রক্তের ছিটে লেগে তারাগুলো নিবে-নিবে যাচ্ছে।"

৩। "মহারানী দেখলেন, কালো ঘোড়ার মুখ থেকে সাদা ফেনা চারিদিকে মুক্তোর মতো ঝরে পড়ছে, তার বুকের মাঝ থেকে রক্তের ধারা রাস্তার ধুলোয় ছড়িয়ে যাচ্ছে; তারপর দেখলেন, আগুনের মতো একটা তীর তার কালো চুলের ভিতর দিয়ে ধনুকের মতো তার সুন্দর বাঁকা ঘাড় সজোরে বিঁধে ঘোড়াটাকে মাটির সঙ্গে গেঁথে ফেলল;—"

৪। "বন্ধু সেই মুমূর্ষু পাখিটাকে খাঁচা থেকে টেনে হিঁচড়ে বার করে গোলাপজলের ফোয়ারায় চুবিয়ে দাসীর হাতে একখানা সাদা রুমালের উপর বসিয়ে দিলেন। পাখির ডানা-দুখানা সেই সাদা রুমাল ঢেকে বদ-রঙ মাখানো বিশ্রী দুটো হাতের মতো ছড়িয়ে রইল। নির্জীব পাখিটার হলদে দুটো চোয়াল বেয়ে লোহার কষের মতো পাতলা গেরুয়া রক্ত সেই রুমালখানার সাদা রঙ মলিন করে দিচ্ছে, আর মূর্তিমন্ত নিষ্ঠুরতার মতো আমাদের বন্ধু দুটো জলন্ত চক্ষু নিয়ে সেই দিকে তাকিয়ে আছেন।"

৫। "মাথার উপরে আর চাঁদ নেই, তারা নেই, রয়েছে কেবল মহাশূন্য, মহা অন্ধকার। মুখ মেলে কে যেন পৃথিবীকে গিলতে আসছে। বোধ হয় তার কালো জিভ বেয়ে পৃথিবীর উপর পড়ছে জমাট রক্তের মতো কালো নাল!···লক্ষ লক্ষ ক্ষ্যাপা ঘোড়া যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে 'মার'-সৈন্য বুদ্ধদেবের চারিদিকে। তাদের খুর থেকে বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়ছে, তাদের মুখ থেকে রক্তের জলন্ত ফেনা আঁজলা-আঁজলা ছড়িয়ে পড়ছে—সেই বোধিবটের চারিদিকে, সেই পাথরের বেদীর আশেপাশে।···বিদ্যুতের শিখায় তলোয়ার শানিয়ে মশাল জ্বালিয়ে দলের পর দল যত রক্তবীজ, তারা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়ে পড়ছে বুদ্ধদেবের উপরে।"

৬। "যন্ত্রণায় পুষ্পবতীর চোখে জল এল; তিনি চেয়ে দেখলেন একটি ফোঁটা রক্ত জ্যোৎস্নার মতো পরিষ্কার সেই রূপোর চাদরে রাঙা একটুকরো মণির মতো ঝকঝক করছে। পুষ্পবতী তাড়াতাড়ি নির্মল জলে সেই রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলতে চেষ্টা করলেন। জলের ছিটে পেয়ে সেই একবিন্দু রক্ত ক্রমশ-ক্রমশ বড় হয়ে, একটুখানি ফুলের গন্ধ যেমন সমস্ত হাওয়াকে গন্ধময় করে, তেমনি পাতলা ফুরফুরে চাদরখানি রক্তময় করে তুলল।"

রাজকাহিনীর অন্তর্গত 'গোহ' নামের কাহিনীটি যখন আমরা পড়ি, তখন দেখতে পাই এই ছড়ানো-রক্ত এক আসন্ন সর্বনাশের প্রতীক। পুষ্পবতী সেই রক্তের দিকে তাকিয়েই কেঁদে-ওঠা-প্রাণে, তাঁর জননীর দিকে তাকিয়ে বলে উঠেছিলেন—

"মা, আমাকে বিদায় দাও, আমি বল্লভপুরে ফিরে যাই আমার প্রাণ কেমন করছে, বুঝিবা সেখানে সর্বনাশ ঘটল।"

হ্যাঁ, সত্যিই ঘটেছিলো সর্বনাশ। বিধর্মীর হাতে ধ্বংস হয়ে গেছে তখন বল্লভপুর।

অবনীন্দ্রনাথের ছবিতেও রক্তপাত ঘটেছে বহুবার। তাঁর প্রথম রক্তাক্ত ছবি সম্ভবত 'দারার মুণ্ড'। মাটিতে পড়ে রয়েছে দারার ছিন্ন মাথাখানা, রক্তমাখা। হিংস্র, ক্রূর, নির্দয় আওরঙ্গজেব উদ্ধত, গর্বিত ভঙ্গীতে নিজের তলোয়ার দিয়ে খুঁচিয়ে দেখছেন সেই মাথা। হ্যাভেল এই ছবির প্রশংসায় লিখেছিলেন—
"the dramatic power with which he has treated this tragic episode in Mughal history will show the versatility of his art."

এর পরে তাঁর ছবিতে গাঢ় রক্তের আঁচড় পড়েছে চণ্ডীমঙ্গল সিরিজে। ব্যাধের তীরে আক্রান্ত রক্তাক্ত জন্তু সেখানে অজস্র। রক্ত লেগেছে কালকেতুর গায়েও।

আরো পরে, তিনি হাত দিয়েছিলেন 'খৃস্ট' বিষয়ের চিত্রমালায়। শুনেছি একাধিক ছবি এঁকেছিলেন খৃস্টের জীবনকাহিনী নিয়ে। আমার চোখে পড়েছে মাত্র দু'টি। 'স্টেইনড' 'গ্লাস' শৈলীর ছাপ পড়েছে তার গঠনে। সেজানের ল্যাণ্ডস্কেপের মতো কাটা কাটা রঙের পোচ। তারই একটি ছবিতে রক্তাপ্লুত ক্রাইস্ট পড়ে আছেন মাটির উপরে, উপুড় হয়ে।

রক্তের অথবা রক্তময়তার কথা জীবনানন্দে গণনাহীন। চোখের সামনের অসুস্থ, অশুভ, অত্যাচারী, হত্যাকারী সময়ের প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রক্তকে এড়িয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে পাননি তিনি। লাস-কাটা ঘরে ইঁদুরের রক্তমাখা ঠোঁট থেকে শুরু করে আকাশের দিকে ঘাড় উঁচু করা 'রক্তিম গীর্জার মুণ্ড' পর্যন্ত সবখানেই ছড়ানো রয়েছে তাঁর বেদনার্ত দৃষ্টিপাত। রক্ত অথবা হত্যার সঙ্গে, তাঁর কবিতায় জুড়ে রয়েছে আর-এক অদ্ভুত অন্ধকার যা বিদিশা যা শ্রাবস্তীর

নয়, এই বিংশশতাব্দীর মূঢ় রাজনীতির রক্তমাখা-হাতের কারুকাজ।

১। "হয়তো-বা অন্ধকারই সৃষ্টির অন্তিমতম কথা;
হয়তো বা রক্তেরই পিপাসা ঠিক, স্বাভাবিক
মানুষও রক্তাক্ত হতে চায়।"

২। "আমরা অজ্ঞান নই—প্রতিদিন শিখি, জানি, নিঃশেষে প্রচার
করি, তবু
কেমন দূরপনেয় রক্তাক্তের বিয়োগের পৃথিবী পেয়েছি।"

৩। "চারিদিকে রক্তে-রৌদ্রে অনেক বিনিময়ে ব্যবহারে
কিছু তবু ফল হল না; এসো মানুষ, আবার দেখা যাক
সময় দেশ ও সন্ততিদের কী লাভ হতে পারে।"

৪। "অন্ন নেই। হৃদয়বিহীনভাবে আজ
মৈত্রেয়ী ভূমার চেয়ে অন্নলোভাতুর।
রক্তের সমুদ্র চারিদিকে।"

৫। "নব নব মৃত্যু শব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় করে মানুষের চেতনার দিন
অমেয় চিন্তায় খ্যাত হয়ে তবু ইতিহাসভুবনে নবীন
হবে না কি মানবকে চিনে।"

৬। "শক্তি আছে, শান্তি নেই, প্রতিভা রয়েছে, তার ব্যবহার নেই
প্রেম নেই, রক্তাক্ততা অবিরল,"

৭। "বোন ভাইকে খুন করে সেই রক্ত দেখে আঁশটে হৃদয়ে
জেগে উঠে ইতিহাসের অক্ষম স্থূলতাকে
ঘুচিয়ে দিতে জ্ঞানপ্রতিভা আকাশ প্রেম নক্ষত্রকে ডাকে।"

৮। "পৃথিবীর রাজপথে রক্তপথে অন্ধকার অববাহিকায়
এখনো মানুষ তবু খোঁড়া ঠ্যাঙে তৈমুরের মতো বার হয়।"

নিজের রক্তমাখা হাতের দিকে ম্যাকবেথ আর্তনাদ করে উঠেছিল—

"The multitudinus sees incarnadine Making green one red."

অবনীন্দ্রনাথ অতীত কাহিনীর আদলে, জীবনানন্দ তাঁর সমসাময়িককালের আবহে, আমাদের যেন শোনাতে চান সেই কথাটিই—

পৃথিবীর সমস্ত সবুজ আজ লাল হয়ে গেছে অথবা যেতে বসেছে রক্তস্রোতে।

তাই জীবনানন্দ যখন পৃথিবীকে নতুন নাম দেন, বাস্তবের রক্ততট, আর অবনীন্দ্রনাথ যখন জানান পৃথিবীটাকে যে গিলতে আসছে তার কালো জিভে, জমাট রক্তের লাল, কখন দুই কালের দুই ভিন্ন মানসিকতার কবির দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই, একই ব্যথায় দুজনের কণ্ঠনালীর রঙ নীল।

জীবনানন্দে আচমকা বন্দুকের শব্দ শুনেছি আমরা কয়েকবার। জীবনানন্দও তাঁর কৈশোরে বন্দুকের শব্দ শুনেছেন বহুবার।

"মনিরুদ্দি বড় শিকারী। বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহ, ইস্পাতের মতো বুক। বুট পরে, কালো কোট গায় দিয়ে, বন্দুক হাতে নিয়ে যখন মনিরুদ্দি আর তার ভাই লাখুটিয়া কিম্বা কাশীপুরের জঙ্গলের দিকে বীরদর্পে যেতো, তখন তার অন্য মূর্তি। আজ তার কাছে যাই এমন সাহস আমাদের ছিল না। দূরের থেকেই ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধায় তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। যখন সে রাজমিস্ত্রীর কাজ করতো, অবসরের সময় যখন মনমেজাজ ভালো থাকত, তার কাছ থেকে নানান রকমের শিকারকাহিনী শোনা যেত। দাদা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার কাছ থেকে শিকারের অনেক তথ্য সংগ্রহ করতেন।

শিকারের কিছু কিছু কাহিনী শুনেছি আমার পিতামহীর নিকট থেকে। কাকা ছিলেন ডেপুটি কনজারভেটর অফ ফরেস্টস। অনেক শিকার করেছেন তিনি। আমাদের বরিশালের বাড়ির দেওয়ালে তাঁর শিকার করা হরিণের শিঙ, বন-মহিষের শিঙ, বাঘের মাথা টাঙানো থাকত।" অশোকানন্দ দাশ

আচমকা বন্দুকের শব্দে, নিহত হরিণের শোকে হরিণীর ডাক শুনে শুনে বহুবার ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর আর ঘুমোতে পারেননি জীবনানন্দ।

"ঘুমোতে পারি না আর ;
শুয়ে-শুয়ে থেকে
বন্দুকের শব্দ শুনি ; "

আরেকবার, আদি কবি বাল্মীকির সামনে যেমন তেমনিই এক মৃত পাখি শূন্য থেকে আছড়ে পড়েছিল কবির সামনে।

'ডানা ভেঙে ঘুরে-ঘুরে পড়ে গেলো ঘাসের উপরে ;
কে তার ভেঙেছে ডানা জানে না সে,······
জানে না সে, ঈর্ষা নয়, হিংসা নয়,
বেদনা নিয়েছে তারে কেড়ে।

অবনীন্দ্রনাথেও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি বেদনার পায়ে পাড়ি দেওয়া মৃত পাখিদের ছবি। অবনীন্দ্রনাথেও বন্দুকের শব্দ।

"দুম্ করে বন্দুকের শব্দ হল। একটা আগুনের হল্কা বিদ্যুতের মতো বনের শিয়রে চমকে উঠল। একটি ছোট পাখি গাছের শিয়র থেকে কুঁকড়োর পায়ের কাছে ঝরা পাতার মতো ঝরে পড়ল।...সকালের হাওয়া আগুনে-ঝলসানো রক্তমাখা একটি ছেঁড়া পালক আস্তে আস্তে উড়িয়ে নিয়ে চলল, বনের পথে হু-হু করে কেঁদে।"

আমরা সহজেই অনুমান করে নিতে পারি, প্রত্যেকবারের এই রক্ত উচ্চারণ করার সময় কতখানি বেদনা চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়েছে তাঁদের অস্থি-পঞ্জরে। আমরা সহজেই বিশ্বাস করে নিতে পারি, এই রক্তকে শাশ্বত সত্যের মূল্য দিতে তাঁরা ছিলেন কতখানি নারাজ। তাই জীবনানন্দে বারবার নানা ছন্দে নানান ভঙ্গীমায় উচ্চারিত হয়—

"পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা সত্য
তবু শেষ সত্য নয়।"

তাই অবনীন্দ্রনাথ এই রক্তকেই হত্যার-সঙ্গী, মৃত্যুর সহচর না সাজিয়ে গড়ে তোলেন এক আশ্চর্য অরুণোদয়ের প্রতিনিধিরূপে।

"একটিমাত্র রক্তবিন্দু! পূর্ব সন্ধ্যার অরুণিমার উপরে বিশ্বজগতের পূর্বরাগের একটিমাত্র বুদ্‌বুদ্—অখণ্ড অম্লান! অনন্তের পাত্রে টলমল করিতেছে। জ্যোতির রথ, মহাদ্যুতি এই প্রাণবিন্দুটিকে বহিয়া আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে—সপ্তসিন্ধুর চলোর্মি ভেদ করিয়া, জাগরণের জ্যোতিষ্মান চক্রতলে সুষুপ্তিকে নিষ্পেষিত করিয়া। পূর্ব আকাশে এই শোণিতবিন্দুর আভা লাগিয়াছে, সমুদ্র তরঙ্গ বহিয়া তাহারই প্রভা গড়াইয়া আসিতেছে। পাণ্ডুর তটভূমি দেখিতে দেখিতে রক্তচন্দনের প্রলেপে প্লাবিত হইয়া গেল; রক্ত বৃষ্টিতে চন্দ্রভাগার তীর্থজল রাঙিয়া উঠিল।"

পৃথিবীর কবিদের পায়ে প্রণাম। কারণ, তাঁরাই পারেন একই শব্দকে একবার ঘৃণ্য আরেকবার বরেণ্য করে ফোটাতে। একই 'রক্ত' জীবনানন্দ এবং অবনীন্দ্রনাথে একবার পৃথিবীর যাবতীয় ব্যর্থতার স্বরূপ। আরেকবার সেই 'রক্ত'-ই পৃথিবীর যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা-অভিলাষের প্রতীক।

শ্মশানচিতার গন্ধ

পাঠক, এবার আমরা আলোকিত পৃথিবী ছেড়ে প্রবেশ করবো ভয়ংকর শ্মশানে। সতর্কীকরণ হিসেবে আগে থেকেই জানিয়ে রাখি যে, এই শ্মশান-যাত্রার পথে আমরা মুখোমুখি হবো যাদের সঙ্গে, তাদের মধ্যে রয়েছে ভূত-প্রেত-শাঁকচুন্নি, ডাইনি, ব্রহ্মদৈত্য, কাপালিক। আমাদের পায়ে ঠেকবে শুকনো কংকালের হাড়-গোড়, মড়ার মাথার খুলি! হয়তো সাক্ষাৎ ঘটবে আরো কোনো অপদেবতার সঙ্গে যারা নামহীন কিন্তু নখদন্তহীন নয়।

জানি, সঙ্গতভাবেই একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, রূপসী বাংলার আলোচনায় শ্মশানের হাড়-কঙ্কাল কেন? আর যদি ধরে নিতে হয় শ্মশানের কালো ধোঁয়ায় আর শ্মশানচারীদের তাণ্ডবে বাংলার হৃদয় মথিত, তাহলে সে বাংলা রূপসী হয় কেমন করে?

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ বিমলার মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন 'আমার মায়ের বর্ণ ছিল শ্যামলা, তাঁর দীপ্তি ছিল পুণ্যের।' বাংলাদেশও তাই। তার

কুৎসিত যেটুকু সেটা তার উপরওয়ালাদের অব্যবস্থার অবদান। তার সৌন্দর্য যেটুকু সেটা তাঁর নিজের ভিতরকার প্রাণসত্তার ফসল।

যে রূপসী বাংলা ছিল একদিন তার পালাপার্বণে, তার বর্ণগন্ধময় দৃশ্যের সমারোহে, তার অল্প-ঢেউএর শান্ত-স্বাধীন জীবনযাপনে, আর আজ যা হয়ে উঠেছে এই রূপসী বাংলা, এই দুয়ের প্রতিই এঁদের সমান টান। অতীতের চালচিত্র টাঙিয়ে দেন তাঁরা আজকের ভাঙা প্রতিমার পিছনে। কিন্তু কেন?

"ডব্লু. বি. ইয়েটস যেমন আইরিশ পুরাণকে রক্ত মাংসের শরীরের মধ্য দিয়ে পুনরুজ্জীবিত করে আভৌম সংস্কারের দিকে যাত্রা করেছেন, জীবনানন্দ দাশও তেমনি দেশের নাড়িতে সঞ্চালিত পুরাবৃত্তকে প্রাণিত করে বিশ্বপুরাণ পরিক্রমা করেছেন। পরিক্রমার মুহূর্তে ইয়েট্‌সের মতোই জীবনানন্দও সমকালীন আবর্তগুলি পরিমাপ করেছেন। সেই সব মুহূর্তে কখনো-কখনো অবলুপ্ত বঙ্গসংস্কৃতির জন্য তাঁর পরিতাপকে কী আশ্চর্য শ্রীবাস্তব ভাষা দিয়েছেন…। শেষ পর্যন্ত এটাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যেসব কবিতার হৃত মহিমার জন্য শোচনীয় অনুতাপ দেখা গিয়েছে, জীবনানন্দ সেখানেও বাংলাদেশের নিসর্গ-পুরাণকে তার অনিঃশেষ ঐশ্বর্যসৌন্দর্যের গরিমায় কাজে লাগিয়েছেন। অ্যামিয়েলের ভাষায় বলা যায় এসব ক্ষেত্রে a landscape is a state of mind."

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

অবনীন্দ্রনাথ এবং জীবনানন্দ দীনতা এবং দীপ্তি দুই মিলিয়ে যে বাংলা, সেই রূপসী বাংলার কবি। বাংলাদেশকে তাঁরা দেখেছেন তন্ন তন্ন করে। তার প্রত্যেকটি পাখির পালক, প্রত্যেকটি গাছের পাতা, প্রতিদিনের জলের রঙ, প্রতি মুহূর্তের আলোর রঙবদল, সমস্ত কিছুকে নেড়ে-ঘেঁটে-ছুঁয়ে-মেখে বাংলাকে চিনেছেন এবং চিনিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। কোকিলের ডাক আমরা অনেক শুনেছি বাংলাসাহিত্যে। কিন্তু কোকিল যে উলু-উলু দিয়ে বলতে পারে—'শুভদিন এল, শুভদিন', তা আমাদের প্রথম শোনালেন অবনীন্দ্রনাথ। পানা-পুকুরের লাল সর অনেক দেখেছি আমরা। কিন্তু সেই সর যে ক্ষীণ ঢেউয়ে দুলে দুলে করবীর কচি ডালকে চায় জড়াতে অথবা চুমো খেতে চায় মাছরাঙার পায়ে, সে-রকম অনির্বচনীয় দৃশ্যের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় করিয়ে দিলেন জীবনানন্দ।

অবনীন্দ্রনাথ যখন লিখছেন

"কমলাপুলির দেশে সকাল হচ্ছে, আকাশে কমলালেবুর রঙের।"

তখন জীবনানন্দ লিখছেন

"অনেক কমলা রঙের রোদ ছিল, অনেক কমলা রঙের।"

যখন অবনীন্দ্রনাথ শোনাচ্ছেন—

"ফটিক জোছনার দেশে রাজকন্যে ঘুমিয়ে পড়েছেন নীল আকাশে মস্ত চাঁদ ছিক্কে বনের আড়াল থেকে রূপোর থালার মতো দেখা দিয়েছে আর সেই রাখাল পরাণের কাটিটি আস্তে আস্তে ছুঁয়ে দিচ্ছে।"

তখন জীবনানন্দ শোনাচ্ছেন যেন ঐ দৃশ্যেরই আর এক রূপ। যেন ঐ একই রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে যায় এক পউষের ভোরে, যখন দূরের পাহাড় কড়ির মতো সাদা। পরান-কাটিটি ছোঁয়ানোর বদলে কবি সেই রাজকন্যেকে ডাক দেন জেগে ওঠার।

"চন্দ্রমালা, রাজকন্যা, মুখ তুলে চেয়ে দেখ, শুধাই শুনলো
কি গল্প শুনিতে চাও তোমরা আমার কাছে, কোন গান বলো।"

ঝোপ-ঝাড়, গাছ-গাছালি, কীট-পতঙ্গ, ওড়া এবং বসা দুরকম পাখির সব-রকম ঘোরা-ফেরা, আকাশ-আলো-অন্ধকার-নক্ষত্র-জোনাকী সব কিছুকে মিলিয়ে জীবনানন্দ যেন গড়ে তোলেন এক রঙীন চলচ্চিত্র। সেখানে দেখতে পাই—

ভোরের বাতাসে ঝরছে কাঁঠাল পাতা, ডুমুরের গাছে জেগে আছে অন্ধকার, নরম ধানের গন্ধ, কলমীর ঘ্রাণ, কিশোরীর পায়ে-দলা মুথো ঘাস, আমপাতায় ঘুমোনো কাঁচপোকা, আনারস ফুলে ভোমরা, বাংলার নারীর চাল ধোয়া স্নিগ্ধ হাত, ধানমাখা চুল, কাঁঠালী-চাঁপার নীড়ে ঠোঁট গুঁজে চড়াই পাখি, মাদারের ডুমুরের সোঁদা গন্ধ-বাংলার শ্বাস, শরতের বিলাসী রোদ, গোখুরার ফাটল, বেল-কুঁড়ি ছাওয়া পথ, ধোঁয়া-ওঠা ভাত, রৌদ্রের ভিতরে কখনো নকশা-পাড় কখনো লাল ডুরে শাড়ি-পরা মেয়ে সরে যায় হলুদ পাতার মতো, ম্লান সাদা ধুলোর ভিতরে অশথের ঝরা পাতা, সাদা ভাঁটফুলের তোড়া, বেতের বনের ফাঁকে বাঘিনীর ডোরা, তলতা বাঁশের ছিপ হাতে মাছ ধরা, রাখি-পূর্ণিমার রাত, আকাশ-প্রদীপ জ্বেলে সাজানো কার্ত্তিকের মাস, মাঠ থেকে গাজনের গান, ঘাসে মৌরির গন্ধ, চালতার পাতা থেকে জ্যোৎস্নায় ঝরছে শিশির, রাতের আকাশে নক্ষত্রের নীল ফুল, থোড়ের মতন শাদা ভিজে হাতে ধরা ধূপ অথবা সন্ধ্যাবাতি, বাগড়ার বনে ব্যাঙেদের ডাকাডাকি, ঘাসের আঁচলে ফড়িং, রাজহাঁসের নব-কোলাহলে ভরা ভোরের আকাশ, নদীর গোলাপী ঢেউ, রাঙা সাটিনের মতো

মেঘ, দুপুরের নিঃসঙ্গ বাতাসে সাথীহারা মাছরাঙা, বেলগাছের নীচে ঠোঁট-ভাঙা দাঁড়কাক, ঝিউলীর বাবলার আঁধার গলির ফাঁকে জোনাকীর কুহক আলো, কীর্তন-ভাসান-গান-রূপকথা-যাত্রা-পাঁচালীর নরম নিবিড় ছন্দ।

ওরাই আবার অবনীন্দ্রনাথের বাংলাকেও সাজিয়ে দেয় অন্য রঙের আলতা-কাজলে। সেখানে দেখি—

বোশেখ-জষ্টি মাসে আম-কাঁঠালের বাগানে বৌ-কথা কও পাখির ডাক, নদীতে সোনালী রঙের হাঁস-মাছ-নৌকো, কনকরাজার মেয়ে দুইতে বসেছে কপলে গাই, হিঙুল গাছে, মাদারের ফুল, আঁকড় ফুল, বেঁচফুল ফুটে রয়েছে, ট্যাপোর ভিতর ঝুলছে ঝিঙে, নটেশাকের গুঁড়িতে নেজ-ঝোলা পাখি উড়ে বসে খাচ্ছে চাটিম কলা, চালতাতলায় ডাকছে ঝিঁ ঝিঁ, পুকুরে পানকৌড়ি ডুব দিয়ে ধরছে মাছ, আতাগাছের আগডালে দু-চারটি সবুজ পাতায় রোদ, অন্ধকার-করা ঘরটিতে ছেলে-মেয়ে তিনটিকে ঘুম পাড়িয়ে সোনার মা মেঝের উপর মাদুর বিছিয়ে সেলাই করছে কাঁথা, পানা-পুকুরের চার ধার আমরুলি শাকের সবুজ পাতায় ছাওয়া, আলের ধারে ধারে দুর্বো, মেঘ সরে গিয়ে মনে হচ্ছে যেন নীল আকাশের কপাট হঠাৎ খুলে গেছে আর বাতাস ছুটে বেরিয়ে এসেছে বাইরে, কমলালেবু রঙের সাজ পরে হলুদবর্ণ সূর্য আমতালির মাঠে।

আরও আছে।

১। "আমতলির সেই ঘর ক'খানি সেই তেঁতুলতলার ঘাট তেপান্তর মাঠ, হাঁস-পুকুরে কাদা জল, তাতে শালুক ফুল, বাড়িব ধারে ঝুমকোতলার মাচা, তার উপরে দুগগা টুনটুনি পাখিটি উঠোনের কোণে তুলসীমঞ্চ, কালো মাটি লেপা ঘরের দেয়াল তার উপরে মায়ের হাতে আলপনা, দড়ির আনলায় বাপের কোঁচানো চাদর, পুরনো শোবার তক্তা তার উপরে শীতলপাটি আর লাল ঝালর দেওয়া তালপাতার পাখাখানি।"

২। "হাঁসের দল তখন সুন্দরবন ছাড়িয়ে বাংলাদেশের বুকের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে। রিদয় আকাশ থেকে দেখছে যেন সবুজ-হলদে-রাঙা-মেটে নীল এমনি পাঁচ রঙের ছক-কাটা চমৎকার একখানি কাঁথা রোদে পাতা রয়েছে।"

৩। "পশ্চিম বাগানের উপরে আকাশে ধরল চম্পাই রং, পুবধারে পুকুরের পারে শিশুগাছ নতুন পাতা ছেড়েছে তার ফাঁক দিয়ে উঠল চাঁদ পুকুর জলে তার ছাওয়া। শালুকপাতার কিনারায় যেন মাসির পোষা সাদা হাঁসটি ঘুমিয়ে

সবার আগে গা ভাসিয়ে চুপ হয়ে আছে।"

৪। কোন মাঠ?

তিরপুরনীর মাঠ, জলে থৈ থৈ।

কোন ঘাট?

সাকের ঘাট—গুগলী ভরা।

কোন হাট?

উলোর হাট—খড়ের ধূম।

কোন নদী?

বিষ নদী—ঘোলা জল।

কোন নগর?

গোপালনগর—গয়লা ঢের।

কোন আবাদ?

নসীরাবাদ—তামুক ভালো।

কোন গঞ্জ?

বামুন গঞ্জ—মাছ মেলা দায়।

কোন বাজার?

হালতার বাজার—পলতা মেলে।

কোন বন্দর?

বাগা বন্দর—হুক্কা হুয়া।

কোন জেলা?

রুরুলীজেলা—সিঁদুরে মাটি।

কোন বিল?

চলন বিল—জল নেই।

কোন পুকুর?

বাঁধা পুকুর—কেবল কাদা।

কোন দীঘি?

রায়দীঘি—পানায় ঢাকা।

এ যেন চিরকালের টাপুর-টুপুর ছন্দে বাংলার এক নতুন বন্দনা। কিন্তু এর সবটাই কী বন্দনা? সবটুকুই কি স্তব? সবটুকু দুঃখের গায়েই কী মুগ্ধতার

চিকনের কাজ? না। কোথাও যেন রয়ে গেছে বেদনার ছাপ। কোথাও যেন আড়াল থেকে উঁকি মারছে অভিমানের মুখ। যে চলন-বিলে জল নেই অথবা যে বাঁধা পুকুরে কেবল কাদা, সেই বাংলার ছবি আঁকতে গিয়ে কোথায় যেন দীর্ঘশ্বাসের গোপন শব্দ কানে এসে যায় আমাদের। যেন মনে হয় যে বামুনগঞ্জে মাছ মেলা দায়, সেখানকার বাতাসে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা হায় হায় স্বর। ব্রাডলী বাউ-এর ইংরেজি বই 'ফোক টেলস্ অফ বেঙ্গল'-এর জন্যে অবনীন্দ্রনাথকে একবার আঁকতে হয়েছিল ছ খানা ছবি। সেই ছ খানা ছবি যেন বাংলাদেশের মাটি-ধুলো দিয়ে আঁকা। যেমন দেখা গেছে চণ্ডীমঙ্গলের কোনো কোনো ছবিতে। এই মলিন বাংলাদেশ আঁকতে গিয়ে মনের যে উদ্গত অশ্রুকে লুকোতে চাইছেন তিনি জীবনানন্দে তারই অপকট স্বীকারোক্তি।

"বাংলার লক্ষ গ্রাম নিরাশার
আলোহীনতায়
ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেল।"

হ্যাঁ, বাংলার নিরাশার-দুর্দশার-আলোকহীনতার নিস্তব্ধ লক্ষ গ্রামকে অবনীন্দ্রনাথও চিনতেন অনেকখানি।

"মানুষ হয়তো দিয়েছে গ্রামের নাম 'ভদ্রপুর'। কিন্তু সেখানে না আছে ফলের বাগান, চরবার খাল-বিল-মাঠ; লোকগুলো চোয়াড়, পাখির ভাষায় সে গ্রামের নাম হল 'নরককুণ্ড'। কোনো দুঁদে জমিদার প্রজার সর্বনাশ করে তেতলা বাড়ি ফেঁদে তার নাম দিয়েছে 'অলকাপুরী'; কিন্তু সেখানে কোনদিন কারো পাত পড়ে না, শেয়াল-কুকুর কেঁদে যায় পাখিরা সে বাড়ির নাম দিলে 'পোড়োবাড়ি'। কোনো ভালো পরগণা নষ্ট জমিদারের হাতে পড়ে উচ্ছন্নে গেল—সেখেনে না মেলে ঘাস, না আছে ভালো জল, না আছে বাগান, থাকবার মধ্যে মাতাল জমিদারের বন্দুকের গুলি, দুঁদে নায়েবের লাঠিসোটা, মানুষ সে পরগণার নাম 'লক্ষ্মীপুর' দিলেও পাখিরা তাকে বললে 'মশালচুলি'।" বুড়ো আংলা

জীবনানন্দ শুনেছিলেন অথবা একবার শুনিয়েছিলেন আমাদের, 'গ্রাম পতনের শব্দ'। উপরের উদ্ধৃত স্তবকের মধ্যে দিয়ে যেন সেই গ্রাম পতনের ছবি এঁকে দিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ। আর এই শ্রী-সম্পদ হারানো বাংলার ছবিটাকে সম্পূর্ণ করার জন্যেই যেন তাঁর লেখায় বারে বারে ফিরে আসে শ্মশানের কথা। জ্বলে ওঠে চিতার আগুন।

১। "অন্ধকারের মধ্যে একটা চিতা কিছু দূরে শ্মশানঘাটের সমস্তটা এবং অন্ধকারের অনেকখানি আলোতে ভরে দিয়ে জলজল করে জলছে।"

২। "শিবতলার শ্মশানঘাটের কাছে জাহাজ এসে স্থির হল। দূরে একটা চিতার আগুন ধু ধু জলছে।"

৩। "ঘাটের ধারে পাঁচিলে ঘেরা শ্মশানের মধ্যে থেকে খানিকটা সাদা ধোঁয়া আস্তে আস্তে আকাশের দিকে উঠছে।"

৪। "এপারে-ওপারে মরণের কান্না আর চিতার আগুন, মাঝ দিয়ে চলে যাবার পথ—কেঁদে চলে যাবার পথ, কাঁদিয়ে চলে যাওয়ার পথ।"

৫। "জগত জুড়ে উঠেছে 'মারী'র আর্তনাদ, 'মার'-এর সিংহনাদ আর শ্মশানের মাংস-পোড়া বিকট গন্ধ।"

৬। "রাণী পদ্মিনী শয়নঘরের প্রদীপ অন্ধকার করে দিলেন। দক্ষিণের হাওয়ায় সারা রাত্রি চিতোরের মহাশ্মশানের দিক থেকে যেন একটা হায় হায় হায় হায় শব্দ সেই ঘরের ভিতর ভেসে আসতে লাগল।"

৭। "দুই শহরের মাঝে দুটো বড়ো বড়ো চিতা জ্বালানো রয়েছে, আর শহরের যত লোক দিনরাত কাঠের বোঝা আর তেলের কুপো এনে সেই চিতায় ঢালছে। যেন এক-একবার আগুন দাউ দাউ করে জলে উঠছে আর অমনি লোকগুলো তাতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর অমনি একদল লোক গোরু হয়ে বেরোচ্ছে, আর অন্য একদল গাধা হয়ে দৌড় দিচ্ছে।"

এই শ্মশান, এই দাউ দাউ চিতার আগুন, জীবনানন্দেও। রূপসী বাংলা অথবা তার নিজের রূপৈশ্বর্যময় বিশ্বের দিকে তাকিয়ে তিনি যে শুধু নয়ন ভোলানো দৃশ্যের বর্ণে-গন্ধে মুগ্ধ হয়ে যাবেন, শুধু যে চিত্ররূপময় প্রকৃতি তাঁকে অভিভূত করে রাখবে মোহিনী বাঁশিতে, তাঁর মহত্ব এমন ছোট মাপের নয়।

যে রূপসী বাংলার প্রতি তাঁর এত নিবিড় টান, এত অবিরল গান যাকে মনে রেখে, সেই বাংলারও বেদনার ছবি কোনদিন এড়িয়ে যায়নি তাঁর চোখ। এড়িয়ে গেলে কি তিনি লিখতে পারতেন,—

> "দেখিব মেয়েলি হাত সকরুণ—সাদা শাঁখা ধূসর বাতাসে
> শঙ্খের মতো কাঁদে—"

অথবা

> "আজ আর কেউ এসে চাল-ধোয়া হাতে

বিনুনি খসায় নাকো—শুকনো পাতা সারাদিন থাকে যে গড়াতে
কড়ি খেলবার ঘর মজে গিয়ে গোখুরার ফাটলে হারায়।”

অথবা

"এতদিন কোথায় সে? কি যে হল তার
কোথায় সে নিয়ে গেছে সঙ্গে করে সেই নদী ক্ষেত মাঠ, ঘাস
সেই দিন, সেই রাত্রি সেই সব ম্লান চুল, ভিজে শাদা হাত
সেই সব নোনা গাছ করমচা শামুক, গুগলি, কচি তালশাঁস,
সেই সব ভিজে ধুলো, বেলকুঁড়ি-ছাওয়া পথ ধোঁয়া-ওঠা ভাত,
কোথায় গিয়েছে সব? অসংখ্য কাকের শব্দে ভরিছে আকাশ
ভোর রাতে—নবান্নের ভোরে আজ বুকে যেন কিসের আঘাত!”

আর এই আঘাতই তাঁকে মনে করিয়ে দেয় একদিন এই বাংলার বুকের ভিতরকার লক্ষ্মীর গল্প, ভাসানের গান, বেহুলার লহনার মধুর জগৎ, সীতারাম, রাজারাম, রামনাথ রায়ের ঘোড়ার খুরের শব্দ, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, রামপ্রসাদের শ্যামা, শঙ্খমালা, চন্দ্রমালাদের কাঁকনের স্বর এবং এমন আরও স্মৃতি, যা হারিয়ে গেছে কার্তিকের কুয়াশার মতো কোনো এক ধূসর পর্দার আড়ালে।

আজন্মের বাংলাকে চিরকাল মনের মধ্যে ধরে রাখার কী আপ্রাণ প্রয়াস তাঁর রচনায়। বার বার ঘুরে-ফিরে শুধু বাংলার অবিস্মরণীয় ভোরবেলার গল্প। বারবার শহরের উতরোল কলহ-কোলাহল ভেদ করে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে সেই শ্যামল সৌন্দর্যতটে।

'গ্রাম ও শহরের গল্পে' প্রকাশের স্ত্রী শচী আর শচীর বিবাহপূর্ব জীবনের বন্ধু সোমেন যখন দীর্ঘ ব্যবধানের পর হঠাৎ সুযোগ পায় মেলামেশার তখনই তাদের মনে সাধ জাগে ফেলে-আসা-অতীতের ভিতরে ফিরে যাওয়ার, ফেলে-আসা পাড়াগাঁয়ে প্রত্যাবর্তনের। প্রথম প্রস্তাব করে শচী, চল না, পাড়াগাঁয় যাই। সোমেন বলে, কোন পাড়াগাঁয়?

" 'যেখানে ছিলাম আমরা—'

'সেই বকমোহানার নদীর ধারে? ভাটশ্যাওড়া ময়নাকাঁটার জঙ্গলে?

শচী মাথা নেড়ে বললে 'হ্যাঁ সেখানেও—

সোমেন বললে, 'অসম্ভব'।

'অনেকদিন আমি ভেবেছি, যাব—

সোমেন মাথা নেড়ে বললে, 'কী করে যাব ?'

শচী আনত মাথায় ভাবছিল।

একটু পরে মুখ তুলে বলল 'কেন ?'

সোমেন বললে, 'তুমি আবার ফিরে আসতে চাইবে যে।'

'ফিরে আসব না কেন ?

চুরুটটা সোমেনের শ্লথ আঙুলের ভিতর ঢিলে হয়ে যাচ্ছিল ; সেটাকে শক্ত করে চেপে ধরে বললে 'কেন ফিরে আসবে ?'

'কেন আসব না ?'

সোমেন বললে, 'তোমাকে নিয়ে সেই বকফুল বনধুধুল কলমীলতা বাঁশবনের ভিতর গেলে আমি তো আর ফিরে আসতে পারব না। কিন্তু কথা হচ্ছে, যা ছিলাম আমরা, তা নেই আমরা—সে আমিও নেই তুমিও নেই।...' "

তাঁর 'মাল্যবান'-এও ঘুরে-ফিরে গ্রামের প্রসঙ্গ। মাল্যবানের বার বার মনে পড়ে যায়, গ্রামের স্মৃতি। যেন হানাদারের মতো, বর্গীর মতো, থেকে থেকে ছুটে আসে তারা মাল্যবানের অস্তিত্বের ভিতরে। পিষ্ট, অসহায়, হাঁপিয়ে-ওঠা তার বর্তমান যেন খানিকটা নিশ্বাস ফেলার পরিশ্রুত হাওয়া খুঁজে পায় ঐ স্মৃতি-রোমন্থনে। "মাল্যবান" উপন্যাসের একেবারে শুরু থেকেই এই স্মৃতিরোমন্থনের শুরু। কিছুতেই ঘুম-না-আসা এক শীতের রাতে নিজের স্ত্রী উৎপলার গানের কথা ভাবতে গিয়ে তার মনে পড়ে যায়—

"যখন সে কলকাতার চাকরীতে বাঁধা পড়েনি পাড়াগাঁয়ে ছিল, সেই ছোট-বেলা এক-এক দিন শীতের শেষ রাতে বাউলের গান শুনতে তার খুব ভালো লাগত ; কোনো দূর হিজলবনের ওপার থেকে অন্ধকারের মধ্যে সে-স্বর ভেসে এসে তার কিশোর আতে ব্যথা দিয়ে যেতো। কতদিন—যখন দিন শেষ হয় দাণ্ডাগুলি খেলে যখন সে কাঁচা-কাঁচা কালিজিরা ধানশালির রূপশালির ক্ষেতের আলপথ দিয়ে বাড়ি ফিরছে, ভাটিয়াল গান শুনে মনটা তার কেমন করে উঠত যেন ; সারাদিনের সমস্ত কথা কাজ অবসন্ন লাল শোল বোয়ালের মতো দীঘির অতলে তলিয়ে যেত যেন, ঝির ঝির ফটিক ফটিক ঝিমঝিক ঝর ঝর করে উঠত ওপারের জল : যে-জল গানের মতো, যে গান জলের মতো চারিদিককার খেজুর-ছড়ি, নারকোল ঝির ঝিরি ঝাউয়ের শনশনানি ছায়া অন্ধকার একটি তারার

ভেতর ; এক কিনারে চুপ করে বসে থাকত সে।"

'মাল্যবান'-এ এবং তাঁর ছোট গল্পে বার বার ফিরে এসেছে গ্রামবাংলা এবং শৈশবের প্রসঙ্গ। এমনভাবে এসেছে যেন মনে হয় এই সব কাহিনীর ক্ষতবিক্ষত চরিত্রদের পক্ষে ঐ স্মৃতিই একমাত্র সান্ত্বনার এবং শান্তির। যেন শেষ পর্যন্ত জীবনের পরম ভালবাসা পাওয়ার যোগ্য ওরাই, ঐ পশু-পাখি লতা বৃক্ষ বিজড়িত বাংলার গ্রাম।

অথচ এমন গ্রাম-বাংলার বুকের ভিতরেও, অবনীন্দ্রনাথের মতোই, তাঁরও চোখে পড়েছে শ্মশানচিতার অগ্নিশিখা। শ্মশানের চিতার, আত্মহত্যার উল্লেখ তাঁর রচনায় আমাদের পাতা উল্টে খুঁজতে হয় না, যে-কোনো পাতায় চোখ পড়ে যায়। যেমন কবিতায়, তেমনি গদ্যে।

১। "আমারে ডাকিয়াছিল আলেয়ার লাল মাঠ
শ্মশানের খেয়াঘাট আসি
কঙ্কালের রাশি
দাউ দাউ চিতা।"

২। "অরুন্তুদ আঁখি দুটি মেলি
গড়ি মোরা স্মৃতির শ্মশান।"

৩। "মাঝে মাঝে অনেক দূর থেকে
শ্মশানের চন্দনকাঠের চিতার গন্ধ
আগুনের ঘিয়ের ঘ্রাণ।"

৪। "যা জেনেছে যা শেখেনি
সেই মহাশ্মশানের গর্ভাঙ্কে ধূপের মতো জ্বলে
জাগে নাকি হে জীবন হে সাগর
শকুন ক্রান্তির কলরোলে।"

৫। "প্রতিভার দীর্ঘবাহু বাড়ায়ে দিয়েছে মেঠো
হাঁসের ডানায়, শস্যহীন খেতে
গফুরের শীর্ণ গোলাঘরে, শ্মশানে কবরে
আমাদের সবার হৃদয়ে।"

৬। "হৃদয়ে প্রেমের গান কখন যে শেষ হয়
চিতা শুধু পড়ে থাকে তার"

৭। "শ্মশানের দেশে তুমি আসিয়াছ—
বহুকাল গেয়ে গেছ গান।"

৮। "যেইখানে কস্তাপেড়ে শাড়ি পরে কোনো এক সুন্দরীর শব
চন্দনচিতায় চড়ে—"

তাঁর 'রূপসী বাংলা', যাকে বলতে পারি বাংলার স্তব, যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে আবহমান বাংলার প্রাণধ্বনি, সেই সবুজ-সুগন্ধের পথে-প্রান্তরে কত যে শ্মশান এবং চিতা রয়েছে ছড়িয়ে, সে-এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা।

১। "পৃথিবীর পথে ঘুরে বহুদিন অনেক বেদনা প্রাণে সয়ে
ধানসিঁড়িটির সাথে বাংলার শ্মশানের দিকে যাব বয়ে।"

২। "দেখিবে কখন কারা এসে আমকাঠে
সাজায়ে রেখেছে চিতা ;"

৩। "কবে যেন রাখিয়াছে হাতে
তার হাত—কবে যেন তারপর শ্মশান চিতায় তার হাড়
ঝরে গেছে, কবে যেন ;"

৪। "বঁইচি শেয়ালকাঁটা আমার এ দেহ ভালোবাসে,
নিবিড় হয়েছে তাই আমার চিতার ছাইয়ে—বাংলার ঘাসে।"

৫। "আবার যখন জাগি আমার শ্মশানচিতা বাংলার ঘাসে
ভরে আছে, চেয়ে দেখি—"

৬। "মাঝপথে জলের উচ্ছ্বাসে
বাধা পেয়ে নদীরা মজিয়া গেছে দিকে দিকে—শ্মশানের পাশে
আর তারা আসেনাকো—"

৭। "সাদা পথ—সোঁদা পথ—বাঁশের ঘোমটা মুখে বিধবার ছাঁদে
চলে গেছে—শ্মশানের পারে বুঝি ;"

এরই সঙ্গে মিশে রয়েছে মৃত্যু, ঝরে-যাওয়া, হারিয়ে-যাওয়া, চলে-যাওয়ার কথা। সেও বারংবার। তাঁর গল্পেও এই সবের প্রগাঢ় প্রতিচ্ছায়া। সেখানেও শ্মশান-চিতার লাল আগুন আর কালো ধোঁয়ার ছবি ফুটেছে অন্যভাবে, হয়তো আরও বাস্তব হতে গিয়ে আরো ভয়াবহরূপে।

" 'আঁতুড়ের মেয়েটিকে বাক্স করে শ্মশানে নেওয়া হয়েছিল ?'
'হ্যাঁ।'

'কি রকম বাক্স?'

'প্যাকিং বাক্স পাইন কাঠের।'

'ভেতরে আটকে নিলে? পেরেক ঠুকে?'

'তবে কি বাক্সের বাইরে লেপটে নেবে গঁদের আঠা দিয়ে লেবেল মেরে?'

'কী করলে তারপর?'

'শ্মশানে নিয়ে গেল'

'দাহ তো হয় না ছোটদের?'

'না।'

'না।'

'পুঁতে ফেললে তবে?'

'হ্যাঁ।'

তারপর কী হবে?'

'কিসের পরে?'

'আমি বলছি, মাটির নীচে কী হবে ওর?'

মাল্যবান এবার চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'ওসব কথা কেউ ভাবে না। হবেই একটা কিছু। শেয়ালে মাটি খুঁড়ে না খেলে পচে গলে যাবে—কৃমি হবে।' "

এই মৃত্যুর প্রসঙ্গ এইখানেই থামেনি। কথার টানে এগোতে এগোতে উৎপলা, মাল্যবানের স্ত্রী, প্রশ্ন তুলেছিল—

'আচ্ছা মরে যাওয়ার পর বড় বড় মেয়েদের মাটিতে পুঁতলে তারপর কী হয়?'

'মাটিতে পুঁতবে কেন? দাহ হয়।'

'না আমি বলছি যাদের ভেতর দাহ-টাহ করার চল নেই, তাদের কথা।'

'ও:', মাল্যবান একটু পুরুষচিল তীক্ষ্ণভাবে উৎপলার দিকে তাকাল।

'আমি শুনেছি, একজন খুব রূপসী কুড়ি একুশ বছর বয়সেই সুস্থ শরীরে হঠাৎ কেন যেন মারা গেল। বিকেলবেলাতে তাকে মাটি দেওয়া হল। তারপর সবাই চলে গেল যে-যার গাঁয়ে। সেখানে আট-দশ মাইলের মধ্যে জনমানব কেউ ছিল না। সন্ধ্যের পরেই একটা লোক এসে মাটি সরিয়ে সেই মড়াটাকে চুরি করে নিয়ে গেল। কেন নিল বলো তো?"

এরই কিছু পরে আবার ফিরে এসেছে মৃত্যুর কথা, মাল্যবানের আপিসের

কেরানী মনোমোহনবাবুর স্ত্রীর অসুখের প্রসঙ্গে। এরই কদিন পরে মারা গেল প্রতিবেশী ধীরেনবাবুর স্ত্রী, রমা। কান্নাকাটির শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে মাল্যবান বিছানার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে বাইরে, কম্বল গায়ে দিয়ে। তারপর ধীরেনবাবুর বাড়ির সদর দরজার কাছে চাক বাঁধা ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেল—একটি মেয়েমানুষের শব, পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের সুন্দর, শান্ত, নিরিবিলি একটা মুখ, কপাল আর চুল সিঁদুরে মাখামাখি। আর ঝোঁকের মাথায় মাল্যবানও সেদিন উৎপলার হাতে ঘরের চাবির গোছা তুলে দিয়ে, আপিস কামাইয়ের ঝুঁকি নিয়ে চলে গেল শ্মশানে মড়া পোড়াতে। তারপর—

"রমা মারা যাওয়ার পর থেকেই মাল্যবান মাঝে মাঝে কেমন সব মৃত্যু ও দাহের স্বপ্ন দেখত রাতের বেলা। একদিন সে দেখল, নিজে মরে গেছে, তাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল, সেখানে সে খুব অমায়িকভাবে সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে, সকলকে নমস্কার জানাচ্ছে, বিদায় নিচ্ছে, বলছে, আপনাদের সঙ্গে আর তো দেখা হবে না কোথায় যাই, কে জানে। ...কিন্তু, আরেক দিনের স্বপ্ন সব চেয়ে ব্যথা দিল তাকে। দেখল, উৎপলা মরে গেছে।... দেখা গেল উৎপলা মরে কাঠ হয়ে পড়ে রয়েছে—সমস্ত চুল এলোমেলো, কপালে মাথায় সিঁদুর থ্যাবড়া, পরনে আশ্চর্য—বিধবার থান।"

তার ছোট গল্প 'বিলাস'-এও এমনি করে মৃত্যুর স্বপ্ন দেখেছে শান্তিশেখর।

"দিন তিনেক পরে গভীর রাতে নিজের ঘরে শুয়ে থেকে শান্তিশেখরের মনে হল, এই রাত সব সময়েই দিনকে গুন করে রাত্রি হয়ে থাক—এই ঘুম মৃত্যু হোক।"

আর এই সব মৃত্যু এবং এই শ্মশানের পটভূমিকে সম্পূর্ণ করার জন্যেই তাঁর রচনায় একে একে আবির্ভূত হয়েছে ভূত প্রেত এবং ডাইনীরা। এসেছে হাড়-গোড়, মড়ার মাথার খুলির স্বাভাবিক উপকরণ। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা আর মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর বাস্তবতা বুঝি এদের তাণ্ডবকে বাদ দিয়ে পূর্ণতা পেতে পারে না কখনো, যেন হতে পারে না সময়ের বিশ্বস্ত দলিল, এই রকম একটা ধারণা যেন স্থির প্রত্যয়ের চেহারা নিতে চায় তাঁর কিছু কিছু কবিতা পড়ে।

১। "পৃথিবীর প্রেত চোখ বুঝি
সহসা উঠিল ভাসি তারকাদর্পণে মোর অপহৃত
আননের প্রতিবিম্ব খুঁজি।"

২। "মাইলের পরে আরো অন্ধকার ডাইনী মাইলের
পাড়ি দেওয়া পাখিদের মতো।"

৩। "ডাইনীর মাংসের মতন আজ তার
জঙ্ঘা আর স্তন।"

৪। "ডাইনীর মতো হাত তুলে তুলে
ভাঁট আঁশ শ্যাওড়ার বন
বাতাসে কি কথা কয় বুঝিনাকো।"

৫। "পাট শুধু পচে অবিরল
সেইখানে কলমীর দামে বেঁধে প্রেতিনীর
মতন কেবল
কাঁদিবে সে সারা রাত,"

৬। "বহু—বহুদিন আগে ; যেইখানে শঙ্খমালা কাঁথা বুনিয়াছে
সে কত শতাব্দী আগে মাছরাঙা ঝিলমিল ; কড়ি খেলাঘর ;
কোন যেন কুহকীর ঝাড়ফুঁকে ডুবে গেছে সব তারপর ;"

৭। "হয়তো বা মৃত্তিকার জ্যামিতিক ঢেউ আজ ?
জ্যামিতির ভূত বলে ! আমি তা জানি না।"

৮। "একবার চোখ ফেলে মেয়েটির দিকে
অনুভব করে নিলো এইখানে চায়ের আমেজে
নামায়েছে তারা এক শাঁখচুন্নীকে।"

৯। "হলদে পাতার মত আমাদের পথে ওড়াওড়ি।
কবরের থেকে শুধু আকাঙ্ক্ষার ভূত লয়ে খেলা।"

১০। "সকাল বেলার আলো ছিল যার সন্ধ্যের মতন
চকিত ভূতের মত নদী আর পাহাড়ের ধারে
ইশারায় ভূত ডেকে জীবনের সব আয়োজন—
আরম্ভ সে করেছিল !"

১১। "আবার পিপাসা সব ভূত হয়ে পৃথিবীর মাঠে
অথবা গ্রহের পরে—ছায়া হয়ে— ভূত হয়ে আসে।

তাঁর কবিতায় বাসিপাতা উড়ে আসে ভূতের মতন। মানুষেরা খেলা করতে থাকে হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষার ভূত নিয়ে। কখনো সমগ্র মানুষের পক্ষ থেকে

তিনি জানিয়ে দেন, 'আমরাও চলি-ফিরি ভূতের মতন'।

আর অবনীন্দ্রনাথে তো এদের অর্থাৎ এইসব অপদেবতাদের সোনার রাজ্যপাট। অবনীন্দ্রনাথের এই সব ভূত-প্রেত ব্রহ্মদৈত্যি-শাকচুন্নী যেন খুঁজে পেয়েছে উজ্জয়িনীর কিংবা বিদিশার মতো বিপুল এক রাজধানী, অন্ধকারের কালো কম্বল দিয়ে মোড়া। সেখানে তারা যখন খুশী নিজের মনে আসছে, যাচ্ছে, খাচ্ছে, দাচ্ছে, বেড়াচ্ছে। আর সেই তারাই যখন আমাদের চোখের সামনে এসে দাঁড়ায় আচমকা, সাদা বরফ হয়ে যায় বুকের লাল রক্ত।

"আঁধি ধাদি ভূত-পেত্নি ব্রহ্মদৈত্যি ঝাম-ঝামড়ি কন্ধকাটা শাঁকচুন্নী ডাকিনী যোগিনী, ভ্যাল ভেলকি, পেট-কামাড়ি সবাই আজ ভূতচতুর্দশীতে জটলা করতে বেরিয়েছে, আদাড়ে-পাদাড়ে রিদয়কে দেখে কেউ ঝম ঝম করে নাচতে লাগল, কেউ ফিকফিক করে হাসতে লাগল। খুস-খাস, খিটখাট আওয়াজ করে ভূতেরা কেউ খড়ম পায়ে, কেউ হাড় মড়মড় করে, কেউ বা ঘণ্টা বাজিয়ে কেউবা চটি চটপট করে তার সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে নামছে। ভয়ে রিদয়ের হাত-পা অবশ হয়ে এসেছে···।"

রিদয়কে 'বুড়ো আংলা' বানিয়ে এই যে তিনি সারা বাংলার আকাশ-বাতাস মাটি-জলে ঘোরালেন সব কিছু দেখিয়ে-চিনিয়ে দিতে, রিদয়ের সেই দেখাটিকে সম্পূর্ণ করার জন্যেই যেন এই সব অপদেবতাদের আমদানি। এদের বিকট ভৈরব আকৃতি-প্রকৃতিটার চাক্ষুষ পরিচয় না ঘটলে রিদয়ের বাংলা পরিক্রমা হয়ে যেতো বুঝি আধখানা।

রিদয় চলেছে গণেশ ঠাকুরের শয়ন ঘরে, পুরনো দরজা দিয়ে। লক্ষ্মী পেঁচা চলেছে আগে আগে পথ দেখিয়ে। তখনই চকা তাকে দিয়েছিল সাবধান করে—"এই ভূতচতুর্দশীতে রাত্রে পোড়োবাড়িতে একা এই অঙ্গুলিপ্রমাণ মানুষটি এসে নাটবাড়িতে মূষিকদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে হাড়গিলে বংশের সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধি করবেন। তুমি গেলে শাস্ত্রের কথা মিথ্যে হয়ে যায়। এই নাও শনিবার অমাবস্যাতে তোলা এই মানকচুর শিকড় সঙ্গে রাখ। ভূত পালাবে।"

এই বলে হাড়গিলে তার বাসার এক টুকরো ছেঁড়া মাদুর একটু ভেঙে মন্ত্র দিয়েছিল রিদয়ের কানে। রিদয় তার ঝাঁকড়া চুলের মধ্যে কচুর শিকড় গুঁজে ভয়ে ভয়ে হাঁটছিল সেই মন্তর আওড়াতে আওড়াতে হং সং বং লং হাঃ ফু!

এত মন্ত্র পড়েও নিস্তার পেল না রিদয়। দেখা হয়ে গেল ব্রহ্মদৈত্যের সঙ্গে। "দপ-দপ করে চারদিকে আলোয়-আলো এসে দেওয়ালীর পিদুম জ্বালিয়ে দিলে, আর ঘণ্টা নাড়তে নাড়তে ভয়ংকর এক কাপালিক দৈত্য মড়ার মাথার খুলিতে ঘিয়ের সলতে জ্বালিয়ে উপস্থিত—

গলে দোলে ভীষণ রুদ্রাক্ষ মালা

পিঙ্গল নয়নে যেন মহেশের কোপানল জ্বালা!

রিদয় দেখলে ঘরের মধ্যে কালো পাথরের প্রকাণ্ড এক মূর্তি তাতে কতকালের রক্তচন্দনের ছিটে, ভৈরবটির জিব লকলক করছে আর গায়ে সোনা-রূপো, হীরে-জহরৎ আর মুণ্ডুমালা ঝুলছে। ব্রহ্মদৈত্য আরতি আরম্ভ করলেন—

বম ঝম বম ঝম শব্দ উঠে

ভূত প্রেত পিশাচ দাঁড়ায় সবে জোড় করপুটে।

তাথিয়া তাথিয়া বাজায় তাল

তাতা থৈই থৈই বলে বেতাল।......"

অবশ্য অমন কাপালিক ব্রহ্মদৈত্যির মুখোমুখি হয়েও রিদয়ের ঘাড়ে ভয়াবহ কোন সমস্যার খাঁড়ার ঘা পড়েনি, এইটেই রক্ষে। হয়তো মানকচুর শিকড়টাই তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল সে-যাত্রা। হয়তো আরো একটা কারণ, এই সব ভূত-প্রেতের দল লেখকের বড় পরিচিত। বলতে গেলে বাল্যকালের আত্মীয়। সেই আত্মীয়তার সুবাদেই তাদের চলন-বলন যতটা ভয়াবহ, ততটা হিংস্র নয়।

ভূতপ্রেতের সঙ্গে আত্মীয়তা? শুনলে অট্টহাসিও হেসে উঠতে পারেন কেউ কেউ। কিন্তু তাঁর জীবনকাহিনীর সঙ্গে যাঁদের পরিচয়, তাদের পক্ষে অবশ্যই অবিশ্বাস্য নয় এই সত্য ঘটনা।

তাঁর 'আপন কথা'র পদ্মদাসী নামের অধ্যায়টিতে চোখ বুলোলেই বুঝতে পারা যাবে, এই সব অপদেবতারা তাঁর কতদিনের আপন জন কিংবা কতকালের হৃদ্যতা এদের সঙ্গে।

"দু নম্বর বাড়ির গায়ে তখনকার মিউনিসিপ্যালিটির দেওয়া একটা মিটমিটে তেলের বাতি জ্বলছে আর সেই আলো-আঁধারে পুরনো শিবমন্দিরটার দরজার সামনে দিয়ে একটা কন্ধকাটা দুই হাত মেলে শিকার খুঁজে খুঁজে চলেছে!

কন্ধকাটার বাসাটাও সেই সঙ্গে দেখা দিত—একটা মাটির তল বেয়ে ছু-নম্বর বাড়ির ময়লা জল পড়ে পড়ে খানিকটা দেওয়াল সোঁতা আর কালো, ঠিক তারই কাছে আধখানা ভাঙা কপাট চাপানো আড়াই হাত একটা ফোকরে তার বাস—দিনেও তার মধ্যে অন্ধকার জমা থাকে।"

"সব ভূতের মধ্যে ভীষণ ছিল এই কন্ধকাটা, যার পেটটা থেকে অন্ধকারে হাঁ করে আর ঢোক গেলে ; যার চোখ নেই অথচ মস্ত কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো হাত ছুটো যার পরিষ্কার দেখতে পায় শিকার। আর একটা ভয় আসতো সময়ে সময়ে, কিন্তু আসতো সে অকাতর ঘুমের মধ্যে—সে নামতো বিরাট আগুনের ভাঁটার মতো বাড়ির ছাদ ফুঁড়ে আস্তে আস্তে আমার বুকের উপর। যেন আমাকে চেপে মারবে—এইভাব—নামছে তো নামছেই গোলাটা, আমার দিকে এগিয়ে আসার তার বিরাম নেই। কখনো আসতো সেটা এগিয়ে জলন্ত একটা স্তনের মতো একেবারে মুখের কাছাকাছি, ঝাঁজ লাগতো মুখে চোখে। তারপর আস্তে আস্তে উঠে যেতো গোলাটা আমাকে ছেড়ে, হাঁফ ছেড়ে চেয়ে দেখতেম সকাল হয়েছে—কপাল গরম, জ্বর এসে গেছে আমার। দশ-বারো বছর পর্যন্ত এই উপগ্রহটা জ্বরের অগ্রদূত হয়ে এসে আমায় অসুস্থ করে যেতো। উপগ্রহকে ঠেকাবার উপায় ছিল না কোনো কিন্তু উপদেবতা আর কন্ধকাটার হাত থেকে বাঁচবার উপায় আবিষ্কার করে নিয়েছিলেম। লাল শালুর লেপ, তারই উপর মোড়া থাকতো পাতলা ওয়াড়, আমি তারই মধ্যে এক একদিন লুকিয়ে পড়তাম এমন যে, দাসী সকালে আমায় বিছানায় না-দেখে 'ছেলে কোথা গো' বলে শোরগোল বাধিয়ে দিতো!…"

ব্রহ্মদৈত্যি-র সঙ্গে আলাপ-পরিচয় সম্ভবত এর পরেই।

"রোজই নিশুতি রাতে মাথার উপরে পেতেম শুনতে হুটোপুটি করছে ছাতটা —ভাটা গড়গড় গড়াচ্ছে, দুমদুম লাফাচ্ছে। ছাতটা তখন ঠেকত ঠিক একটা অন্ধকার মহারণ্য বলে—যেখানে সন্ধ্যেবেলা গাছে গাছে ভোঁদড় করে লাফালাফি আর আকাশ থেকে জুঁইফুল টিকিতে বেঁধে ব্রহ্মদৈত্য থাকে এ-ছাত ও-ছাত পা মেলে দাঁড়িয়ে ধ্যান করে।"

পরে আর এক ব্রহ্মদৈত্যর বিবরণ শুনিয়ে গেছেন তিনি। সেটা ঠাকুরবাড়ির ধ্যানী ব্রহ্মদৈত্য নয়। রয়েড স্ট্রীটের।

"এই রয়েড স্ট্রীটের বাড়িতে একটা বেলগাছ ছিল, দাসীরা যেখানে,

সেখানেই ভূতের উপদ্রব হইবে এতো জানা কথা। একদিন রব উঠিল যে, ওই বেলগাছে ব্রহ্মদৈত্য আছে। অমনি সকলের বিশ্বাস হইল। রাত্রে কেহ খড়মের কেহ বেল পাড়ার, কেহ বা পূজার ঘণ্টার শব্দ শুনিতে পাইলেন। কেহ কেহ বা স্বচক্ষে সাদা কাপড়-পরা দৈত্য দেখিলে পাইলেন। আমরাও ওই সকল শুনিলাম এবং দেখিলাম আর ব্রহ্মদৈত্য নামে যে এক প্রকার ভূত আছে তাকে সেই সর্বপ্রথম জানিতে পারিলাম।"

ঠাকুরবাড়িতে ভূতের ঘরও ছিল একটা। সে মজার গল্পও শুনিয়ে গেছেন তিনি।

"আমাদের বাড়িতে এক ভূতের ঘর ছিল। এই ঘরে এক ভূত বাস করিত। এই ঘর তখন ভাণ্ডার ঘর ছিল। এই ঘরের একটি গরাদে দেওয়া জানালা ছিল। সেখানে সন্ধ্যার সময় গেলে আমরা জানালার ভিতর দিয়া গোঁফসমেত একটা কালো মুখ দেখিতে পাইতাম। কেবল সেই কালো মুখ—আর কিছু নয়। ঘরের ভিতরটা ঘোর অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না। এই মুখ আমাদের কত ভয় দেখাইত। তখন কে জানিত এই মুখ আমাদের শ্রীমান কালী ভাণ্ডারীর।"

এ তো হল তাঁর নিজের জীবনের ভূত-পেরেতের কথা। তাঁর সাহিত্যে, নিজের জীবনের এইসব অভিজ্ঞতাকেই সাজিয়ে-গুছিয়ে, আরো রঙীন এবং আরো ভয়ের কালো কালি মাখিয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়েছেন তিনি। আসল ভূতের চেয়ে তাঁর ভূতগুলো হয়ে উঠেছে তাই আরো গা-ছমছমে। আসল ভূতের চেয়ে তাঁর সাহিত্যে জন্ম নিয়েছে আরো অনেক নতুন নতুন ভূত। যেমন ঘোড়াভূত। কিংবা লণ্ঠনভূত।

জগদানন্দ রায় একবার ছুটে এসেছিলেন অবনীন্দ্রনাথের কাছে।

—ফটিং পাখিটা কি রকম দেখতে?

অবনীন্দ্রনাথ বললেন,

—কি করে জানবো, ওতো আমার গল্পের পাখি।

জগদানন্দ রায় হতবাক।

—সে কি? আমি যে আমার বইয়ে নাম তুলে দিয়েছি।

অবনীন্দ্রনাথ সান্ত্বনা জোগালেন

—তা থাক না। একদিন হয়তো ফটিং পাখি এসে যাবে দেখবেন।

ঐ ফটিং পাখির মতোই তাঁর ভূতেরাও তাঁর গল্পের ভূত।

'ভূত পতরীর দেশ'-এ যে ভূতের কাণ্ড, তার পিছনেও রয়ে গেছে তাঁর নিজের দেখা অভিজ্ঞতা। ভূত দেখেছিলেন পুরী থেকে কোনারক যাবার পথে। নিজেই বলেছেন—

" 'ভূত পতরী'তে আছে এই বর্ণনা। অন্ধকারে সমুদ্রের ধারে বালির উপর হাঁটতে যেমন ভূতুড়ে মনে হয়—মনসা গাছগুলিও কেমন যেন। সেইবারেই আমি ভূত দেখি।. সত্যিই।"

'জোড়াসাঁকোর ধারে'-য় রয়েছে সেই ভূতদর্শনের গায়ে-কাঁটা-দেওয়া ইতিবৃত্ত।

"নিমখিয়া নদী পেরিয়ে এলুম। শেষ রাত, চাঁদ অস্ত গেল, আবছা অন্ধকার, সকাল হতে আরো অনেকক্ষণ বাকি। সারা রাত ভয়ে জেগে কাটিয়ে এলুম, এবারে একটু ঘুমও পাচ্ছে। সে সময় ভূতের ভয়ও একবার জেগেছিল মনে। সামনের পালকিগুলো আর দেখা যাচ্ছে না। বেহারাদের ডেকে বলি, 'ও বেহারা, সব ঠিক আছে তো?'

'সব ঠিক আছে বাবু, সব ঠিক আছে।'

এমন সময় দেখি, একটা লোক, এক হাতে লাঠি এক হাতে লণ্ঠন, চলেছে আমার পালকির খোলা দরজার পাশে।

বলি, 'ও বেহারা, এ কে রে?'

'আঃ বাবু, ওদিকে দেখো না, ও সব দেউতা আছে।' বলে ওদিকের দরজা বন্ধ করে দিলে।

দেউতা বলে ওরা ভূতকে। বলি, ও কী, লণ্ঠন হাতে দেউতা কী করে? খানিকবাদে দেখি ঘোড়ায় চড়ে একটা সাহেব টুপি মাথায় পাশ কাটিয়ে গেল।

'বাবু তুমি শুয়ে পড়ো।' বলে শুধু বেহারারা!

শুনেছিলুম কোন এক মিলিটারিকে এখানে মেরে ফেলেছিল, ভূত হয়ে সে ফেরে, অনেকেই দেখে।

এইভাবে চলবার পর আবার একটা পালকি হু হু করে চলে গেল সামনে দিয়ে কোনারকের মন্দিরের দিকে, সঙ্গে আবার লণ্ঠন! ও কী পালকি ওদিকে কোথায় গেল? নেমে দেখলুম, আমাদের চারটে পালকি ঠিকই আছে। তবে ওটা কী?

বেহারারা ওই একই কথা বলে, 'দেখো না বাবু তুমি শুয়ে পড়ো।' কী দেখলুম তাহলে ওটা? মরীচিকা না কী কে জানে। তবে দেখেছিলুম

ঠিকই। সকাল হয়ে গেছে। ভয় নেই। মণিলালদের জিজ্ঞেস করলুম, 'দেখেছ কিছু?'

বললে, 'না।'

"ভুতুড়ে কাণ্ড দেখে কোনারকের মন্দিরে পৌঁছলুম।"

চোখের ঘুম-কাড়া নিজের এই অভিজ্ঞতাকেই আরেক রকমভাবে বুনলেন তাঁর 'ভূত পতরীর দেশ'-এ; আমাদেরও চোখের ঘুম নিবিয়ে দিতে। সে গল্পে ধপড়খাঁই পালকি চলেছে বনের ধার দিয়ে, মাসির ঘর ছাড়িয়ে, ভূত পতরীর মাঠ ভেঙে, পিসির বাড়িতে। পথে ভূতের ভয় বলেই মাসি হাতে তুলে দিয়েছে একগাছা ভূত পতরী লাঠি—ভূত তাড়াতে। তবু ভূত তাঁর সঙ্গ ছাড়ে না। আর এই সব ভূতেরাও কি সৌভাগ্যবান। এমন রূপকারের হাতের কালো রঙের কাজল মাখানো তারা যে, সেই কালো রঙটাই জ্বলে উঠল মানিকের মতো।

"এই শেওড়া-তলায় পালকি এসেছে কি আর যত ঝিঁ ঝিঁ পোকা তারা বলে উঠেছে—'চললে বাঁচি! চললে বাঁচি! কেন রে বাপু, একটু না হয় বসেছি, তাতে তোমাদের এত গায়ের জ্বালা কেন? 'চললে বাঁচি!' চলতে কি আর পারি রে বাপু? অমনি ঝিঁ ঝিঁ পোকার সর্দার দুই লম্বা ঠ্যাং নেড়ে বলছে—'ওই আসছে চিঁচি ঘোড়া চিঁচি। ফিরে দেখি গোরের ভিতর থেকে ঘোড়া-ভূত মুখ বার করে পালকির দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে। ওঠা রে পালকি, পালা রে পালা! আর পালা! ঘোড়া-ভূত তাড়া করেছে—ঘাড় বেঁকিয়ে, নাক ফুলিয়ে আগুনের মতো দুই চোখ পাকিয়ে।"

এরই একটু পরে—ভূতেরাই বয়ে নিয়ে চলেছে তাঁর পালকি।

"ভোর হয় দেখে ভূত-বেহারা চারটে ভয় পেয়েছে, কিন্তু রামচণ্ডীতলায় আমাকে পৌঁছে দিলেই তাদের ছুটি এই ভেবে তাদের একটু আহ্লাদও হয়েছে। চার ভূত চার সুরে চিঁ চিঁ পিঁ পিঁ খিটখিট, টিকটিক করে গান গাইতে গাইতে চলেছে—ঠিক যেন কত দূর থেকে চিল ডাকছে, আর কোলাব্যাঙ কটকট করছে। ঘুমের ঘোরে শুনেছি যেন 'কুহু ও কেকা'য় ঠিক সেই পালকির গানটা। কিন্তু কথাগুলো সব উলটো-পালটা আর সুরটাও বেখাপ্পা বেয়াড়া বেজায় ভুতুড়ে। কেবল হাড় খটখট দাঁত কিটমিট, গোঙানি আর কাতরানি শুনে যে গায়ে জ্বর এল!"

ভূতের ভয়ে যেমন তাঁর জ্বর আসতো গায়ে, তেমনি আবার সত্যিকারের জ্বর হলেও তিনি বলতেন, জ্বর-ভূত। তখন গুপ্তনিবাসে। জ্বর হচ্ছে রোজ অল্প অল্প। রাণী চন্দের ছেলে অভিজিৎকে তিনি লিখে পাঠাচ্ছেন—

"দাদা অভিজিৎ আমাকে ৯৯° ভূতে ধরেছে। মাঝে মাঝে পেটে ফুঁ-দিয়ে এমন পেট ফুলিয়ে দিচ্ছে যে, একেবারে হাঁস-ফাঁস করতে করতে পুকুর জলে সাঁতার কাটতে ইচ্ছে হয় হাঁসের মতো—সাঁতার জানি নে সে-কথা ভুলে যাই—দুষ্টুমি দেখো ভূতের। আমাকে ডুবিয়ে ছাড়বার ইচ্ছে।…"

তাঁর জ্বরের সঙ্গে ভূতের সম্পর্কটা যতই মজা করে বলেন না কেন তাঁর জীবনে একবার সত্যিকারের জ্বর এসেছিল মানুষের হাড়-কঙ্কাল আঁকতে গিয়ে, অর্থাৎ অ্যানাটমি স্টাডি করতে বসে। তখন তাঁর চলেছে ছবি আঁকার হাতেখড়ি পর্ব। গিলার্ডির কাছ থেকে প্যাসটেল আর তেলরঙের ছবি আঁকা শেখার ছ-মাসের পালা চুকিয়ে তখন তিনি পামার-এর ছাত্র। কিছুদিন শেখার পরে —"সাহেব বললেন, 'আমার যা শেখাবার তা আমি তোমায় শিখিয়ে দিয়েছি। এবারে তোমার অ্যানাটমি স্টাডি করা দরকার।' এই বলে একটা মড়ার মাথা আঁকতে দিলেন। সেটা দেখেই আমার মনে হল যেন কী একটা রোগের বীজ আমার দিকে হাওয়ায় ভেসে আসছে। সাহেবকে বললুম, 'আমার যেন কী রকম মনে হচ্ছে।' সাহেব বললেন, 'No, you must do it.—

'তোমাকে এটা করতেই হবে।' সারাক্ষণ গা ঘিন ঘিন করতে লাগল। কোনো রকমে শেষ করে দিয়ে যখন ফিরলুম ১০৬ ডিগ্রী জ্বর।

সন্ধ্যেবেলা জ্ঞান হতে দেখি ঘরের বাতিগুলো নিবন্ত প্রদীপের মতো মিট মিট করছে! মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছিল?' মাকে মড়ার মাথার ঘটনাটা বললুম। মা তখনকার মতো ছবি আঁকা বন্ধ করে দিলেন।"

মড়ার মাথার খুলি দেখলে যাঁর গা ঘিন ঘিন করে জ্বর আসে, যিনি তাঁর চিত্রকলায় লাবণ্যের পুরোহিত, 'ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ' রচনা করে যিনি আমাদের শেখাতে চেয়েছিলেন মানব-শরীরের কাঠামোর সৌন্দর্য, ভঙ্গীর সুষমা; সেই অবনীন্দ্রনাথই, কী আশ্চর্য বৈপরীত্য, যখন কথাশিল্পী তখন বিবর্ণ, বিকৃত মড়ার মাথার খুলি অথবা শুকনো হাড় কঙ্কালের ছবি এঁকেছেন বহুবার। জীবনের পক্ষে অপরিহার্য সামগ্রীরূপেই কাছে টেনেছেন তাদের, সরিয়ে রাখতে পারেননি তুচ্ছ অথবা ঘৃণ্য আবর্জনা ভেবে। যেখানে তিনি কথার কারিগর, সেখানে হাড়ের

মালা তাঁর কলমে ঝলসে উঠেছে সোনার হারের মতো।

"সিদ্ধার্থ সুখের স্বপ্ন থেকে যেন জেগে উঠলেন। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলেন, সব কটি তারার আলো যেন মরা মানুষের চোখের মতো ঘোলা হয়ে গেছে।"

২। "মন্তর পড়া মড়ার মুঠোর চাপে দুপুর রাতে মড়ার মতো ঘুমিয়ে আছে দুপুলিয়ার লোক। .....মড়ার হাতে চেরাগ প্রদীপ পগারপারে করল ঝিকমিক। অলি গলি চোর যায় চলি—মড়ার মুঠোয় চুলের মুলি।"

৩। "সেদিন ঘরে ফিরে সিদ্ধার্থ দেখলেন, তাঁর সোনার পুষ্পপাত্রে ফুটন্ত পদ্ম ফুলটির জায়গায় রয়েছে একমুঠো ছাই আর মরা মানুষের আধপোড়া একখানা বুকের হাড়।"

৪। "একটু আলো নেই একটু শব্দ নেই, সামনে কিছু দেখা যাচ্ছে না পিছনে কিছু সাড়া দিচ্ছে না, নীল অন্ধকারের ভিতর দিয়ে হাম্বির একা চলেছেন। একবার তাঁর পায়ে ঠেকে কী একটা গড়গড় করে গড়িয়ে গেল। হাম্বির সেটা হাতে তুলে নিয়ে দেখলেন, একটা মড়ার মাথা। কখনো তাঁর পায়ের চাপনে একখানা শুকনো মড়ার হাড় মড়-মড় করে গুঁড়িয়ে গেল।"

৫। "বাহিরে ঝড়-ঝাপটার মাতন ফুলবাগান দলে ফুলটুঙিতে।
ভিতরে ফিরছে ঘন ঘন কারণ মরা মানুষের মাথার খুলিতে।"

৬। "পাঁজরের যে-হাড়খানায় স্বপ্নের বাসা, সেই হাড়টা হাফেজের মতো কোনো মহাকবির অভিশাপে আমাদের আদিপুরুষের বুক থেকে খসে পড়েছিল, সেই থেকে বংশানুক্রমে আমরা ভয়ঙ্কর রকম কাজের মানুষ হয়ে জন্মাতে লাগলেম। বুকের ঐ হাড়, যেটাকে স্বপ্ন এসে বাঁশির মতো ফুঁ দিয়ে বাজিয়ে তোলে, সেটা আর আমাদের কারু মধ্যে গজাতে পেল না।"

৭। "খাজনা ঘরের পারে গন্না-কাটার মাঠ। তার একধারে খাড়া সামনা-সামনি দুটো ফাঁসিকাঠ—তাতে ঝুলছে একটা মড়া—কে জানে কোন কালে ফাঁসীতে চড়া—শুকিয়ে ফেলেছে সেটারে কত দিনের হিম জল রোদ।"

এই সঙ্গেই মনে পড়ে যায় তাঁর এক কবিতার কথা। 'ভূত চৌদশী'।

এই দীর্ঘ কবিতার সারা গায়ে এমন সব বিদঘুটে শব্দের বুনুনি যে ভূতুড়ে অন্ধকারে ভূতের শ্বাস-প্রশ্বাসও যেন ছুঁয়ে যায় গা। আরম্ভেই 'আঁচিল-পাঁচিল, ছিটকিনি-খিল খুটখাট'। তারপরে গোয়াল ঘরে গোভূতের নাক ঝাড়া।

তারপর ঘনিয়ে এল টুপ্ টাপ্ টিপ দেড় প্রহর রাত।

"রাত দেড়টায়
শ্মশানে শিংশদায়
ঝড়ে ঝাপটায়
বিক্রম রায়
গুড়গুম্ গুড়গুম্—তালে বেতালে ঝাড়ে কিল
হর্জা পোয়াতে ভাঙা দরজার কল-কব্জা শিথিল।
ঘরে ঢুকে পড়ে উইচিংড়া চামচিকার মিছিল।
খিচির মিচির শব্দে ঘর ভরে
ঝিলমিল—খড়খড়ে
নড়ে চড়ে, চলে—ঢিল পড়ে
না শিল পড়ে না কিল ?

'ভূত চৌদশী'-তে ভূত গৌণ। ভূতুড়ে পরিবেশটাই প্রধান। আর তারই জন্যে চারপাশে জড়ো করেছেন বিদ্ঘুটে, কিম্ভূতকিমাকার শব্দ সব। সট্পট্, শট্কট্, ঠকং ঠং ঠকং ঠং, কটাশ, চটাশ-চটাশ, দুম পটাস, কালো কিটকিট, তেল চিটচিট। শাঁখচিহ্নি কাপড় কাচছে। তার শব্দ, চিকচিকিনি, ঝিকঝিকিনি জলে, ছিপ্ ছিপ্ ছুপ্ ছাপ, ছুপ। ব্যাঙ ডাকে। তাঁর শব্দে, গুরু পাক গুরু পাক। মেঘ ডাকে, ধর ধর দুম ধর ধর যা। পড়তে পড়তে মনে হয় এই সব শব্দের আড়ালেই যেন লুকিয়ে আছে চতুর্দশীর ভূত। শব্দের দরজায় আর একটু জোরে জোরে ঠেলা দিলেই বেরিয়ে পড়বে তার হাড় মড় মড়, দাঁত কড়মড় আকৃতিটা।

অবনীন্দ্রনাথের ভূত-প্রেত আবহমানের কল্পনার চরিত্র। জীবনানন্দের ভূত-প্রেত কোনো অশরীরী অবয়ব নয়। আমাদের এই কালি-ঝুলি মাখা সময়েরই অঙ্গীভূত উপকরণ। তাই এই সব ভূত-প্রেত-শ্মশান, চিতা, চন্দনকাঠ, মড়ার মাথার খুলি ইতস্ততঃ ছড়ানো হাড়গোড় তাঁর কবিতার রূপ ও রহস্যের জগতে হয়ে উঠেছে এক অপরিহার্য সামগ্রী। এই বীভৎসতাকে তিনি এঁকেছেন বর্ণগন্ধ সহ, যাতে সভ্যতার ভিতরে শত শত শূকরের প্রসববেদনার ভয়ানক পরিস্থিতি-টাকে আমরা বুঝে অথবা চিনে নিতে পারি যথার্থ মনোযোগ দিয়ে। যাতে শিখে নিতে পারি কী ভাবে হাসবো অথবা ঘৃণা করবো বিশ্বসংসারের এই মূঢ়

অসঙ্গতির দৃশ্যে। আমাদের কানে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন ধ্বংসের এক নির্মম অট্টহাসি।

১। "যোদ্ধা জয়ী বিজয়ীর পাঁচ ফুট জমিনের কাছে—
পাশাপাশি
জিতিয়া রয়েছে আজ তাদের খুলির অট্টহাসি।"

২। "মানুষের হাড় খুলি মানুষের গণনার
সংখ্যাধীন নয়।"

৩। "মড়ার খুলির মত ধরে
আছাড় মারিতে চাই, জীবন্ত মাথার মত ঘোরে।"

৪। "যেখানে গাছের শাখা নড়ে
শীত রাতে
মড়ার হাতের সাদা হাড়ের মতন।"

৫। "আজকের পাড়াগাঁয়ে সেই সব ভাঁড়
যুবরাজ রাজাদের হাড়ে আজ তাহাদের হাড়।"

৬। "হাড়পাহাড়ের দিকে চেয়ে চেয়ে
হিম হয়ে গেছে তার স্তন।"

৭। "হো হো করে হেসে উঠলাম আমি।
চারিদিককার অট্টহাসির ভিতর
একটি বিরাট তিমির মৃতদেহ নিয়ে
অন্ধকার সমুদ্র স্ফীত হয়ে উঠল যেন ;
পৃথিবীর সমস্ত রূপ অমেয় তিমির"

৮। "মড়ার চোখের রঙে সকল পৃথিবী থাকে ভরে।"

৯। "প্রকৃতি ও পাখির শরীর ছুঁয়ে
মৃতোপম মানুষের হাড়ে।"

১০। "হে মৃত্যু,
তুমি আমাকে ছেড়ে চলেছো বলে
আমি খুব গভীর খুশি ?
কিন্তু আরো খানিকটা চেয়েছিলাম,
চারিদিকে তুমি হাড়ের পাহাড় বানিয়ে রেখেছো ;—"

১১। "হিমের হাওয়ার হাত তার হাড় করিছে আহত
সেও কি শাখার মত, পাতার মতন ঝরে যায়।"

কোনো এক লেখক বোদলেয়ারের প্রসঙ্গে বলেছিলেন, দান্তে পৌঁচেছিলেন নরকে আর বোদলেয়ার আসছেন সেই নরকের ভিতর থেকে। এই কথাটার আদলে আমরাও বলতে পারি, অনেক লেখক পৌঁচেছেন বাংলার বুকের কাছে, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ এবং জীবনানন্দ এসেছেন বাংলার বুকের ভিতর থেকে, হাজার বছর ধরে, হেঁটে হেঁটে, দেখে দেখে, সৌন্দর্যের সিঁদুর আর ধ্বংসের কাজল দুটোকেই দুই হাতে মেখে মেখে। বাংলার হৃৎপিণ্ডের কোনো অন্ধকার কোণে জ্বলছে কোনো ব্যর্থতার চিতা, কোনো বেদনা সাজিয়ে রেখেছে কী রকম শ্মশান, কোথায় ছড়িয়ে আছে অসুস্থ অসার্থকতার ক-খানা হাড়-কংকাল, সমস্তই ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখেছেন তাঁরা, দেখতে গিয়ে তাঁদের সৌন্দর্যলোভাতুর চোখে দুর্দিন-দুঃসময়ের ধোঁয়া এবং ধুলোর ঝাপটা লেগেছে, চোখের কোণায় ঠেলে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে বিষণ্ণ অশ্রুর ফোঁটা, তবুও। আরও তাঁদের এই নিখুঁত দেখার মধ্যে দিয়েই আমরা চিনে নিতে পেরেছি আমাদের সেই বাংলাকে, যে রূপসী কিন্তু বিধবার মতো বেদনাতুর।

"বাংলার লক্ষ গ্রাম রাত্রি একদিন
আলপনার, পটের ছবির মতো সুহাস্যা পটলচেরা চোখের মানুষী
হতে পেরেছিল প্রায় ; নিভে গেছে সব।"

কবি এবং শিল্পীদের, আসলে সব সৃষ্টিশীল মানুষেরই, এ এক যন্ত্রণা-দীর্ণ দায় যে তাঁদের দেখাতে হবে জীবনের অথবা সময়ের দুটো পিঠই, যে দিকে সুন্দর সুস্থির এবং সত্য আবার যে দিকে অসুন্দর এবং সাময়িক সত্য। তাঁদের চোখকে হতে হবে বর্মভেদী রঞ্জনরশ্মির মতো। বাস্তবের উপরতল ভেদ করে তাঁদের দৃষ্টিকে চলে যেতে হবে আরও মর্মান্তিক অভ্যন্তরে, সুন্দরের গায়ে যেখানে লেগে রয়েছে অসুন্দর, লেগে থেকে ক্রমাগত আবৃত-আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাইছে সুন্দরের হিরণ্ময় রূপ। আর তারই ফলে তাঁদের রচনা এক এক সময় আমাদের সামনে উন্মোচিত করে দেয় বিরূপ, কদর্য, কুৎসিত, কর্কশ, গা গুলিয়ে ওঠার, চোখ বুজিয়ে ফেলার, ঘৃণায় সিঁটকে ওঠার, বিদ্রূপে ঝলসে ওঠার সেই সব উপকরণ, যা আমাদেরই জীবন অথবা সময়েরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর এই ভাবেই তাঁরা জানিয়ে দেন সময়ের কতটুকু সজীব আর কতখানি ধ্বংসস্তূপ,

সৌন্দর্যের কতখানি এখনও আমাদের হৃদয়ের পক্ষে স্বাস্থ্যকর আর কতখানি শ্মশানে-পোড়া হাড়-কংকাল হয়ে গেছে বলে বর্জনীয়। জানিয়ে দেন 'পৃথিবীর গভীর গভীর অসুখ এখন' আর সে অসুখের উৎস-উৎপত্তির মূলে কোন ধরনের ক্ষয়-ক্ষতি-ক্ষত।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চির শান-দেওয়া ছুরি যেদিন মানুষের রক্তগ্রন্থী ভেদ করে নেমে গিয়েছিল আরও ভিতরের অস্থি-পঞ্জরের দিকে, একটি অখণ্ড শরীরকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে মাংস থেকে হাড়কে ছিঁড়ে নিয়ে নিয়ে আলাদা করেছিলেন তিনি, সেটা কোনো হিংস্র অত্যাচারের সুখ মেটানো রিরংসা নয়। সেও এক সত্যানুসন্ধান। মানুষের শরীরের অজ্ঞাত ভূখণ্ডকে আবিষ্কার। মানুষের শরীরের অস্থি-মজ্জার এ্যানাটমি, জোড়-বিজোড়, আয়তন অবস্থানকে নিখুঁত এবং বিশদরূপে জেনে, মানুষেরই আরও সুসংবদ্ধ, সুস্থির এবং শৃঙ্খলাময় অবয়ব গড়ে তোলার জন্যেই ছিল সেই দীর্ণ-বিদীর্ণ অন্বেষণ।

ঐ রকম হাড়-কংকালের এ্যানাটমি রয়ে গেছে আমাদের জীবন-যাপনের কাঠামোয়, সময়-প্রতিমার শরীরে, প্রাকৃতিক-নিখিলে।

অভিসারিকা

[illegible]
[illegible] — [illegible]
আমি যে দেখিতে চাই; — সে আকাশ পাখনায় নিঙড়ায়ে লয়ে
কোথায় ভোরের বক মাছরাঙা উড়ে যায় আশ্বিনের মাসে
আমি যে দেখিতে চাই — আমি যে বসিতে চাই বাংলার ঘাসে
পৃথিবীর পথ ঘুরে বহুদিন অনেক বেদনা প্রাণে সয়ে
ধানসিড়িটির সাথে বাংলার শ্মশানের দিকে যাব ব'য়ে
যেইখানে এলোচুলে রামপ্রসাদের সেই শ্যামা আজো আসে
যেইখানে কল্কাপেড়ে শাড়ি প'রে কোনো এক সুন্দরীর শব
চন্দন চিতায় চড়ে — আমের শাখায় শুক ভুলে যায় কথা
যেইখানে সব চেয়ে বেশী রূপ — সব চেয়ে গাঢ় বিষণ্ণতা
যেখানে শুকায় পদ্ম — বহুদিন বিশালাক্ষী যেখানে নীরব
যেইখানে একদিন শঙ্খমালা চন্দ্রমালা মানিকমালার
কাঁকন বাজিত, আহা, কোনোদিন বাজিবে কি আর!

মুক্তোর মতো অশ্রু

কবে আমরা এমন প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখেছি যার গায়ে রক্তের আঁচড় কাটেনি ট্রাজেডীর নখ? অথচ আশ্চর্য এমন প্রেমকে, অথবা প্রেমকে এমন রক্তাতুর জেনেও তাকে ধুলোর মতো ঝেঁটিয়ে, ধোঁয়ার মতো উড়িয়ে দেবার কোনো আন্দোলন দেখা দেয়নি কোনদিন, কোনখানে। এখনো শিল্পে, সাহিত্যে, কবিতায়, প্রেমের কাছ থেকে বিদায় নেবার বদলে দেখতে পাই তারই দিকে অরণ্যের ডালপালার মতো ছড়িয়ে আছে আমাদের অস্থির আলিঙ্গন। আছে, থাকে, হয়তো থাকবেও নিরবধিকাল।

"তোমার নিকট থেকে সর্বদাই বিদায়ের কথা ছিল
সবচেয়ে আগে; জানি আমি।"

তাঁর 'সূর্য নক্ষত্র নারী' নামের কবিতার মাত্র একটি স্তবক পার হবার আগেই তাঁর সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি খঞ্জনী বাজিয়ে যায় আমাদের কানে—

"তবুও জীবন ছুঁয়ে গেলে তুমি ;—

আমার চোখের থেকে নিমেষনিহত
সূর্যকে সরায়ে দিয়ে।”

কেন আমাদের জীবনে অথবা সাহিত্যে প্রেম হয়ে গেল এমন অন্তহীন বিদায়হীন দীর্ঘায়ু রাত্রির মতো? এর উত্তর সম্ভবত একাধিক। তবু এই মুহূর্তে একটি উত্তরই মনে পড়ছে।

“The most tragic thing in the world and in life, readers and brothers of mine, is love…it is the sole medicine against death”.

উপরের কথাগুলো দার্শনিক উনামুনোর। তাঁর ‘প্রেম, যন্ত্রণা, করুণা, ব্যক্তিত্ব’ নামের প্রবন্ধ আরম্ভ হয়েছিল এই অমর উক্তি দিয়ে।

পাঠক নিশ্চয়ই এতক্ষণে অনুমান করে নিয়েছেন আমার বর্তমান অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়, প্রেম। এবং সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠেছেন নামটা শুনে। প্রেম? অর্থাৎ নারীর জন্যে পুরুষের অথবা পুরুষের জন্যে নারীর অস্তিত্বের পঞ্চপ্রদীপের আরতি?

আপনার চমকে ওঠার কারণটা আমি জানি। আপনি চমকে উঠেছেন জীবনানন্দের কথা ভেবে নয়। কারণ জীবনানন্দে প্রচুর প্রেম। অজস্র নারী। অজস্র তাদের নাম—বনলতা সেন, সুরঞ্জনা, শ্যামলী, সুচেতনা, সবিতা, শ্যামলী, মৃণালিনী ঘোষাল, অরুণিমা সান্যাল, সুদর্শনা, শঙ্খমালা, হয়তো আরো কিছু। ঝাউ, নিম, নাগকেশরের বনের পাশ দিয়ে, ছায়া মাড়িয়ে, এলোমেলো অঘ্রানের শুকনো খড়ের উপর দিয়ে, শিশিরে পা ভিজিয়ে, দূর প্রান্তরের ঘাসের দিকে অবিরল হাঁটাহাঁটি করেছেন এই সব নারীদের সঙ্গে, ভালোবাসা ছড়াতে ছড়াতে, ভালোবাসার জোয়ার-ভাঁটায় দীর্ণ-বিদীর্ণ অথবা প্রতিভার মতো উজ্জ্বল হতে হতে। সত্যিই ভালোবাসা ভোরের শিউলী ফুলের মতো ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর কবিতার বাগানের গাছতলায় গাছতলায়; অফুরন্ত। কিন্তু যেখানে অবনীন্দ্রনাথও আলোচনার অন্তর্গত, সেখানে স্ত্রী-পুরুষের মিলন অথবা প্রেমের প্রসঙ্গ আসে কেমন করে? অবনীন্দ্রনাথ, যাঁকে আমরা জানি প্রধানত শিশু সাহিত্যিক হিসেবে, তিনি কী করে অঙ্গীভূত হবেন এমন বয়স্ক-বিষয়ের আলোচনায়?

পাঠক, আপনার মতো আমিও চমকে উঠেছিলাম, বুদ্ধদেব বসুর ‘বাংলা শিশুসাহিত্য’ নামের বিখ্যাত প্রবন্ধটির মাঝখানে পৌঁছে। কিন্তু প্রথম বিস্ময়ের

ধাক্কা সামলে, তাঁর বিশ্লেষণের খোলা দরজা পেরিয়ে খানিকটা ভিতরে এগোনোর পর স্বীকার করতে আর দ্বিধা রইল না যে, শিশু সাহিত্যকে অবনীন্দ্রনাথ উত্তীর্ণ করে দিয়ে গেছেন বিষয় অথবা বয়সের সমস্ত সীমারেখার ওপারে এমন এক দিগন্তে, যেখানে জীবনের সমস্ত কথাই সমান সুন্দর, সমান নির্ভার, সমান সম্মান সমাদরের।

"স্ত্রী-পুরুষের মিলনের কথা শুধু 'আলোর ফুলকি'তে নয়, বারে বারেই দেখা দেয় তাঁর লেখায়, দেখা দেয় অনিবার্যভাবেই। সৃষ্টির এই মূল সূত্রটিকে দূরে রাখলে কিছুতেই তাঁর কাজ চলতো না। শিশু সাহিত্যে নিষিদ্ধ এই বিষয়টিকে তিনি 'গৃহীত' বলে ধরে নিয়ে নিঃশব্দ থাকেননি, কিংবা শুধু ভাবের দিক থেকেই দেখেননি তাকে, রীতিমতো তার ছবিও দিয়েছেন—সে ছবি যেমন বাস্তব, তেমনিই বস্তুভারহীন। মনে করা যাক, 'বুড়ো আংলা'র সেই অর্থময় দৃশ্যটি যেখানে খোঁড়া হাঁসের সঙ্গে সুন্দরী বালি হাঁসটির দেখা হবার পর, ওরা দুজনে 'জলে গিয়ে সাঁতার আরম্ভ করলে আর একলা রিদয় পাড়ে বসে বেনার শিষ চিবোতে লাগল', কিংবা 'কোটি কোটি আগুনের সমান' সূর্যদেবের আলো ক্রমশ ক্ষীণ হতে হতে শুধু একটুখানি রাঙা আভা হয়ে 'সধবার সিঁদুরের মতো' সুভাগার বিধবা সিঁথি 'আলো করে রইলো', আর তার পরেই মানবীর কোলে জন্ম নিলো দেবতার সন্তান। এই প্রতীকচিত্র অবনীন্দ্রনাথ এঁকেছেন—আইনমাফিক শিশু সাহিত্যের সীমার মধ্যে থাকার জন্যে নয়—তাঁর মনের ভাষাটাই ঐরকম ছিলো বলে।"

বুদ্ধদেব বসু

অবনীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা, অথবা প্রথম বাংলা বই, শকুন্তলা। তাঁর রবিকাকার প্রেরণায় লেখা। তাঁর সেই প্রথম গদ্যরচনার মূল বিষয়টা কি? খুব সহজ ভাষায়, মিলন ও বিরহ। সে-লেখায়, শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্মন্তর দেখা হওয়ার আগে, শকুন্তলার রূপের বর্ণনা দিলেন না তিনি। তার বদলে, মাধবীলতার প্রতীক খাড়া করে আমাদের জানিয়ে দিলেন—

"সেই কুসুমবনে দেখতে দেখতে প্রিয় মাধবীলতার সর্বাঙ্গ ফুলে ভরে উঠল। আজ সখীর বর আসবে বলে চঞ্চল হরিণীর মতো চঞ্চল অনসূয়া আরো চঞ্চল হয়ে উঠল।"

দুষ্মন্তের জন্যে শকুন্তলার অথবা শকুন্তলার জন্যে দুষ্মন্তের বিরহ-বেদনা বিষয় হিসেবে বয়স্কোচিত। অবনীন্দ্রনাথ সেটাকে সহজ করে দিলেন এমন ভাষায়, যা

পড়ে শিশুরা মজবে রূপকথার স্বাদে-গন্ধে, আর বড়রা এরই মধ্যে খুঁজে পাবে বড়ো কিছুর ইসারা। এ যেন সাহিত্যের মাটিতে সাদা রঙের আলপনা। ভারী বিষয়ও যেখানে জলের মতো নরম দুটি-একটি সংক্ষিপ্ত সরল টানে প্রতীকতায় উত্তীর্ণ।

'আলোর ফুলকি'তে কুঁকড়োর চার রঙের চার বউ। তাদের অঙ্গে অঙ্গে যে রূপের কিংবা সাজসজ্জার অনটন ছিল, এমন কথা কোথাও লেখেননি তাদের রচয়িতা। অথচ 'আলোর ফুলকি'তে কোথাও নেই তারা কুঁকড়োর অন্তরঙ্গ সহচরী রূপে। উপাখ্যানের গোড়ার কয়েকটা পাতার পরেই হঠাৎ একদিন বন থেকে বন্দুকের তাড়া খাওয়া বন-মুরগি সোনালিয়া এসে আছড়ে পড়ল কুঁকড়োর পায়ের কাছে। আর সেই থেকে ঐ সোনালিয়াই হয়ে উঠল কুঁকড়োর আজীবনের সহচরী। আর এই সোনালিয়ার আবির্ভাবের ঠিক আগের মুহূর্তে জিম্মার জবানীতে লেখক আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন কুঁকড়োর প্রেমপরায়ণ স্বভাবটা। জিম্মা বলেছিল—

" 'নতুন মুরগি'র দেখা পেলে মশায়ের মাথাটা সহজেই ঘুরে যায় এখনো।" জিম্মা মিথ্যে বলেনি। সোনালিয়াকে হঠাৎ পেয়ে গিয়ে পাহাড়তলির কুঁকড়োর পুরনো শরীরে ফিরে এল নতুন যৌবন। চোখে লাগল নতুন মায়া। কুঁকড়োর চোখ দিয়ে আমরা যে সোনালিয়াকে দেখতে পেলুম, সে রামধনুকের মতো বর্ণোজ্জ্বল। সে 'পাতার সবুজ, ফুলের গোলাপি, সোনার জল আর সন্ধ্যেবেলার আলো দিয়ে গড়া'। তার পরণে বাসন্তী রঙের শাড়ি। তার গায়ে টুকটুকে লাল সাটিনের কাঁচুলি।

সোনালিয়ার ঝকঝকে রূপের দিকে তাকিয়ে কুঁকড়োর প্রশ্ন—

"সূর্যের আলোর মতো কোন্ পুব-আকাশের সোনার পুরী থেকে তুমি এলে সোনালিয়া বনমুরগী ?"

সোনালিয়া উত্তরে জানালো—

"শুনেছি বরফের পাহাড়ের ওপারে যে-দেশ, সেখানকার মাটি ফুলকাটা গালচেতে একেবারে ঢাকা, সেইখানের কোন অশোকবনের রানীর মেয়ে আমি।

···নন্দনকাননে আনন্দে ঘুরে বেড়াতেই আমি জন্মেছি, ডালকুত্তার তাড়া খেয়ে ছুটোছুটি করে মরতে তো নয়। আহা, সেখানকার সূর্যের লাল আভা রক্ত চন্দন আর কুসুম-ফুলের রঙে মিশিয়ে বুকে মেখে রেখেছি। এই দেখো।"

সোনালিয়া কুঁকড়োকে দেখায় তার বুকের কুসুম-ফুলের রঙ। দেখে বয়স্ক কুঁকড়ো নবীন যুবকের মতো নাচতে থাকে সোনালিয়ার চারপাশে ডানা কাঁপিয়ে। সোনালিয়াকে আদর করে নতুন নাম দিয়ে ডাকে—মনো মোনালিয়া বিদেশিনী বনের টিয়া!

আর সেই মুহূর্তে সোনালিয়ার মধ্যে জেগে ওঠে চিরকালের রূপসী নারীর অহংকার। কুঁকড়োর চোখ থেকে সোহাগের স্বাদ পেয়ে সে বলে ওঠে—'ইস্'।

"কুঁকড়ো একটু থতোমতো খেয়ে গেলেন। বুঝলেন সোনালিয়া সহজে ভোলবার পাত্রী নয়। যে কুঁকড়ো তাদের দিকে একটিবার ঘাড় হেলালে সাদি কালি গোলাপি গুলজারি সব মুরগিই আকাশের চাঁদ হাতে পেল মনে করে, সেই জগৎবিখ্যাত কুঁকড়োকে সোনালি মুখের সামনে শুনিয়ে দিলে যে জগতের সবাই যাকে ভালবাসে এমন কুঁকড়োয় তার দরকার নেই। সে বেছে বেছে সেই কুঁকড়োকে বিয়ে করবে যার নাম-যশ কিছুই থাকবে না; থাকবার মধ্যে থাকবে যার মন মনালিয়া বনের টিয়া একমাত্র মুরগি।"

এই মান-অভিমানের অন্ধকার পটভূমিকায় কুঁকড়োর জীবনের পিলসুজে ধীরে ধীরে জলে উঠল সোনালিয়ার প্রেমের প্রদীপখানা। তারপর থেকে কাহিনী যত এগোতে থাকে, ততই আমরা দেখতে পাই কুঁকড়ো আর সোনালিয়া সর্বক্ষণ রোদ ও জলের মতো মিলেমিশে একাকার। কুঁকড়োর জীবনের সবচেয়ে গভীর কথা, সবচেয়ে মহত্তম বাণীগুলোর সাক্ষী এবং শ্রোতা শুধু সোনালিয়াই। সোনালিয়াকে পাওয়ার পর থেকে কুঁকড়ো হয়ে উঠেছে আলোর কবি। আর সোনালিয়ার জীবনেও তখন কুঁকড়োর জন্যে আসন পাতা হয়ে গেছে চিরকালের, সোনালী সুতোয় বোনা।

'আলোর ফুলকি' যখন শেষ হয়, তখন দেখি কুঁকড়ো আর সোনালিয়া একই সঙ্গে গ্রেপ্তার হল কুঁকড়োর মনিবের হাতে। সোনালিয়ার কাছে এই গ্রেপ্তার যেন আশীর্বাদ। আর গ্রেপ্তার হয়ে কুঁকড়ো আর সোনালিয়া যখন ঢুকে গেল তাদের গোলাবাড়ির বাসরঘরে, বাইরের বনে বসন্ত বাউড়ি তখন সারা পাহাড়-তলিটাকে মাতিয়ে সুর করে গেয়ে চলেছে—বউ কথা কও, বউ কথা কও।

কুঁকড়ো আর সোনালিয়ার মতো এমন অপূর্ব গড়নের প্রেমময় নর-নারী বাংলার বয়স্ক সাহিত্য হাতড়ালেও মিলবে কিনা সন্দেহ।

প্রেম-এর প্রসঙ্গ তাঁর 'রাজকাহিনী'তেও।

"রানা ভীম আলিপো দেশের প্রকাণ্ড একখানা আয়নার সম্মুখ থেকে একটা পর্দা সরিয়ে দিলেন। কাকচক্ষু জলের মতো নির্মল সেই আয়নার ভিতর পদ্মিনীর রূপের ছটা, হাজার-হাজার বাতির আলো যেন আলোময় করে প্রকাশ হল! বাদশা দেখতে লাগলেন সে কী কালো চোখ! সে কী টানা ভুরু! পদ্মের মৃণালের মতো কেমন কোমল দুটি হাত! বাঁকা মল-পরা কী সুন্দর দুখানি রাঙা পা। ধানী রঙের পেশোয়াজে মুক্তোর ফুল, গোলাপী ওড়নায় সোনার পাড়, পান্নার চুড়ি, নীলার আংটি, হীরের চিক! বাদশা আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলেন, একি মানুষ না পরী? আলাউদ্দীন আর স্থির থাকতে পারলেন না; তিনি মসনদ ছেড়ে সেই প্রকাণ্ড আয়নার ভিতর ছায়া-পদ্মিনীকে ধরবার জন্যে দুহাত বাড়িয়ে ছুটে চললেন, গ্রহণের রাত্রে রাহু যেমন চাঁদকে গ্রাস করতে চায়।"

প্রেম-ভালোবাসার আরো অনেক টুকরো ছবি অবনীন্দ্রনাথের রচনায় গায়ে গায়ে ফুটে রয়েছে, যেন রঙীন সুতোয় বোনা শালকরের ছোট ছোট ফুলকারির নকশা।

১। "জোছনা রাতে মন্দিরের সামনে শ্বেতপাথরের বেদীতে বসে সোনা আর হীরে জড়ানো সাজে সেজে মীরা স্বর্গের অপ্সরীর মতো দেবতার সামনে একলা নাচছেন, গাইছেন, রানা বীণা বাজাচ্ছেন, বাইরে লোকের ভীড়, এমন সময় আকাশ থেকে তারার মালার মতো একগাছি হীরের হার মীরার গলায় এসে পড়ল। রানা চমকে উঠে বীণা বন্ধ করলেন। মীরা সেই অমূল্য হার নিজের গলা থেকে খুলে মন্দিরের মধ্যে বংশীধারী রণ্-ছোড়জীর গলায় পরিয়ে দিয়ে সে-রাতের মতো গান বন্ধ করলেন।

২। "তখন সন্ধে হয়ে আসছে। আকাশে একটি মাত্র তারা; আর দূরে ঝলোয়ানের বাগানের মধ্যে পাথরের রাজপ্রাসাদের উপরে একটি ঘরে একটি আলো জলজল করে জানাচ্ছে মন্দুরের রাজকুমারের উপরে ঝলকুমারীর জলন্ত ভালবাসা।"

৩। "আলাউদ্দীন শিবিরের এক কোণে বালির ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলেন, আধ ঘণ্টা হয়ে গেছে। এইবার পদ্মিনীর সঙ্গে দেখা হবে। বাদশা সাজগোজ করবার জন্য অন্য এক শিবিরে উঠে গেলেন। সেখানে আতর গোলাপ, হীরে-

জহরতের ছড়াছড়ি—কোথাও সোনার আতরদানে হাজার টাকা ভরি গোলাপী আতর, কোথাও মুক্তোর তাজ, পান্নার শিরপ্যাচ, কৌটোভরা মাণিকের আংটি, আলনায় সাজানো কিংখাবের জামাজোড়া রেশমী রুমাল, জরির লপেটো।”

৪। “বাপ্পা সজল নয়নে মেঘের দিকে চেয়ে চেয়ে বাঁশের বাঁশিতে ভীলের গান বাজাতে লাগলেন—বাঁশির করুণ সুর কেঁদে কেঁদে, কেঁপে কেঁপে বন থেকে বনে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

“সেই বনের একধারে আজ ঝুলন-পূর্ণিমায় আনন্দের দিনে শোলাঙ্কি বংশের রাজার মেয়ে সখীদের নিয়ে খেলে বেড়াচ্ছিলেন। রাজকুমারী বললেন—‘শুনেছিস ভাই বনের ভিতর রাখাল রাজা বাঁশী বাজাচ্ছে’। সখীরা বললে—‘আয় ভাই, সকলে মিলে চাঁপা গাছে দোলা খাটিয়ে ঝুলন-খেলা খেলি আয়।’ কিন্তু দোলা খাটাবার দড়ি নেই যে! সেই বৃন্দাবনের মতো গহন বন, সেই বাদল দিনের গুরু গর্জন, সেই দূর বনে রাখালরাজার মধুর বাঁশী, সেই সখীদের মাঝে শ্রীরাধার সামনে রূপবতী রাজনন্দিনী, সবই আজ যুগ-যুগান্তরের আগেকার বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-রাধার প্রথম ঝুলনের মতো! এমন দিন কি ঝুলনা বাঁধার একগাছি দড়ির অভাবে বৃথা যাবে? রাজনন্দিনী গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন। আবার সেই বাঁশী, পাখির গানের মতো, বনের এপার থেকে ওপার আনন্দের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে বেজে উঠল। রাজকুমারী তখন হীরে জড়ানো হাতের বালা সখীদের হাতে দিয়ে বললেন ‘যা ভাই এই বালার বদলে ঐ রাখালের কাছ থেকে একগাছা দড়ি নিয়ে আয়।’

“রাজকুমারীর সখী সেই বালা-হাতে বাপ্পার কাছে এসে বললে—‘এই বালার বদলে রাজকুমারীকে একগাছা দড়ি দিতে পার?’ হাসতে হাসতে বাপ্পা বললেন—‘পারি, যদি রাজকুমারী আমায় বিয়ে করে।’

“সেই দিন, সেই নির্জন বনে, রাজকুমারীর হাতে সেই হীরের বালা পরিয়ে দিয়ে রাজকুমার বাপ্পা চাঁপাগাছে ঝুলনা বেঁধে নিয়ে রাজকন্যার হাত ধরে বসলেন। চারিদিকে যত সখী দোলার উপরে বর-কনেকে ঘিরে ঘিরে ঝুলনের গান গেয়ে ফিরতে লাগল—‘আজ কী আনন্দ! আজ কী আনন্দ!’ খেলা শেষ হল, সন্ধ্যা হল, রাজকুমারী বনের রাখালকে বিয়ে করে রাজবাড়িতে ফিরে গেলেন; আর বাপ্পা ফুলে-ফুলে প্রফুল্ল চাঁপার তলায় বসে ঝুলন পূর্ণিমার প্রকাণ্ড চাঁদের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলেন—আজ কী আনন্দ। আজ কী আনন্দ!”

৫। "বাপ্পা যখন সমস্ত দিন যুদ্ধের পর শ্রান্ত হয়ে নিজের শিবিরে বসে থাকতেন, যখন নিস্তব্ধ যুদ্ধক্ষেত্র কোনো দিন পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় আলোময় হয়ে যেত, তখন বাপ্পার সেই ঝুলন পূর্ণিমার রাত্রে চাঁপাগাছের ঝুলনায় শোলাঙ্কি রাজকুমারীর হাসিমুখ মনে পড়ত ; যখন কোনো নতুন দেশ জয় করে বাপ্পা সেখানকার নতুন রাজপ্রাসাদে সোনার পালঙ্কে নহবতের মধুর স্বর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তেন, তখন সেই পূর্ণিমার রাতে চাঁপাগাছের চারিদিক ঘিরে ঘিরে রাজকুমারীর সখীদের সেই ঝুলন-গান স্বপ্নের সঙ্গে বাপ্পার প্রাণে ডেকে আসত।"

আবার এই অবনীন্দ্রনাথই যখন সৌন্দর্যের ছবি আঁকতে গিয়ে আঁকেন ভয়াবহতার ছবি অথবা সৌন্দর্যের সঙ্গে মেশান বীভৎসতার প্রতীক তখন আমরা আবিষ্কার করি এক রোমান্টিক কবিকে। রোমান্টিকরাই তো পারেন অকপটে উচ্চারণ করতে—'There is a beauty in women's decay.'

যে রূপের দিকে তাকিয়ে মেফিস্টোফিলিস আঁৎকে উঠে বলবে—'it freezes up the blood of men'

সেই রূপের দিকে তাকিয়েই রোমান্টিক ফাউস্ট বলে উঠবেন

> "Oh, too true
> Her eyes are like the eyes of a fresh cropse
> Which no beloved hand has closed, alas !
> That is the brest which Margaret yielded to me
> Those are the lovely limbs which I enjoyed."

১৮১৯ এবং শেষ দিকে Uffizi gallery-তে মেডুসার পেনটিং দেখে অভিভূত হয়ে শেলী যে কবিতা লিখেছিলেন, সেটাকেই বলা হয়ে থাকে রোমান্টিসিজমের প্রথম ম্যানিফেস্টোর মতো। সেই কবিতার একটা লাইন

> '—its horrors and its beauty are divine.'

রাজকাহিনীর 'হাম্বির' নামের উপাখ্যানের শুরুতে অবনীন্দ্রনাথ হাজির করেছিলেন একটি রাজপুতের মেয়েকে। 'পরনে তার পীলা ওড়নি, নীল আঙ্গিয়া'। তার সুডোল হাত। হাতে পিতলের কাঁকন। কাঁকনে লেগেছে সূর্যের আলো। তাতেই পিতল হয়ে উঠেছে সোনার মতো ঝকঝকে। আর তার চুলগুলো কি রকম?

"তার ধুলোমাখা চুলগুলি সাপের ফণার মত সুন্দর মুখের চারিদিকে বড় শোভা ধরেছিল।"

তাঁর 'গোরিয়া' নামের ছোট্ট গল্পে গোরিয়া নিজের পরিচয় দেয় এইভাবে—"যে দেবীর নামে আমার নাম তিনি ছিলেন গৌরী—আর আমি ছিলাম মৃত্যুর ন্যায় পাণ্ডুশ্রী, শোণিতপিপাসিনী একটা রাক্ষসী! কিন্তু তবু আমাকে লোকে বলিত্—গৌরী—প্রেয়সী-দেবী।"

তাঁর আরও একাধিক রচনায় নারীর সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশেছে হত্যা এবং রক্ত। পড়তে পড়তে আমাদের শিরা-উপশিরায় বাতাসে-কাঁপা মোমবাতির শিখার মতো কাঁপতে থাকে এক ধরনের আতঙ্ক। তবে কী সৌন্দর্যের শেষ পরিণতি এই ধ্বংসের রক্তস্রোত?

"এই ফুলটুঙির বাগিচায় এল একদিন রানীর সাজে কোন্ এক ফুলমালির মেয়ে; দোল পূর্ণিমায় এক হাতে রাজার হাত, আর এক হাতে পিচকারী। মধুরাত পূর্ণিমার, ঘড়ি পড়ল একটার, হয়ে গেল সুন সান্ রাজবাড়ি বাগান। সকালে দেখা গেল ফুলমালির মেয়ে কোথা ভেসে গেছে সান্ নদী বেয়ে ফুলটুঙি ঘরে ফুলের বাসর রেখে খালি!

"হুকুম হল রাজার—ফুলটুঙি মহল ধোলাই করবার—ধারা দিয়ে পড়ল নালি বহে আবীর কুমকুম কেশরের লালি।

"শ্বেত পাথরের টালি যেমন সাদা ছিল তেমনি হল, শুধু লেগে রইল পাথরের তক্তে যেন লোহার কষের মতো শক্ত চাপ রক্তের মতো রাঙা দাগ একটা দাঁড়ি।"*

'জয়শ্রী'তেও এমনিভাবে রাজ-মিহিরের রাজগৃহাঙ্গনে ডাক পড়েছিল তন্তুবায় কন্যা জয়শ্রীর। কিছুক্ষণ আগে সেই গৃহাঙ্গনে বয়ে গেছে রক্তের হোলি উৎসব। নরশোণিতের রক্তিমা ধিক্কার দিয়েছে কুঙ্কুমের রক্তবর্ণকে।

"এই সদ্য প্রক্ষালিত রাজ-গৃহাঙ্গনে পদার্পণ করিতেই জয়শ্রী মৃত্যুর একটা সুতীব্র শীতলতা নিজের সমস্ত দেহে অনুভব করিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন।" ...ক্রূরকর্মা রাজা মিহির নিজের আসন ছেড়ে উঠে এসে জয়শ্রীকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন মহারাণী উপযুক্ত উৎসবের বেশই ধারণ করিয়াছ! শ্বেতবসনে কুঙ্কুমরাগ মানাইবে ভালো।

তারপর—

"পূর্ব দিগন্ত-সীমায় নবোদয়ের কনকলেখা দিয়াছে; ভারত-খণ্ড জুড়িয়া অস্তোন্মুখ জ্যোৎস্নার ম্লান পাণ্ডুতা একখানি শোণিতহীন মুখচ্ছবির মত বিবর্ণ বিষণ্ণ।

শ্মশান হইতে দুই রাজপরিচারিকা মৃৎপাত্রে মহারাণী জয়শ্রীর শেষ অস্থি এবং রক্তাক্ত পদাঙ্কবাস বহন করিয়া সিংহলের অভিমুখে প্রস্থান করিল।"

জীবনানন্দেও সৌন্দর্যের সঙ্গে বীভৎসতার যুগল-মিলন ঘটেছে বহুবার। হর-পার্বতীর মতো ঘনিষ্ঠ ভঙ্গীতে বহুবার পাশাপাশি বসেছে সুন্দর আর অসুন্দর। উদাহরণের প্রয়োজন নেই।

এঁরা দুজনেই রোমান্টিক। আর রোমান্টিক বলেই রহস্যময়তার প্রতি এঁদের এত আকর্ষণ, অন্ধকারের প্রতি এত টান, জীবনের নশ্বরতার দিকে তাকিয়ে এত বেদনাময় আবেদন।

অবনীন্দ্রনাথের 'পথে-বিপথে'র অবনীকে আমরা এখনো ভুলিনি। অবনী প্রেমে পড়েছিল এমন এক ছবির যার সবটাই অন্ধকার। কেবল ছবির নীচে, কাঠের ফ্রেমে, একটা পিতলের ফলকে লেখা ছিল 'মোহিনী', আর সেই অন্ধকার-লেপা ছবিটার ভিতর থেকে কেবল দেখা যেত দুটো চোখ, তাও দৃষ্টিপাত দীর্ঘ হলে। অবন সেই ছবির অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতো নির্নিমেষ। জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' কবিতার মতোই অবিনের কাছে তখন—

'থাকে শুধু অন্ধকার—মুখোমুখি বসিবার'

জীবনানন্দের 'পিপাসার গান'-এ আমরা একবার শুনেছিলাম ভালোবাসার জন্যে আত্মার ভিতরকার এক অকপট ক্রন্দন।

"আজ শুধু দেহ আর দেহের পীড়নে
সাধ মোর—চোখে ঠোঁটে চুলে
শুধু পীড়া—শুধু পীড়া! মুকুলে মুকুলে
শুধু কীট, আঘাত, দংশন
চায় মোর মন।"

আর সেই সাধ-না-মেটার ফলেই কেবল মনে হতে থাকে—

"অন্ধকার, কুয়াশার ছুরি
মোরে যেন কেটে লয়, যেন গুঁড়ি গুঁড়ি
ধুলো মোরে ধীরে লয় শুষে।"

'মোহিনী' উপাখ্যানে অবিনের মনেরও এমনি ছন্নছাড়া দশা। সে বলে—"এক সময় আমার মনে হতো, এ কালটা যেন একটা খোলসের মতো আস্তে আস্তে আমার চারিদিক থেকে খসে যাচ্ছে, আর আমার নিজ মূর্তিটা পুরনো খাপ থেকে ছোরার মতো ক্রমে বেরিয়ে আসছে।...বুঝছি, আমার রক্তের মধ্যে সেকালের বিলাসিতার গোলাপি আতর এসে মিশেছে, আমার দুই চোখের কোণে উদ্দাম বাসনার অগ্নিশিখা কাজলের রেখা টেনে দিচ্ছে। ওই ছবির অন্ধকার ঠেলে ওপারে গিয়ে পৌঁছবার জন্যে, ওর কালোর মাঝখানে যে সুন্দর চোখ তারই আলোক-শিখায় নিজেকে পতঙ্গের মতো পুড়িয়ে মারবার জন্যে, আমার দেহমন আবেগে থরথর করে কাঁপতো।"

অবিনের কাছে অন্ধকারের ভিতরে জেগে-থাকা মোহিনীর চোখ দুটো ছিল—জীবনানন্দের ভাষায়—

"জাগিয়া রয়েছে তব প্রেত আঁখি প্রেমের প্রহরা।"

যেমন সনির্বন্ধ অনুরোধে জীবনানন্দের 'আকাশলীনা' কবিতাটি কেঁপে উঠেছে থরো থরো আবেগে—

"ফিরে এসো সুরঞ্জনা
ফিরে এসো এই মাঠে—ঢেউয়ে
ফিরে এসো হৃদয়ে আমার।"

অবিনকে ঠিক তেমনি করেই বলতে শুনেছি তার 'মোহিনী' নামের অন্ধকার-মাখা ছবিটার প্রতি মিনতিমাখা অনুরোধ—"এসো এসো দেখা দাও।"

জীবনানন্দে আকাশ এবং পাখি এবং নারী বহুবার একাকার। কখনো আকাশ হয়ে উঠেছে নারীর নীলাভ খোঁপা। কখনো নারীর চোখ হয়ে উঠেছে পাখির নীড়।

'মোহিনী'-র অবিন মাত্র একবারই উপলব্ধি করেছিল এমনি একাকার এক সত্য।

"নীল ঘেরাটোপ দেওয়া খাঁচার মধ্যেকার সে আমার শ্যামা পাখি। তার স্বর আমি শুনতে পাই। তার দুখানি ডানার বাতাসে নীল আবরণ দুলছে দেখতে পাই।"

মোহিনী ছাড়াও আর একজনের প্রেমে পড়েছিল অবিন। তার নাম, ইন্দু। না, ঠিক প্রেমে পড়েনি। মনে মনে গেঁথে চলেছিল প্রেমে-পড়ার একটা কল্পিত

কাহিনী। সে প্রেম-কাহিনী মুখ্য চরিত্র মূলত কোনো নারী নয়। একটা লাঠি। যার গায়ে 'তিল তিল হীরের আলো' দিয়ে লেখা একটা নাম, ইন্দু।

"অবিন হয়তো ওই আকাশের চাঁদের মধ্যে তার ইন্দুমতী বা ইন্দুমুখীকে দেখতে পাচ্ছে; হয়তো ওই চাঁদের আলোয় ঝকমকে তারাগুলির মধ্যে দিয়ে সে তার অনেক দিনের হারানো ইন্দুর কাছে বহু দূর পথে, বহু দিনের পথে, প্রাণের আকুতি বিরহী যক্ষের মতো সারা জীবন ধরে পাঠাচ্ছে, প্রতি পূর্ণিমায়।"

তারপর জীবনানন্দের 'নির্জন স্বাক্ষর'-এ শিশিরের শব্দের মতো এক নিঃশব্দ বিষাদের মধ্যে দিয়ে যে-ভাবে উচ্চারিত হয় সবচেয়ে প্রগাঢ়তম প্রেমেরও অনিবার্য অবসান—

"নক্ষত্রের হইতেছে ক্ষয়
নক্ষত্রের মতন হৃদয়
পড়িতেছে ঝরে
ক্লান্ত হয়ে—শিশিরের মতো শব্দ করে।"

ঠিক সেই ভাবেই 'ইন্দু' সম্পর্কেও অবিনের মধ্যে জেগে ওঠে বিসর্জনের বিষাদ।

"তারপর প্রণয় স্বপ্নের মাঝখানে দু জনের সহসা বিচ্ছেদ এবং আকাশ থেকে খসে-পড়া তারার মতো পৃথিবীতে তাদের ঝরে পড়া।"

ভালোবাসা প্রতি মুহূর্তেই বিপন্ন বিষণ্নতার জন্যে প্রস্তুত। সেই ট্র্যাজিক অনুভূতির গলায়, অবনীন্দ্রনাথ এবং জীবনানন্দ দুজনেই, পরিয়ে দিয়েছেন মুক্তোর মালা। হয়তো মুক্তিরও মালা।
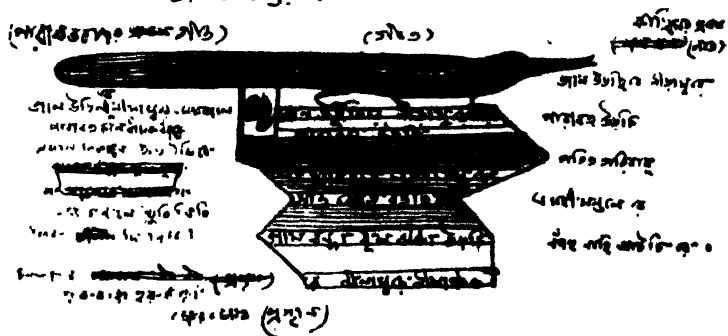
পদ্মপাতায় জল

নিজের শিল্পজীবনের আদিপর্বে অবনীন্দ্রনাথ একটা ছবি এঁকেছিলেন, নাম 'পথিক ও কমল'। "অবনীন্দ্রনাথের আদিপর্বের শিল্পকর্ম" নামের বইটিতে সে ছবির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এইভাবে—

"এই চিত্রটি শিল্পীর প্রথম পর্বের, আনুমানিক ১৯০০ সালে আঁকা। কালিদাসের ঋতুসংহারের আরেক প্রতিরূপ। সমগ্র চিত্রটি সরল মিতভাষী এবং ভাবগম্ভীর ; কিন্তু ভাবব্যঞ্জনায় সুসম্বদ্ধ, সুসম্পূর্ণ। পথিক প্রিয়সঙ্গে বঞ্চিত। পথিপার্শ্বের জলাশয় থেকে তিনি কমল আহরণ করেছেন। কমলের সৌন্দর্যে গৃহে অবস্থিতা প্রিয়তমার মুখমণ্ডল মনে পড়ছে।"

এরই কিছু পরে আঁকা আর এক ছবি 'দেয়ালা'তে আবার আমরা দেখতে পেলুম পদ্মকে।

"ঘনায়মান সন্ধ্যায় হঠাৎ-নেমে-আসা ধূসর ছায়া গোধূলির শেষ আভাকে গ্রাস করেছে। গাঢ় নীল বসনে আবৃতা হয়ে নদীর ঘাটে একটি নারী নেমে

এসেছেন ; বাঁ হাতে ধরা পদ্মফুল, ডান হাতে ছোট্ট একটি প্রদীপ।"

প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়ে আঁকলেন আর এক ছবি। নাম 'পদ্মপত্রে শিশির বিন্দু।' তাঁর জীবনের ভিন্ন ভিন্ন পর্বে ফিরে এসেছে পদ্মপত্রে ঐ জলের প্রসঙ্গ। যেমন একবার ঐ ছবির বেলায়—

"পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মত যে সব সুখের দিন গেল, তার স্বাদ পাওনি কি ওই নামের ছবিতে আমার?"

এই পদ্মপত্র আর জলবিন্দুকে আমরা পুনরায় দেখতে পাই আরেক রূপে তাঁর গদ্য রচনায়। তারা সেখানে হয়ে ওঠে কোনো হারানো সুখের প্রতীক নয়, প্রাণময় জীবনের প্রতিচ্ছবি। যেমন 'নালকে'—

১। "সমস্ত পৃথিবী দুলে উঠল—পদ্মপাতার জল যেমন দুলতে থাকে—এদিক ওদিক, এধার-ওধার-সেধার।"

২। "মায়া মায়ের কোলে বুদ্ধদেব দেখা দিলেন, পৃথিবীর বুক জুড়িয়ে বুদ্ধদেব দেখা দিলেন—যেন পদ্মফুলের উপর এক ফোঁটা শিশির—নির্মল, সুন্দর, এতটুকু।"

৩। "রাত যখন ভোর হয়ে এসেছে, শিশিরে নুয়ে পদ্ম যখন বলছে 'নমো'—"

'খোকাখুকি' নামের গল্পে আরও একবার—

"ঠাকুরের একখানি পদ্মপাত, তারি মাঝে টলমল করছে জগৎ সংসার—একটি ফোঁটা জলবিন্দু! সেই পদ্মপাতায় ধরা জলবিন্দুর পাশে আর একটি ছোটো ফোঁটা এসে লাগল, যেন কার চোখের জলে গড়া একটি মুক্তো! ঠাকুরের দৃষ্টি—যেমন করে শিশিরের উপর পড়ে সকালের আলো—তেমনি পড়ল এতটুকু জলের ফোঁটায়।"

এরই একেবারে শেষ লাইনে—

"ঠাকুরের হাতে পদ্মপাতার পাশাপাশি দুটি জলের ফোঁটা এক হয়ে মেলে—শুকতারা আর যেন সন্ধ্যা-তারা।"

পদ্মফুলের প্রতি ভালবাসা তাঁর বহু দিনের। সে তথ্য আমাদের জানান রানী চন্দ।

"অবনীন্দ্রনাথ পদ্মফুল ভালবাসতেন। তাঁর এক জন্মদিনে শান্তিনিকেতনের আশেপাশের গ্রামের পুকুর থেকে পদ্মফুল তুলে ঝুড়ি বোঝাই করে পাঠিয়েছিলাম

কলকাতায়। তিনি লিখলেন, 'তোমার পাঠানো শ্বেতপদ্ম রক্তপদ্মের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের শীতল সৌরভ পেয়ে মন আরাম পেলে।'

সেই থেকে প্রতি বছর জন্মদিনে তাঁকে পদ্মফুল পাঠাই, পাঠিয়ে তৃপ্তি পাই। এবারে তিনি আছেন আমাদের মাঝে। প্রচুর পদ্মফুল তুলেছি, তুলিয়েছি। ভোরবেলা পদ্মফুল মালতীর মালা ধুপ চন্দন নিয়ে উদয়নে এলাম। পিছনের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। অভিজিতের বাবা পদ্মফুলের বোঝা তাঁর সামনে রেখে প্রণাম করলেন। অভিজিৎ মালাচন্দন পরালে। আমি ধুপ জেলে পাশে রাখলাম। প্রণাম করলাম।···

তিনি শিশুর মতো খুশি হয়ে উঠলেন।"

প্রকৃতিকে ভালবেসে, সেই সঙ্গে নারীকেও ভালবেসে, জীবনানন্দের কণ্ঠ থেকেও আমরা শুনতে পেয়েছি এমনি স্তবগান-পদ্মপাতার, ভোরের আলোয় উজ্জ্বল এই জীবনের পদ্মপাতার উপর জলের ফোঁটার। তাঁরও মনে হয়েছে, এই পদ্মপাতা আসলে জন্ম নিয়েছে তাঁর অনেক জন্মজন্মান্তরের ব্যথা থেকে। আর এই পদ্মপাতাই তাঁকে পৌঁছে দেয় এক সরল সত্যে—

"এই জীবনের সত্য তবু পেয়েছি এক তিল
পদ্মপাতায় তোমার আমার মিল।"

জানা গেছে, তিনি কবিতা লিখতেন বারংবার কেটে-কুটে। এমনকি পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাকেও গ্রন্থভুক্ত করার সময়ও অদলবদল ঘটিয়েছেন বহুবার। কিন্তু পুরোপুরি একই বিষয় নিয়ে দুটো কবিতা কি লিখেছেন কখনো? হয়তো নয়। লিখেছেন কেবল একবারই। সে এই পদ্মপাতার বিষয়েই। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা নামের বইয়ের ভিতরে যে কবিতার নাম 'তোমাকে ভালবেসে', সেই কবিতারই আদিরূপ 'সুদর্শনা' নামের কবিতার বইয়ে 'তোমায় আমি'-তে। সে কবিতার আরম্ভ হয়েছে এই বলে—

"তোমায় আমি দেখেছিলাম বলে
তুমি আমার পদ্মপাতা হলে
শিশির কণার মতন শূন্যে ঘুরে
শুনেছিলাম পদ্মপত্র আছে অনেক দূরে
খুঁজে খুঁজে পেলাম তাকে শেষে।"

অবনীন্দ্রনাথ এবং জীবনানন্দ, মূলত দুই ভিন্ন দিগন্তের পথিক। দুজনের

মাঝখানে বয়সের ব্যবধান যত না বেশী, তার চেয়ে বিরাট ব্যবধানটা হল যুগের মানসিকতার। একজনের যেখানে উৎসাহ শিশুদের মন রাঙানো, আরেকজনের উদ্দেশ্য বয়স্ক চৈতন্যে ঝাঁকুনি দেওয়া। কোনোখানেই এঁদের মিলবার কথা নয়। অথচ, আশ্চর্যভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায় তাঁদের মিল পদ্মপাতায়। যেন একটি পদ্মপাতায় দু রঙের দু ফোঁটা শিশির পাশাপাশি, অবিস্মরণীয়তার আলোয় রাঙা। আর সেই পদ্মপাতাটির নাম, উপলব্ধি।

তাই একজন যখন লেখেন—

'শুনেছি কিন্নর কণ্ঠ দেবদারু গাছে'

অন্যজন জানান—

"নীল আকাশের সীমা শুভ্র আলোয় ধুয়ে দিয়ে চন্দ্রও উঠলেন, পাখিরাও বন্ধ করলে তাদের বৈকালিক। সে যেন কিন্নরীদের গান, শুনে এসেছি রোজ দুবেলা।"

আমরা সৌভাগ্যবান। কেননা আমরাও শুনেছি এমন দুটি কিন্নর কণ্ঠের গান, আমাদের সাহিত্যে যা কোনদিন ফুরোবার নয়। আমাদের পর যে আগামীকাল এবং তারপরও যে অনাগত কাল, তখনও রূপসী বাংলার এই কবি জীবিত হয়ে থাকবেন সেই সব মানুষের বক্ষে-বৃক্ষে, যাদের কাছে জীবন স্বপ্ন নয়, এবং স্বপ্নও জীবন।

তিষ্যরক্ষিতা

পথিক ও কমল

পরিশিষ্ট

অবনীন্দ্রনাথের কলমে গদ্য কবিতার পত্তন রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে। স্বরচিত গদ্য-কবিতায় ব্যবহৃত ছন্দের নাম দিয়েছিলেন তিনি 'গদ্য ছন্দ'। 'বিচিত্রা'-র পাতাতেই এই অভিনব পরীক্ষার শুরু। প্রথম কবিতা 'পাহাড়িয়া' ছাপা হয়েছিল ১৩৩৪-এর শ্রাবণে। ঠিক তার আগের সংখ্যাতেই, আষাঢ়ে, যেন অনেকটা নিজের গদ্য কবিতার আগমনী হিসেবেই লিখেছিলেন একটা প্রবন্ধ, 'নতুন ও পুরনোর ছন্দ'। এই রচনাটি দিয়েই 'পরিশিষ্ট' অধ্যায়ের শুরু। এর পর পরপর সংযোজিত হল বিচিত্রায় বেরোনো পাহাড়িয়া, রংমহল, তিন-দরিয়া। এবং তারও পরে 'উত্তরা' পত্রিকায় বেরোনো 'উত্তরা'। আর সবশেষে 'ভারতী'-তে বেরোনো বারোয়ারী-উপন্যাসে অবনীন্দ্র-নাথের লেখা অধ্যায়টি।

নতুন ও পুরোনোর ছন্দ

সৃষ্টি হবার বেলায় গাছ ধরলে নতুনের ছন্দ, কিন্তু ফুল ফোটানোর, ফল ধরানোর বেলায় ছন্দ বদল হল,—গোড়াতে পুরোনো এল, আগাতে নতুন!

বেশ একটুখানি পুরোনো হয়ে বড় হ'ল গাছ, তবে ধরল তাতে নতুন ফুল, ফলের মঞ্জরী ও কলি; নতুন রকমের হ'ল না তাদের সাজ, পুরোনো চালেই বাঁধা গেল তাদের রূপের এবং সাজ-সজ্জার ছাঁদ-বাঁধ সবই।

পুরোনো ডালে ধরা থাকে অগণিত নতুন জীবন-বিন্দু গোপনভাবে; পুরোনোর কোল ছাড়ার উপায় নেই তাদের—যদিও তারা নতুন; সবাই প্রতীক্ষা করছে নব বসন্তের দূত এসে পৌঁছনোর।

আমূল পুরোনো অথচ নতুনের সন্ততি এবং নতুনের জননী এই পুরোনো এবং নতুন বাগানের সব গাছ—এরা নতুনের পক্ষে পুরোনোটা যে বাধা, এ সাক্ষী দিচ্ছে না একেবারেই,—নতুনে পুরোনোয় চলেছে কাজ বাগানে—যেখানে নতুন বৃন্তে গিয়ে পৌঁছচ্চে কত কালের গাছের সকল রসের সঞ্চয়; সেইখানে বাঁধা যাচ্ছে পুরোনোর সঙ্গে নতুন চমৎকার সুপরিণত ছন্দে! কত যুগ আগেকার কুহুধ্বনি, তাই শুনে ডালের আগল ভেঙ্গে বেরিয়ে আস্ছে কত দিকে কত নতুন নতুন পাতার মঞ্জরী ফুল ফল কত কী, কিন্তু ডালকে জোরে আঁকড়ে রয়েছে এরা, পুরোনোকে অস্বীকার করে আসছে না,—নতুন যদিও সবাই! কেউ এরা পুরোনোকে ধিক্কার দিচ্ছে না, কিন্তু সাজাচ্ছে পুরোনোকে। মঞ্জরী বল্‌ছে—'ওগো আমি সেই পুরাতন যাকে নিয়ে রচনা হয়েছিল পুষ্প-বাণ'; মঞ্জরীর সঙ্গী কুহুধ্বনি, সেও বল্‌ছে,—'আজকেরও অথচ কালকেরও আমি এবং আমারি মতো নতুন পুরাতনের ছন্দে বাঁধা এই জগৎ শুদ্ধ সবই।'

পুরোনো আমের কসিটাকে নতুন একটা ছেলে বাঁশি করে নিয়ে যখন খেলা-শেষে ফেলে গেল মাটিতে; তখন একাধারে পুরোনো কসি এবং নতুন বাঁশি থেকে বার হ'ল ফুল আর নতুন আমগাছের গোটা দুই সবুজ পাতা, কিন্তু ফলই বা কোথা, বউলই বা কোথা নতুনে তখন? নতুনে পুরাতনে মিল্লো; তবে

উঠলো জেগে ছন্দ ফুলের পাতায়; নতুন বৃন্তে; পুরোনো ডালে; পুরোনো বাগানের যা কিছু হিল্লোল পেলে সমীরণে, পরিণীত হলো পরিণত অপরিণত দু'য়ে।

পুরোনো হবার দিকে তেজে চল্লো গাছ, তবে আশা করলেম্ ফল ধরাবার, ফুল ফোটবার। এ না হয়ে গাছটা বলে বস্তো যদি—'আমি নতুন এবং একেবারে বরাবরই সবুজ ও তরুণ থাকবো'—তবেই আশা উড়লো আকাশে ফুল ফলের। নতুন নতুন কল্পনা ধরে আকাশ-কুসুমের ফোটা, তাও পুরোনো আকাশে ঘট্‌ছে দেখি।

নতুন সাহিত্য, নতুন আর্ট, নতুন সঙ্গীত, নতুন নাট্যকলা এমন কি নতুন যুগের মানুষের জীবনটাও আমূল নতুন হবো কাঁচা রইবো, পাক্‌তে চাইবোই না বলে' পুরানো থেকে বিমুখ হয়ে বস্‌লেই মুস্কিল !

মানুষ ভাব্‌বে মানুষের মতো, গাছ ভাব্‌বে নিজের মতো, মানুষকে গাছের হিসেব ধরে দেখা চলে না, কিন্তু এ-কথা জানা, যে পুরোনো হওয়াকে অস্বীকার করে পাতা কিম্বা মাথার চুল বর্ত্তে থাক্‌তে পারে একমাত্র কল্পপের দোকানে আর গ্রীণরুমে—সবুজ, কালো, কাঁচা, তরুণ অরুণ ইত্যাদি কেমিকেলের বিজ্ঞাপন দিয়ে।

পুরোনো পিঁড়িতে নতুন আলপনা, নতুন পিঁড়িতে পুরোনো আলপনা এই করেই চলে গেছে কাজ এতকাল—সাহিত্য জগতে, শিল্প জগতে, নাট্য জগতে সব জায়গাতেই।

বুকে সবুজ ফিতের ফুল এতটা একটা আল্‌পিন্ দিয়ে ফুটিয়ে নিয়ে তো আমি মনে করতে পারচিনে যে সত্যিই টানতে হবে নতুন পিঁড়িতে একটা নতুন আল্‌পনা এবং তারি হুকুম হাওয়ায় এসে গেছে—একমাত্র বাংলার লেখক-মহলে, এইমাত্র বিলাতের বিনাতারের আফিস থেকে সবুজ গালামোহর-করা মোড়কে। কাঁটাল গাছে ইঁচড় ফলে,—যতটা পারে সে পুরোনো ডালের সংস্রব ছেড়ে একেবারে গোড়ায়,—যেখান থেকে গাছটা নতুন বেলায় গজিয়েছিল, সেইখানেই ঝোলে মাটির দিকে মুখ করে।

নতুনের স্বপ্নে কণ্টকিত-কলেবর, দেখ্‌তেই পায় না ইঁচড় পুরোনো মাটিকে পুরোনো শিকড়কে—যার রস টেনে সে ফুলে উঠ্‌ছে; ক্রমাগত নতুন বিস্ফুরণে পুরোনো গাছের গোড়াটার শক্ত ছালকে ভেবে নেয় সে কেবলমাত্র কড়া বুরুষ।

পরগাছা হাওয়াতে শিকড় ছাড়ে, কিন্তু সেও বলে—'পুরোনো ডালে আমি অদ্ভুত রকমের এক হাল্কা ছন্দে বাঁধা পড়ে আছি, কেননা নতুন ডালে ফুল ফল, পরগাছা, পাখী, মানুষ, বনমানুষ কারো ভর সয় না, পঞ্জ পালেরও নয়'; নতুন বোঁটা পুরোনোর ছন্দে বাঁধা শক্ত রকমে, তাতেই ধরে সে ফুলের ভার—দোপাটি থেকে আরম্ভ করে শতদল, সহস্র দল, এমন কি শতদল বাসিনীর ভারটি পর্যন্ত !

সেখ সাদীর গুলেস্তার গোলাপ আর আজকের ইডেন পার্কের গোলাপ, এদের একটা পুরোনো, একটা নতুন এভাবে দেখা চলে এবং চলে নাও। লেখার বেলাতেও এই, গানের বেলাতে, ছবির বেলাতেও এই একই কথা। সেকালের পাতাগুলো যতটা সবুজ একালের পাতা তা'র চেয়ে বেশী সবুজ হয়ে উঠ্বে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ এই বলেই—তা'র তো জো নেই বাংলাতেও।

এখানে মাটি ভয়ঙ্কর পুরোনো, আকাশ তা'র চেয়েও পুরোনো এবং আকাশকে ঢেকে, মাটিকে ভিজিয়ে আসে যে নতুন বাদল, এত পুরোনো সে, যে মেঘদূতের আমল তা'র কাছে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে দেখা যায়। কাব্যে, সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে কোন্‌টা নতুন যুগ, কোন্‌টা পুরোনো, আর এই সবের রচকের মধ্যে প্রাচীন কেবা, নবীন কেবা, আর কেই বা এদের মধ্যে আমূল নতুন, এ' ভেবে ঠিক করতে পারলে না মহাকাল বুড়ো—ম'রে পুনর্জন্ম পেয়েও এ পর্যন্ত। আমূল নতুন উৎকর্ষ হ'ল—ব্যাঙের ছাতা, পুকুরের পানা, শেওলা এমনি গোটা কতক জিনিষ, কিন্তু পুরোনো পুকুর, পুরোনো তরু৷ ইত্যাদি হ'ল অবলম্বন তাদের, এবং চেহারার প্রাচীনতা, বর্ণের প্রাচীনতা ধরেই রইলো সবাই !

পিঁপড়ের পালক হঠাৎ নতুন যদিও, কিন্তু মরবার আগডালে ছাড়া সেও গজায় না। হঠাৎ বয় ঘূর্ণি বাতাস নতুন ছন্দে, মাঠে-হাটে, কিন্তু তার ধুলোর ধ্বজাটা প্রাচীনের রেণুকণা দিয়ে অবিকল নতুন একখান কাঁথার পেঁচ-ফুলের নক্সার ছন্দে অবিরল করে গাঁথা হয়ে গেছে, সম্পূর্ণ নতুন হ'তে ফাঁকই পাচ্ছে না বেচারা, —সবুজ মাঠটাতে গড়াগড়ি দিয়েও !

পাহাড়িয়া

জেগে ওঠার কিনারায় কিনারায় সুরের পাড় বোনে পাখী,-
একটি পাখী, না-দেখা পাখী, কানে-শোনা পাখী !
উত্তর পাহাড়ের নিঃশ্বাস-মন্ত্র আগ্‌লে রাখে
কুয়াশার জাদু দিয়ে ;
পাখীকে চিনতে দেয় না, দেখতে দেয় না !

যেদিকে বেড়া দিয়েছে সূর্যমুখী ফুলের গাছ,
সেদিক থেকে ছাড়া পেয়ে আসে সুর !
যেখানটায় পাথর ভিজিয়ে ঝরে জল
সে পথ বেয়ে আসে ভোরে ভোরে গান !

রূপ থেকে স্বতন্তরা, বুকভরা, ঘুম-ভাঙানো ভোরাই দিয়ে
পাই আমি পাখীকে,
পেয়ে যায় তাকে হিম-নিথর উত্তর আকাশ,
পায় কতদূরের নিস্পন্দ-নীল-পর্বত ;
পেয়ে যায় শীতকাতর একা হরিণ
রাজোত্থানে ধরা !

আমারি মতো পরদেশী যে
আর যার মধ্যে কোনো স্বপ্ন, কোনো কবিত্ব নেই,
সেই আমার গোবিন্দ খানসামা—
সে শুনেছে ভোরে উঠে
গয়লা-পাড়ায় নেমে-চলার পথে ;
রোজই শুধোয় সে পাখীর খবর,

ফাঁদ পাতার মৎলব দেয় সূর্যমুখী-বেড়ার ফাঁকে।

ঝরনা যেখানে সরু একগাছি আলোর মালা দিয়ে
বেড়ে নিয়েছে একখানি পাথর,
উষার এই মনের পাখী উড়ে বসে কি সেইখানে?
রাত থাকতে পায় কি পায়ের পরশ।
তার শিশিরে-মাজা নিকষ পাষাণ?
বরফ-গলা নতুন নদী—উছলে পড়ে, উল্লসে চলে—
সে কি ধরে নিয়ে যায় পিয়াসী পাখীর রূপের ছায়া?

যুগান্তরের শীতের সকাল অকাল-বসন্তের ভোর-রাতে
পেয়েছিল যাকে
সেদিনের ঝরনা-তলায় নতুন ঝাউবনে,—
কোথা হতে এল সে-পাখী কে জানে তা?
আজকের ভোরাই ধ'রে যে-পাখী করে আসা-যাওয়া
ঘুম-ভাঙানোর বেলায়
অস্বচ্ছ কাচমোড়া আমার এই খোপটার বাইরে,
সে কি ঝরনার পাখী, না ঝাউবনের, না উপর পাহাড়ের,
না ওই পাহাড়তলার চা-বাগিচার নীচের জঙ্গলের?
সে কি থাকে একলা কোনো পাথরের ফাটলে,
না সে বাসা নিয়েছে আমার সঙ্গে কাচমোড়া ঘরেই?

ঘরের কোনে কাচের বুদ্বুদে ধরা নিভন্ত-বাতি
সে কি জেনেছে পাখীকে?
কাজল দিয়ে শেষ রাতে কেন লিখেছে সে
দেয়ালের ভিতর-দিকটায়
রাত-পোহানো পাখীর কালো পাখনার
ইসারা একটু?

কার্সিয়ঙ

হাল-ফেশানের শিষ্-মহল,
শুধু কাচ্ আর কাঠ্ আর টিন্ ;—
যেন একটা কাফুন্,
দু'চার দিনের হঠাৎ-নবাবীর ফুল্‌কি-কাচের কাফুন্-
উই-ধরা, মরচে পড়া,
পাহাড় জুড়ে প'ড়ে আছে দেবদারু-বনে।
দেবদারু এ, বাদল্-ছোঁওয়া,
প্রথম-যুগের সবুজ দাবানল,
কইচে পুরোনো দিনের বিজ্‌লি-পাখীর কথা ;
এরা কি রাখে কোনো খবর এই শিষ্-মহলের ?
ভাঙা বাগানে দেবদারু রয় রয়, আচম্‌কা দুলে ওঠে,
পাহাড় সে রঙের নেশায় মেতে ওঠে যেন !
মাতন্ মেঘে-মেঘে,
মাতামাতি পাথরে-পাথরে
তুফান্ তুলে রোদ্র-ছায়ায়
মাতামাতি মহাবনে।
পাহাড়িয়া-বাসিন্দা, দুর্ম্মদ এরা,
নীল্-মদে মত্ত আছে দিন-রাতই !
প্রচণ্ড উল্লাস এদের—
আকাশ ছাড়িয়ে উঠতে চায়,
ঝর্ণা দিয়ে ব'হে চলে
সাপ্-খেলানো ছন্দে রসাতলের দিকে,
বিদ্যুৎ আর বাজ ধ'রে ধ'রে !
জলে ঝড়ে মেতেই আছে এরা,
গিরি অরণ্য সবাই ;—

অশেষ মাতনে মেতেই আছে—
কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা ;
বসন্তের ক্ষণিক স্বপ্ন
দেখে কি দেখে না এরা নিমেষের মতো
বরফ-ঢালা উত্তর-বাতাস এ—
ইন্দ্রধনুর রঙে রাঙানো
কুয়াসাতে ভারি ;
এরি তলায় এ কাচ্-মহল্—
ঠুন্‌কো, ভারি পল্‌কা,
একেবারই হাল্কা—
যেন পরীস্তানের ময়ূরপঙ্খী পাল্কিটি !—
সায়ন-নীল্ ছায়ার ঘেরে ধরা
বুদ্বুদ্ একটি যেন সাত-রঙা !
পল-তোলা কাচের ঢাক্‌নি-দেওয়া রঙমহল্—
রঙ্গন-ফুলের রেণু-মাখা, কাচপাখনা
মৌমাছির
ছেড়ে-যাওয়া মৌচাক্‌টির প্রায়
শূন্য পড়ে আছে ভাঙা বাগানে।
এক পলকের নির্ম্মিত—
চিকন্-কারি কাচের ঢালাই
শিষ্‌মহল,
চিকন্ গাথ্‌নি এমন,—
যে আলোর ভারে ভাঙ্‌লো বুঝি,
মিলিয়ে গেল বা হাওয়ায় হাওয়ায় !
ফুল-বাগান্ কাচ্ মহল ঘিরে
ভাঙা ফুলদান্ ঘিরে উজাড়
বাগানটা ;—
মালাকরের বোনা ফুলের গহনা যেন ছিঁড়ে-পড়া,
এ যেন ধ্বসে-যাওয়া সরু লহর, মিঠে জলের !

মায়াতে ঘেরা বেজান্ সহরের বাগান এখানা,—
খোয়াব্ জাগায় দিক্-ভোলানো।
সুন্দর-বুনন্ সুজনীর মতো আর এক বাগান্—
মন-মাতিয়ে রূপেতে রঙেতে
পৌঁছে যায় চোখের সাম্‌নে।
দেখি আর-এক দিনের রঙ মহল ঘিরে
খুসির জলুস সাত্‌রঙা
দিচ্ছে ঝলক ফুল-বাসরে;
মহলে মহলে দিচ্ছে ঝিলিক্—
দেওয়ালে আর্‌সিতে,
কাচের ফুলদানে, স্ফটিক-ঝালর সামদানে,
মণি-কাটা পেয়ালাতে, সোনাতে রূপোতে মণিমাণিক্যে বিল্লোরে।

হিল্লোল্ দিচ্ছে রঙ—
পহল্‌দার কানের দুলে, মোতির কর্ণফুলে,
কালো চুলে হীরের ঝাপ্‌টায়,
হাতের পঁহুছায়, কণ্ঠ-মালায়,
নূপুরে গুঞ্জরী-পঞ্চমে, পায়ের তলায় হেনার রঙে
দিচ্ছে ঝলক্ ধ'রচে জলুস্ জল্‌সার বাতি।
পরীস্তানের খোস্‌বু হাওয়ার
একটুখানি ছোঁয়াচ পেয়ে
গুল্‌জার যেন বাগিচা এখনো—
বুল্‌বুলির গানে-গানে, ফুলে-ফুলে গুলেস্তাঁর
সকালে সন্ধ্যায় এখনো মনে হয়
বনের তলায় ব'সে যায় সবুজ দরবার,—
ফুলে ফুলে ফুল-বিছানো মস্‌নদ্ জুড়ে;
ফুলের বাহার লাগে রোজই—
ফুল্‌দানির ফুলের, তোব্‌রা বাঁধা ফুলের,
হিমে ফুটন্ত গোলাপফুলের।

বুল্‌বুলের মন-লোভানো মালঞ্চে এইখানে
সময়ে অসময়ে বসন্তের স্বপ্ন দিয়ে রয় যেন
গুলরুঃ বাতাস পরীস্তানের ;
হঠাৎ খোলে যেন দক্ষিণ-দুয়ার শীতের রাত্রে,
ফুলবোনা কিংখাবের পর্দার ভাঁজ সরিয়ে
এসে পৌঁছয় বাতাস—
সোনার পিঁজরাতে মাণিকে-গড়া খেল্‌না বুল্‌বুলির কাছে।—
পরীস্তানের বুল্‌বুল্‌ সে
ঘুম জানে না, নেচেই চলে ;
বলে অবিরত—পিও পিও পিও !
দেখি ফোয়ারা উঠ্‌ছে গোলাপ-বাগে—
উঠ্‌ছে প'ড়্‌ছে তালে তালে,—
মণি-মঞ্জীরের ছন্দ ধ'রে ;
উল্‌সে উঠছে গোলাপ-জল ফুহ্‌রী দিয়ে,
ঝর্ণা বইছে উপবনে—
আবীর চন্দনে মদে আর মেহন্দিতে রাঙানো।
সন্ধ্যাতারার আলো-ছোঁয়ানো সাহানা সুরে
বেজেই চ'লেছে সারঙ্গী ;—
সুরে সুরে আল্‌সে-টোলে
বিভোল ছন্দে চ'লেছে
রাগ-রাগিনী—গলাগলি সাঁঝি আর ভোরাই ,—
আস্‌ছে যাচ্ছে ভোরের নেশায় ভরপুর !
নর্ত্তকীর নূপুরের ঝিঞ্জীর-পরানো
স্বর্ণমৃগী তারা যেন—
ঘুর্‌ছে ফির্‌ছে বিহ্বল উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি ;
ভেবেই পায়না রঙ্‌মহলে হ'ল রাত্রি শেষ,
না হচ্ছে রাত্রির আরম্ভ
সকাল সন্ধ্যার ভ্রম জাগিয়ে
চমক্‌ ধরে কাচ্‌-কাফুনের ঠুন্‌কো দেওয়াল ;

আগুন-হানা রোদে, হিম-ছোঁয়ানো চাঁদনীতে
দেখা দেয় একই সঙ্গে—
সেদিনেরও রঙ্‌মহল—
ভাঙা বাগান এদিনের-ও !
কাঁটায় কাঁটায় কাঁটা-ফুলে ভর্ত্তি
মালঞ্চ এখন শুকিয়ে-যাওয়া ;
এখানে ওখানে দেখ্‌ছি শুধুই
মালঞ্চের মালিকের মৎলবটাই ;—
শেওলা-সবুজ সানে-বাঁধানো চৌরাস্তা—
একটু দেখা যায় এখনো ;
একটি ধারে পাতা ঝরানো পারিজাত—
আছে উদয়-অস্ত আবোর-ঘেরা একলাটি ;
শ্বেত-পাথরের আতস-ঘড়ি—
ফাট্‌-ধরা তার চক্রটা—
আঙ্গুরী-সরাপের ছোপ্‌ লাগানো ,
পাথর-গাঁথা নক্সা-কাটা চবুতরা—
জাল দিয়ে ঘেরা—
হেলে প'ড়েছে অতল একটা ভাঙ্গনের বুকে
রোদ হেলে এদিক্‌টায় এ-বেলা ও-বেলা ;
চাঁদ ঝলে এ-পহর ও-পহর ।
সাত্‌ রঙা আগুনের রূপ্‌টানে মাজা
চিকন্‌ কাচের পর্দ্দাখানি,
তারি ও-পারে রঙ্‌মহলের অন্দর ;—
আঙুর-লতায় আড়াল-করা ছোট্ট মহল—
সুন্দর ছোট্ট আপনি-ফোটা বন-ফুলটি ;
বাতাস-ঢালা বে-দাগ কাচের ঝারি একটি—
নিরালাতে ঝাউতলায় ঝিকমিক করে !
হেনার বেড়ায় আগ্‌লে-রাখা খিড়্‌কি,
তারি মাঝে ভাঙা ফোয়ারা,—

মোতিয়া-ফুলের পাপ্‌ড়ি-মেলানো ছোট্ট ফোয়ারা—
মকূরী-সাদা বিল্লোরে ঝল্‌মল—
শিশিরের ভারে নুয়ে-পড়া ফুলই যেন পরীস্তানের !
গোলাপ-জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে
খেলাই ছিল এই ফোয়ারার,
শিলের ঘায়ে, কি শিশিরের ভারে, না সে
রোদের স্পর্শে
ফেটে হয়েছে চুরমার—
ঝড় পড়েছে ভেঙ্গে !
রূপের ঝিকমিক্ ফোয়ারার—
ধুলোতে কাঁকরে আজও রয়েছে ছিটোনো—
ঘাসের উপর শিল-গালানো শিশির-বিন্দু—বিন্দু বিন্দু !
কাঁটা-বনে লুটিয়ে-পড়া ফোয়ারার
অবশেষ-টুকু জ'ড়িয়ে-জ'ড়িয়ে শত-পাকে,
পড়ে আছে—
নীল-ডোরা সোনালী কাচের সাপিনীটা—
ফোয়ারার তলাকার মন্ত্রে মুগ্ধ যেন ।
বাগানের এই কোণে একটি ঝর্ণা—
নেচে চলেছে, ব'ল্‌ছে কথা কতই !
আলো-ছায়ার মায়া দিয়ে ঘেরা এই কোণে বাগানের
উড়ে এসেছে ভ্রমর একটা,
পেয়েছে হয় তো মধুর সন্ধান এইখানেই ;
পাহাড়ি ঘাসের সোনালি দোলায়
দুলছে আন্‌মনে ছোট্ট একটা প্রজাপতি,—
হালকা দুটি পাখনা তা'র—
কাচ-মহলের খিল-খসা ঝরোকার মতো
খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে আপনা-আপনি !
ফুল-বাগিচার রঙ্‌মহলের কাফুনটা থেকে
ছাড়া-পাওয়া স্বপ্ন

রঙে-রঙে ঢেউ খেলিয়ে অস্ত যাচ্ছে এই দিকটাতে ;
এইখানটায় বাসা বেঁধেছে
বনবাসী সাদা বুলবুল,—
পারদ-সাদা পাখনা তার,
ভাঙা-বাগানের প্রাণ-পাখী সে—
ক'রছেই উহুঃ উহুঃ উহুঃ !
নিবাসিন্দা-দেশের মানুষ—
কে সে বে-খবরী একজন,
নিয়ে এল ডেকে দলে-দলে
খাম-খেয়ালি উল্লাসীর দল ;
পাহাড়ে এসে বাসা বাঁধ্‌লো তারা—
কাচে-ঘেরা,
ফুলঝরির ফুল-কাটা ফুল্‌কি-লাগানো
কাচের বাসা,—
ফুল-ফোটানো ফুল-ঝরানো ফুলবাগানে,—
ভ্রমর আর বুলবুলির মনোমতো উপবনে
বসিয়ে দিলে রঙের মেলা খেলাচ্ছলে !
ক্ষণিক রঙের রঙ্গী কেই বা সে ?
উল্লাসীর দল কে বা তা'রা ?
ক্ষণিকের উল্লাসে-বিলাসে
বেপরোয়া খেলে গেছে—
উদয়-অস্ত আকাশের তীরে বনে পাহাড়ে !
মেঘে-বাসা-বাঁধা বিদ্যুতের খেলা খেলে গেছে,—
হাউইয়ের হলকা-লাগা সাত্‌-তারার খেলা—
খেলেই মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে !
গঙ্গাজলী-ঘন কুয়াসাতে
তলিয়ে যায় থেকে-থেকে ভাঙা বাগান ;—
বোঝাই যায় না কোথায় গেল,
আছে না আছে মহল-ঘেরা ফুল-বাগান ;

জানাই যায় না কোথায় শেষ কোথায় বা আরম্ভ
ঠুন্‌কো এই বুদ্বুদ্‌টির !
ফটকের বাইরে এসে প'ড়ি—
দিনের আলোতে চশমা-চোখে
দেখি লিখন "শীষ্‌-মহল টু লেট্‌ !"
এখানে ভুটিয়া-মালী ফুলের চানকায় ক্ষেত দিচ্ছে—
শাক-সব্‌জী তরি-তরকারির ক্ষেতই খুঁড়্‌ছে মালী
সামনেই রয়েছে তারও কাফুনটা ধরা—
মস্ত একটা ডালা-বন্ধ কাচ্‌মহল্‌—
শেওলাতে সবুজ !

তিন-দরিয়া

ধাব্‌লা পাহাড়ের ঠিক নীচেই
কাঁতি-কালো করাতি-পাহাড়,
তারও নীচে তিনমুখে তিনটে চূড়ো
—মনিয়া পাহাড়, তুঁতিয়া-পাহাড়, সুর্মি-পাহাড়—
—লাল সবুজ নীল,
রঙ ফেরায় ওরা সকালে বৈকালে দুপুরে।

তিন পাহাড়ের অনেক নীচে,—
ভাঙ্গনের ধারেই, টুং সুং বস্তি,
বস্তি পাহাড়ের অনেক উপরে,—
মশানের কাছেই শালবন,—
—চিতার ধুঁয়াতে ঝাপসা দিনরাতই—
টুং সুং লামার গুম্ফা উঠ্‌ছে সেখানে।
কথা দিয়েছে বস্তির মেয়েরা
—পাথর তুলে দেবে জনে জনে তিনশো থাক
সুরু করেছে সবাই পাথর বহার শক্ত কাজ।
নীচে থেকে উপর পাহাড় অনেকটা পথ,
সেখানে উঠে যায় মেয়েরা রোজই,—
ভারি ভারি পাথর ব'য়ে,
—দেওয়ালের পাথর, দেউলের পাথর
ব'য়ে চলে একে একে,
পিঠে ভার যায় মেয়েরা—
সারি সারি পিপীলিকা যেন।
চড়াই পথ বিষম সরু,—

ঠেকেছে গিয়ে মেঘের গোড়ায়,
—কুন্‌রী-ঝোপের টাট্‌কা সবুজে আড়াল-করা হাঁটাপথ—
বেগানা পথটা গড়ানে পিছল,
খোঁচা খোঁচা পাথর বিছানো,—
চ'লে গেছে মশান ছড়িয়ে
কত যে উপরে ঠিক নেই ;
মরা ঝর্ণা কেটে গেছে পথটা কতকাল হ'ল,—
থেকে থেকে ঝাঁপে পথ রঙ-কুয়াসা,
রোদ পড়ে থেকে থেকে এ পথে,—
পায়ের তলায় পাথর ক'খানা
আগুন হ'য়ে ওঠে।
কতদিন ধরে চ'লেছে এ পথে কত না মেয়ে,—
পাথরের বোঝা নামিয়ে দিয়েছে মশানের ধারেই
সে কত বার তা'র হিসেব নেই।

ব্রতচারিণী বস্তির মেয়েরা,—
ছোট বড় সবাই করছে কঠোর.—
শোধায় না কেউ পূর্ণ হবে ব্রত কতদিনে,
কথাটি নেই, হাসি হাসি মুখ
ক'রে চলেছে কাজ সমাধা টুং স্থং গুম্ফার,
আনন্দ পায় এরা ভারি বোঝা ব'য়ে,—
কুয়াসার উপরে উপরে চলে চলায়,
এরা জানে মশান ছাড়িয়ে উপর-বনেতে,
পিয়াশালের নিবিড় ছায়ায়,
উঠ্‌বে একদিন অটুট গুম্ফা,—
টুং স্থং বস্তির কামনা-জড়ানো পাথরে পাথরে
আকাশের খুব কাছাকাছি।
বস্তি ছেড়ে একটু তফাতে,
পাইনিয়া বনের ধারেই,

দেখা যায় ভিখ্-ঝর্ণা নেমে এসেছে,—
সে যেন তিন পাহাড়ের আশীর্ব্বাদ
ঝ'রছে দিনরাত ধারা দিয়ে ত্রিধারায়।

এইখানটিতে দিনরাতই
রৌদ্রে-ছায়াতে লতায়-লতায়,—
মনের কথা চলাচলি করে,
ঝর্ণার জলে অচল পাথরে
কথা হয় যেন কত কী !
তল্লাটে মেয়েরা আসে,
দূর দূর থেকে এইখানে,
মানসিক্ দিতে ঝর্ণাতলায়,
মান্সা—পুজোর ডালা ব'য়ে
অপরাহ্লে রোজই আসে
মেয়ে কয়টি একা দোকা।
ভিখ্-ঝর্ণার উপরে নীচে, অরণ্যে পাহাড়ে
আছেন দেবতা এক্‌লাটি,
ঝর্ণার বুকে জমা করা পাষাণ
সেখানে আছেন তিনি চিরদিনই,—
—দাঁড়িয়ে আছেনই সাদা কালো শিল-পাটে পা রেখে—
মানস জানাতে তিনি, মনখানি জানতেও তিনি।
তিনি বনের দেবতা,—
বসেন সকালের ফুলে, সন্ধ্যার ফুলে, রাতের ফুলে ;
তিনি জলের দেবতা,—
আছেন ঝর্ণায়, আছেন নদীতে, আছেন সাগরেও ;
জন্মমাটির দেবতা তিনি,—
জাগেন স্রোতে-ঘেরা পাথরে,
ঘুমান পদ্মবনের গোড়াতে একলা,
—পক্ষে পক্ষে পুজো নেন্ তিনি বস্তির মেয়ের।

মন জানিয়ে কত কী লেখা নতুন নিশান,—
এপার গাছের নতুন পাতায়,
ওপারে গাছের ফুলের ডালে,—
জল ঝরে মাঝে পাথরে পাথরে।
এইখানে দেয় মানসিক বস্তির মেয়েরা,—
—ধরে বেজোড় ফুল, নতুন পুতুল পিটুলীর, বাতি ধূপের
মানস জানিয়ে পূজা করে মনে মনে,—
ফেরে সে যার বস্তিতে একা দোকা,
জলতে থাকে ঝর্ণা-তলায় মান্সা-পিদুম—
একটি, দুটি, তিনটি।

বাতাসের মুখেই ধরা
মনের-কথা-জানানো বাতি,—
যত্নে-তোলা বেজোড় ফুল,—
পল্‌কা পিটুলির খেলার পুতুল,—
কত নেভে, কত থাকে জলে,—
কত ভেসে যায়, কত বা শুখায়,—
কত ভেঙ্গে পড়ে, কত পায় ক্ষয়,—
সংখ্যা নেই তা'র!
সাঁজ-সেজুতীর বেলাশেষে
যখন হিম হ'ল রোদ,—
ঘুমিয়ে গেল মোনান্ পাখী সোনালী রূপালী,
—আলিসে-হেলা পলাশ-ডালে
যেন সে ফুলটি জোড়-ভাঙ্গা,—
সন্ধ্যাতারা এল চুপে চুপে,—
পূজার বেলায় মানস-পিদুন্
নামিয়ে রাখলে বনের ধারেই,
নিরিবিলি এ-সময় ভিখ্-ঝর্ণাতে
মেয়েদের দেওয়া মান্সা-পিদুম

যে-কথা জানায় মানস-দেবতাকে নিরালা পেয়ে,
বস্তির মেয়ের মনই জানে তা'র সন্ধান।
আকাশে-ধরা তারার পিদুম্
নিত্য জ্বলে, নিত্য নেভে,
ঝর্ণায় দেওয়া মান্‌সা-বাতি
এই জ্বলে, এই জ্বলে না,—
বস্তির মেয়ের মনের কোণে মান্‌সা নিত্যই
মনে মনে জ্ব'লে, মনেতে মেলায়—তিনসন্ধ্যা।
রাত্রিমুখে পরাহু-পাখী ডাকাডাকি করে,—
আঁখ্‌লী-ফুলের কাঁটার বেড়ায় ;
দিন হয় শেষ রঙে রঙে ঝড় উঠিয়ে,
পাহাড়ে পাহাড়ে চমকায় রঙ,—
পদ্মরাগ নীলকান্ত অয়স্কান্ত,
ইন্দ্রধনুর রঙের টঙ্কার বাজে মেঘে মেঘে,—
ফুটে ওঠে ফুল শিমুল, পলাশ, করবী, কাঞ্চন,—
ঝলক দেয় পাতা হরিৎ-পীৎ, নীল-পীত, নীলারুণ,—
রঙ ফেরায় দিক্ বিদিক
বহুরূপ, বহুরঙ।

চক্‌বাজারে সিনেমা হাউস
জ্বালে এ সময়ে বিজলী-বাতি,
চলে সবাই বস্তির মেয়েরা,—
চলন্ত-ছবির তামাসা দেখ্‌তে,
রঙ্গিনী সব, রঙ্গীন সাজ,
বড় রাস্তায় হেলে দুলে চলে,
—হর্‌দী কম্‌লী শ্যাম্‌লী সুরথী—
ঝিলিমিলি রঙ চমকায় পুতির গহনায়,—
ফিরোজী কাঁচের বুক পাটায়,—
ফুলকাটা সাটিনের আঙ্গ রাখায়,

সোনার হারে, গালার চুড়ি মখমলে কম্বলে ;
নতুন ক'রে সেজেছে সবাই,
রুখু চুলে বেণী দুলিয়ে চ'লেছে পান খেয়ে ;—
থিয়েটারে শেখা বাংলা গান মুখে মুখে সবারই,
—নয়নবাণ ভুরুধনুর খিচুড়ি পাকানো গান—
সিনেমা-হাউসের সাইনবোর্ডের কাছেই,—
আধা-পরিষ্কার আধা-ঘোলাটে বিজলী-বাতির
ফানুস ঘিরে পতঙ্গ যেন ঘোরেফেরে সবাই,
সাপের মতো কুণ্ডলী পাকানো,—
জ্বলন্ত তার-বিজুলীটা,—
আলোর ধাঁধা দিয়ে চায় অন্ধকারে ;
লামার পাহাড়, ভিখ্ঝর্ণা
দেখে না আর বস্তির মেয়েরা—
মনের কোণেও !
তিন পাহাড়ের তিনটে রঙ নেভে আস্তে এ সময়ে,—
ওঠে চাঁদ, টোল্-খাওয়া গোল,
—ত্রিশির ভৈরবের মস্ত চোখ্টা চেয়ে দেখে যেন ;—
টুং সুং লামার পাথরের স্তূপটা মশানের ধারেই
দেখায় আকাশের গায়ে কালি দিয়ে টানা ;
অন্ধকারে সবার উপরে ফুটে ওঠে ধব্লাগিরি
—শিলী-সাদা, ফেনা-সাদা, ধুতুরী-সাদা !
দুপুর রাতে বিজলী-বাতি
সিনেমা হাউসে নেভে দপ্ করে,—
ঘুরে ফেরে বস্তির মেয়েরা,—
চাঁদের আলো ঠাণ্ডা লাগে চোখে,
দোকান পাট বন্ধ এখন,
কাফি-খানা ফেলেছে ঝাঁপ,
রাস্তায় প'ড়েছে ঘরের ছাওয়া সুর্মি-কালো—
একটা, দুটো, তিনটে ॥

উত্তরা

(১)

উত্তর পর্ব্বতের মেঘ আর কুয়াসাতে নিরুত্তর দিক, এরি বুকে পাষাণে-গড়া চারটি মিনার—আলিফ্ অক্ষরের মতো সরল সুন্দর! এরি একটি মিনার সেই শুধু বলে মানুষের গলার সুরে সুরে—"লা-ইলাহ-ইল্লাল্ল" এরি প্রতিধ্বনি দেয় উত্তরের পর্ব্বত-চূড়া একের পরে এক সকালে, সন্ধ্যায়, রাতে!

(২)

উত্তরে তুষার পর্ব্বতের নিশ্চল তরঙ্গ, দক্ষিণে পাহাড়-তলায় যতদূর দেখা যায় কেবলি মেঘ আর কুয়াসার সমুদ্র, এরি মাঝখানে একটি কালো পাথর আর তাকে জড়িয়ে একটি বনলতা!

পাথর সে কাঞ্চনশৃঙ্গের দিকে চেয়ে সকাল-সন্ধ্যা সোনার আলো-মাখা মস্ত একটা স্বপ্ন দেখলে আর বনলতা সে পাহাড়-তলার দিকে চেয়ে মেঘ-সমুদ্রের তলাকার সবুজ বন আর ধানে-ভরা মাঠের স্বপ্ন দেখলে! এই দুই স্বপ্ন এক হয়ে একটি সোনার পাতার রূপ ধরে বেরিয়ে এল—গোপন একটি ঝরনার ধারে!

উত্তর থেকে হিম-বাতাস কাঞ্চন-শৃঙ্গের কথা তার কানে কানে বলে যায়, পাহাড়তলী থেকে মেঘ উঠে এসে তাকে সবুজ বনের খবর জানায়, সবুজ বৃন্তে বাঁধা সোনার পাতার মন কালো পাথরের উপর থেকে উঁকি দেয় এদিকে ওদিকে, ঝরনা সে দিনরাত শুনিয়ে চলে তাকে অকূল কালো জলের ডাক।

(৩)

উষার আলো শীত-কাতর পাখীর মতো প্রহরের পর প্রহর চুপ করে সামনের পাহাড়ে বসে আছে, বরফের একটা চূড়া আকাশের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে স্থির হয়ে হারানো সূর্য্যের ধ্যান করছে—একটা ঝরনার পাথর তরায়ের জঙ্গলে ছোট্ট একটি নদীর দিকে ঝুঁকে রয়েছে, আর একটা পাতা-ঝরা শীতের গাছ দেখছে চুপটি করে—রঙ্গীন প্রজাপতির মতো একদল বাগানের কুলি চা-ক্ষেতে উড়ে বসেছে!

বারোয়ারি উপন্যাস-এর অধ্যায়

(১৮)

দুর্গামণির পরামর্শ-মতো সতীশ মৈত্র মশায়কে একটা তার কোরে উত্তরের অপেক্ষায় রইলো; কিন্তু মৈত্র-মশায় তখন যোগেন মিত্তিরকে নিয়ে কলকাতায় রওনা হয়েছেন, কাজেই সতীশের তার বিনা-উত্তরে কালিগাঁয়ে যেমন গিয়েছিল, তেমনি ফিরে এল। কালিগাঁয়ের পাঁচ ক্রোশ দূরে বেলতলী-ষ্টেশনের পোষ্ট-মাষ্টার সতীশের তারের জবাব দিলেন—"এড্রেসী নট্ ফাউণ্ড।"

টেলিগ্রাফের তারের মতো রুলটানা নিষ্ফল গোলাপি কাগজটা হাতে কোরে সতীশকে শুক্‌নো-মুখে আসতে দেখেই দুর্গামণি বুঝলেন, খবর খারাপ। তিনি আর কোনো কথা না শুধিয়ে সতীশকে বল্লেন—"বাবা, আমি একবার দেশে যাবো, কোনোগতিকে আমাকে সেখানে পাঠাতে পারিস ?"

সতীশ খানিক ভেবে বল্লে—"পারি। দারাগঞ্জের সতীশবাবুর স্ত্রীর অসুখ; দেখতে তাঁর মা কলকাতায় যাচ্ছেন; তুমি তাঁদের সঙ্গে গেলে বেলতলিতে তাঁরা তোমায় নামিয়ে পাল্কি চড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু তুমি দেশে যাবে কি করতে ? এখানে তো বেশ একরকম—"

দুর্গামণি সতীশের কথায় বাধা দিয়ে বোলে উঠলেন—"না না, আমার না গেলে চলবে না। আর একটি ভালো মেয়ে দেখে তোর আবার বিয়ে দিতে হবে।"

কমলার দুর্নাম রটিয়ে বেনামি চিঠি পাওয়া অবধি সতীশের মাথায় সন্ন্যাস-করবার একটা প্ল্যান ক্রমাগত ঘুরছিল; এবং এই প্ল্যানটা নিয়ে সে তার গুরুদেব আত্মানন্দ স্বামীজীর সঙ্গেও ইতিমধ্যে দু-একবার খুব গভীরভাবে আলোচনা কোরে একরকম সংসার ত্যাগ করাই স্থির করেছে; কিন্তু আজ হঠাৎ তার মা তাকে আর একবার সংসারের ফাঁস-কলে ফেলার চেষ্টায় আছেন জানতে পেরে সতীশ বিষম ভাবিত হয়েই দুর্গামণিকে কিছু আর না বোলেকয়েই সোজা গুরুজীর আখড়ার মুখে দুপুর-রোদে একটা ভাঙা ছাতা-মাথায় বেরিয়ে পড়লো।

গোমতী নদীর ধারেই দিব্বি একটা ছোটো-খাটো ইমারতে সতীশের গুরুজী গুরু-মাতার সঙ্গে আখড়া বেঁধে অনেকগুলি বাঙালী উকিল আর কেরানি চেলার সেবা নিয়ে সুখে বাস করছেন। দুপুরের রোদে তেতে-পুড়ে সতীশ সেখানে হাজির। গুরুজী তখন আহারের পর মৃগচর্ম্মের আসনে আধ-বসা আধ-শোয়া অবস্থায় ভাগবতের পুঁথিকে বালিশ কোরে নিত্য-নৈমিত্তিক ধ্যানে ছিলেন; কাজেই সতীশকে বাইরে অপেক্ষা করতে হলো।

আখড়ার বারাণ্ডার সামনেই গোমতী নদী মস্ত একটা বাঁক টেনে চলে গেছে; তার ওপারে ধূধূ মাঠ; সেই মাঠে গোটা-কতক রোগা গোরু শুকনো ঘাস খুঁজে-খুঁজে চোরে বেড়াচ্ছে; —এই ছবিটা দেখতে দেখতে বাংলার একটা গণ্ডগ্রামের ঘর কন্নার গোটা-কতক দিন সতীশের মনের মধ্যে আজ এমন স্পষ্ট হয়ে আনাগোনা করতে লাগলো যে এক-সময়ে তার সন্ন্যাসের প্ল্যান গোমতীর স্রোত ধোরে কতদূর ভেসে গেল তার ঠিকানাই নেই। হঠাৎ ঘরের মধ্যে মোটা গলায় একটা হুঙ্কার শুনে চমকে-উঠে সতীশ বুঝলে, গুরুজী জেগেছেন। সে আস্তে আস্তে ছাতা আর জুতো বাইরে রেখে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে। তখন বেলা প্রায় তিনটে।

দূর থেকে গুরুজীকে ঢিপ্ কোরে একটা প্রণাম দিয়ে মাটির উপরে সতীশ সোজা হয়ে বসলে, গুরুজী ঘুমে-ভারি দুই চোখ সতীশের দিকে ফিরিয়ে বল্লেন —"বসো, খবর কি?"

সতীশ হাতদুটো খানিকটা জোড় কোরে, খানিকটা মুঠো কোরে উদাস সুরে বল্লে—"বড় বিপদ স্বামীজী! মা আবার আমার বিবাহ দেবার জন্যে দেশে চলেছেন—মেয়ে দেখতে।"

গুরু "হু!" বোলে কেবল একটা নিশ্বাস ফেলেই আসন ছেড়ে ওঠবার উপক্রম করছেন দেখে সতীশ একেবারে তাঁর পা জড়িয়ে বল্লে—"আমার এখন কি উপায় হবে ঠাকুর?"

গুরু আকাশের দিকে দুটো ঝাঁকড়া ভুরু খুব-খানিকটা তুলে বল্লেন—"বাপু, সংসার মায়াময়! সেখানে আশঙ্কার অন্ত নেই, জ্বালাও অত্যন্ত। আমি তো বলি তুমি সোজা বেরিয়ে পড়; আর দেরি কোরো না।"

সতীশ মুখটা অত্যন্ত কাচুমাচু কোরে বল্লে—"কিন্তু আমি যে দুই সমস্যার মধ্যে পড়লুম! এদিকে মাতৃ-আজ্ঞা—বিয়ে করতে; ওদিকে প্রভু বলছেন,

সংসার ছাড়তে !"

গুরু একটু গম্ভীর হয়ে বল্লেন—"তাহলে মাতৃ-আজ্ঞাই পালন কর। মুক্তির আশা ছেড়ে দেও।"

এই 'ছেড়ে দেও' কথাতেই গুরুর বাঙালে রাগ একটুখানি ঝিলিক দিয়ে গেল। সতীশ আরো কাচুমাচু হয়ে বল্লে—"তা কি হয়? আমি সংসার না করাই তো স্থির করেছি কিন্তু—"

গুরুজী মস্ত একটা হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বল্লেন—"ওই কিন্তুই হলো সর্ব্বনাশের মূল! এইটুকু থাকে বোলে সাধন কোরেও তিন জন্মের পূর্ব্বে মুক্তিলাভ করতে কাউকে বড় একটা বড় একটা দেখলুম না।"

সতীশ অবাক হলে বল্লে—"বলেন কি! তিন জন্ম কঠোর সাধন কোরে তবে?"

"তিনটে জন্ম আন্দাজ লাগে দেখছি?"

সতীশ নিশ্বাস ফেলে বল্লে—"তাহলে আমার তো কোনো আশাই নেই দেখছি! তিনের উপরে তিন জন্মও আমার 'কিন্তু' ঘোচে কি না সন্দেহ!"

আত্মানন্দ খুব গম্ভীর হয়ে বল্লেন—"গুরুতে ভক্তি-নিষ্ঠা রেখে, তাঁর আদেশ পালন কোরে চল্লে, এক-জন্মেই মুক্তি পাওয়া যেতে পারে।"

সতীশ অত্যন্ত কাতর স্বরে বল্লে—"মনে যে 'কিন্তু' আপনা-আপনি ওঠে! না হলে আপনার আদেশ তো আমি যথাযথ পালন করছি।"

আত্মানন্দ শুধোলেন—"কি বিষয়ে তোমার কিন্তু হচ্ছে শুনি?"

সতীশ বোলে চললো—"অনেকগুলো বিষয়ে 'কিন্তু' রয়েছে। সর্ব্বপ্রধান—হচ্ছে আমার স্ত্রীর চরিত্রসম্বন্ধে. ওই বেনামি চিঠিটার উপরে। তার পর দ্বিতীয়—সংসার করা, কি নয়? নির্জ্জন বাসে যাওয়া, কি বাসায় বসে সাধন করা? সবার চেয়ে শক্ত কিন্তুটা হচ্ছে চাকরি ছেড়ে মাকে অনাহারে মারা, এবং কমলাকে ছেড়ে নিজেও মরা কি না?"

সতীশ রোদে তেতে-পুড়ে এসেছিল, আর গুরু ছিলেন ঠাণ্ডা ঘরখানিতে ঘুমিয়ে; কাজেই গুরু অতি কোমল স্বরে ডাকলেন—"সুধীর, বাবা, এদিকে এস তো।" গেরুয়া-আলখাল্লা পরা নেড়া-মাথা ধীরানন্দ বাবাজী একটা লোটা-হাতে উপস্থিত হলেন। আত্মানন্দ সতীশকে দেখিয়ে বল্লেন—"বাবা সুধীর' একে একটু জল-টল খাইয়ে ঠাণ্ডা কোরে আন; আমি ততক্ষণ হাত-মুখগুলো

ধুয়ে আসি।”

সতীশ গুরুজীর খড়ম-জোড়াটা এগিয়ে দিলে তিনি খটাস-খটাস কোরে অন্দরের দিকে চলে গেলেন। একটা বাঁদর খড়মের শব্দে ঘুম ভেঙে গুরুজীর বৈকালি-ভোগের প্রসাদ-কণার লোভে ঝুপ্-কোরে ছাদের উপরে লাফিয়ে পড়লো।

সতীশ নিশ্বাস ফেলে ধীরানন্দের দিকে চেয়ে বল্লে—“আমার ভাই মুক্তি নেই। গুরু বল্লেন, অন্তত তিন জন্ম ফেরাফিরি করতে হবে।”

ধীরানন্দ হেসে বল্লেন—“আর আমি যদি এমন ওষুধ বাৎলে দিই যাতে এক-জন্মেই মুক্তি, তো কি দিবি ?”

সতীশ কাতর হয়ে বল্লে—“আমার আর কি আছে ? জন্ম-জন্ম তোর কেনা-গোলাম হয়ে রইব।”

ধীরানন্দ সতীশের পিঠ চাপড়ে বল্লে—“আরে এক জন্মেই মুক্তি পেলি তো জন্ম, আবার জন্ম আসে কেমন কোরে ? বৃন্দাবনে চলে যা ; সেখানে ময়ূর বানর সব এক-জন্মে মুক্তিলাভ করছে দেখতে পাবি।”

সতীশ গম্ভীরভাবে বল্লে—“কিন্তু গুরু যে বলেন আমাকে হিমালয়ে গিয়ে নির্জ্জন বাস করতে। আচ্ছা ভাই, তোর কি মনে হয় ? কমলাকে ছেড়ে, মাকে ছেড়ে, এখনি যদি চলে যাই, তবে তাদের উপর অবিচার করা হবে না ?”

ধীরানন্দ একটু হেসে বল্লে—“যদি চাকরিতে একেবারে ইস্তফা দিয়ে পালাও, তবেই অবিচার হবে ; না হলে ‘সিক্-লিভ্’ নিয়ে দিনকতক গা-ঢাকা হোলে এই নানা দুর্ভাবনা থেকে মুক্তি তো পাবিই, আর-একটু মাথাটা ঠাণ্ডা হয়েও আসতে পারবি।”

সতীশ উৎসাহের সঙ্গে বোলে উঠলো—“তোর কথাতেই রাজি ! আজ ছুটির দরখাস্ত দিয়ে মাকে বাড়ি পাঠিয়ে আসবো।”

ধীরানন্দ হেসে বল্লে—“যা করতে হয় এইখানে বসে কর্ ! বাসায় গেলে আবার মনটা ‘কিন্তু’ করতে পারে। চল্ এখন কিছু খাবি।”

সতীশ মাথা নীচু কোরে ভাবতে-ভাবতে সুধীরের পিছনে-পিছনে আখড়ার উঠোন পেরিয়ে একটা পোড়ো বাগানের খিড়কির গায়ে সুধীরের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

একবার বিয়ে করতেই সতীশের আপত্তি ছিল; কেবল কমলার দেখা পাওয়া গিয়েছিল বোলেই সেবারে দুর্গামণি সতীশকে বাঁধতে পেরেছিলেন। বাঁধন একটুখানি আল্‌গা হতেই সতীশের বৈরাগ্য-রোগটা আবার দেখা দিয়েছে: এবং আত্মারাম স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই সতীশের ধর্ম্ম প্রদীপ ক্রমেই উস্কে তুলে যাচ্ছেন; কাজেই দ্বিতীয় বার বিয়েতে সতীশ ঘাড় পাতবে না, দুর্গামণি বেশ জানতেন; কিন্তু তবু লক্ষ্নৌয়ের বাসাটায় বসে না থেকে, জগদীশপুরে ফিরে গেলে তিনি যে একটা-কিছু উপায় করতে পারবেন, সেটা তাঁর ধ্রুববিশ্বাস। আর সেই জন্যেই দুর্গামণি সতীশের গুরু-বাড়ি থেকে ফেরার অপেক্ষায় না থেকে নিজের কাপড়-চোপড় বাক্স-পেঁট্‌রা গোছাতে বসে গেলেন।

সন্ধ্যা হ'য়ে এল। কাছারির ফেরতা বড়-বড় দাড়িওয়ালা নাজির আর কাজিরা আল্‌পাকার জোব্বা আর মোড়াসা মাথায় সরু গলিটার মধ্যে নিজের গরীবখানায় ফিরে আসছে। এক্কাগাড়িগুলো ঝাঁকানি দিতে-দিতে পাথরের রাস্তায় খট্‌-খট্‌-খটাস্‌ শব্দ কোরে আর ঝিন্‌-ঝিন্‌ ঘুঙুর বাজিয়ে কোতোয়ালী থেকে বেরিয়ে সোজা সহরের বাইরে চলেছে—টিক্‌টিকির মতো ঝোলা-অবস্থায় তরো-বেতরো সোয়ারী নিয়ে। সতীশদের বাড়ীর সাম্‌নের বাড়ীর লালকাঠের একটা ছোট বারাণ্ডায় একটা নাচনী নানা-রঙের ওড়না-ঘাঘরায় যেন সবুজ টিয়া পাখীটি সেজে একটা গড়গড়ায় কেবলি টান দিচ্ছে; আর নীচে একটা পানওয়ালার দোকানে চাপকান চুড়িদার-লপেটা-পরা-অনেকগুলো মাদ্রাসা থেকে ছুটি-পাওয়া খান ও খানানের ভিড় জমেছে। রাস্তার ওধারে নবাবী-আমলের একটা ইমামবারা ধুলো আর সন্ধ্যার আলোর মাঝে একটা ঝাপসা রঙের গম্বুজ দিয়ে অনেকটা আকাশ ঢেকে রয়েছে। দূর থেকে একটা বিউগিল্‌ ভোঁ ভোঁ কোরে একটা একঘেয়ে বিজাতীয় স্থর সহরের সব গোলমালের উপরে ছড়িয়ে বাজতে লেগেছে। দুর্গামণি আপনার বাসার দোতলার গরাদে-দেওয়া জান্‌লার ধারে বসে সতীশের আসার অপেক্ষা করছেন, এমন সময় সুধীর ওরফে ধীরানন্দ বা ধীরেন-বাবাজী এসে বল্লে—"মা, আপনার কি সমস্ত গোছানো হয়েছে? ও-পাড়ার সতীশবাবুরা ষ্টেশনে যাচ্ছেন। চলুন, আপনাকেও তাঁদের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

দুর্গামণি একটু অবাক হয়ে বল্লেন—"আর আমার সতীশ এল না? তার

সঙ্গে দেখা না কোরে—"

সুধীর আল্‌খাল্লার পকেট থেকে একটা চিরকুট কাগজ বার কোরে দুর্গামণির হাতে দিয়ে বল্লে—"পড়ে দেখুন, সতীশ কি লিখেছে।"

দুর্গামণি বল্লেন—"তুমি পড়ে শোনাও বাবা, আমি পড়তে পারিনে। সে ভালো আছে তো?"

সুধীর চিঠি পড়তে লাগলো। চিঠির মর্ম্মটা এই—

"মা, আমি বুঝেছি, তুমি কেন দেশে যাচ্ছ। স্থির জেনো আমি আর সংসার করবো না। তোমার আদেশে আমি প্রথম সংসার পেতেছিলেম—শুধু তোমার আদেশ বল্লে মিথ্যে বলা হয়, সেবারে আমারো একটু তাড়া ছিল সত্যি—কিন্তু বিধির ইচ্ছা অন্য-রকম। তিনি আমাকে পাকে-চক্রে মুক্ত কোরে দিয়েছেন। এ ক'টা দিন যেন নভেলের কটা পরিচ্ছেদ উল্টে-পাল্টে পড়ে গেয়েছি। এখন স্বাধীনভাবে জীবনের আসল লক্ষ্য-সাধন করবার আমার সময় এসেছে, বুঝছি। আর গুরুদেবও এই কথা বলেন। সুতরাং তাঁরি আদেশ শিরোধার্য্য কোরে আমি কিছুদিনের জন্যে হিমালয়ের কোন নির্জ্জন বাসে সাধন-ভজন করতে চল্লেম। আমাকে ক্ষমা কোরো। এই আমার গুরু-ভাই ধীরানন্দ, ইনি তোমায় সতীশবাবুদের কাছে ষ্টেশনে পৌছে দেবেন। সমস্ত বন্দোবস্ত আমি ঠিক কোরে দিয়েছি ইতি সেবকাধম সতীশ।"

অত বড় চিঠিখানার মধ্যে কেবল হিমালয় আর সাধন—এই দুটি কথা দুর্গামণি বুঝলেন। আর বুঝলেন, তাঁকে দেশে যেতে হবে, সতীশ আসবে না। এমন কোরে সতীশ পালাবে, দুর্গামণি স্বপ্নেও ভাবেন নি। তিনি আঁচলে চোখ মুছে চল্লেন। ধীরেন-বাবাজী পোঁটলা-পুটলি মুটের মাথায় চাপিয়ে এক্কাগাড়ির পর্দ্দাটা নামিয়ে দিয়ে সতীশের মাকে ষ্টেশনে ওঠাতে সঙ্গে চল্লো।

সতীশের স্বভাবটা বরাবরই কেমন-একটু বৈরিগী-গোছের। হঠাৎ কমলাকে দেখবামাত্র রূপের নেশা তাকে পেয়ে বসেছিল; এবং কমলা আসা অবধি সতীশের বৈরাগ্য-পরিধি প্রেমবারিধি হয়ে একেবারে উছলে উঠেছিল এবং ক্রমেই সংসারের কূলের দিকে তার মনের ঢেউগুলোও এগিয়ে আসছিল, এটা দুর্গামণি যেমন লক্ষ্য করেছিলেন, এমন আর কেউ নয়। কিন্তু আজ তাঁর লক্ষ্মী-বৌ কমলার চাঁদমুখটি সরে গেছে, সতীশকে নিয়ে তার বৈরাগ্য আর-একবার

অকুলের দিকে ফেরবার উপক্রম করছে। ছেলের গলায় আর একটি সংস্কার না ঝুলিয়ে দিলে সে পালাবে, এটা দুর্গামণি বুঝেই কমলার শূন্য আসনটি আর একটি লক্ষ্মী-বৌ দিয়ে ভর্ত্তি করবার চেষ্টায় দেশের মুখে ছুটলেন—সতীশকে বোঝাবার বা দেখবার অপেক্ষা না রেখেই।

ওদিকে সতীশ কমলা-সম্বন্ধে নিদারুণ চিঠিটা পেয়েও বিশ্বাস করেনি, কমলা এতটা করবে! সে মনে মনে ব্যথা পাচ্ছিল, কিন্তু তবু এক-এক-সময় তার ভিতর থেকে কে যেন বলছিল—যা হবার তা তো হয়ে গেল ; এখন আর কেন? বেরিয়ে পড়াই ভালো! সাধের বাঁধন যখন ছিল, তখন ছিল ; কিন্তু এখন যখন সেটা আপনা-হতেই খস্‌লো তখন বুঝতে হবে সেটা গুরু কৃপা বলেই ঘটেছে ; অতএব এই মহা সুযোগ ; আর সংসারে ফেরা নয়! আবার মনে হয় কমলা কি সত্যি দোষী? একটা বেনামি চিঠির উপরে নির্ভর কোরে তাকে চিরকালের মতো ভাসিয়ে দেওয়া কি উচিত হয়? এক-একবার সতীশ মনে করে, সবিশেষ তদন্ত করার জন্যে একবার তার কালিগাঁয়ে যাওয়াটা হিমালয় যাওয়ার চেয়ে বেশি দরকারি, কিন্তু তখনি মনে একটা ত্রাস জাগে—গুজবটা যদি সত্যি হয়!

সতীশ এমনি হিমালয় ও কালিগাঁ দুটোর মধ্যে দুলছে ; আর একবার আফিস, একবার খালি বাসা, একবার গুরুর আখড়ায় যাতায়াত করছে।

ও, আর, আর, গাড়ি পাঞ্জাব-মেলে রূপান্তরিত হয়ে দুর্গামণিকে বেলতলিতে নামিয়ে কলকাতায় পৌঁছে যাবার হপ্তাখানেক হয়ে গেলেও সতীশ ছোকরা যেখানকার সেইখানেই রইলো,—এক-পাও হিমাচলের দিকে গেল না। কিন্তু মনটি তার মুক্তির জন্যে ধড়ফড় করছে, সেটা তার মুখ দেখেই আখড়া ও আফিসের সবাই বুঝলে ছুটিটা মঞ্জুর হয়ে এলে সতীশ কোন্‌দিকে নড়বে,—উত্তর-পূর্ব্বে, না দক্ষিণ-পূর্ব্বে, সেটা নিয়ে তার পরিচিতদের মহলে বাজি খেলাও চলতে সুরু হয়ে গেল—সতীশের সামনে এবং আড়ালে।

২০

সতীশ যখন এইরকম দোদুল্যমান অবস্থায়, সেই সময় ওধারে অরুণ সকালে উঠে কমলার চিঠি বুকের পকেটে নিয়ে ক্ষিতীশের চায়ের টেবিলে এসে বসলো। এ-আলাপ, সে-আলাপ খবরের কাগজ, চায়ের পেয়ালা, সিগারেটের ধোঁয়া আর বাইরের গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি ও সার্সি-বন্ধ ঘরের ভ্যাপ্‌সা গরমের মধ্যে এক-সময় ক্ষিতীশ অরুণকে শুধোলো, "এই বৃষ্টিতেই কি অরুণ

দেশে যাবে ?” অরুণ ঘাড় নেড়ে বল্লে—“না, একবার সতীশের সঙ্গে দেখা কোরে তবে দেশে যাব।”

ক্ষিতীশ বোলে উঠলো—“লক্ষ্ণৌ যাবে নাকি ? সেখানে তো সতীশবাবু নেই। আমরা সেদিন খোঁজ নিয়ে এলেম, তিনি স্ত্রীর অসুখের ছুতো করে তাঁর মাকে নিয়ে জগদীশপুরে চলে গেছেন।”

অরুণ চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বলে উঠলো—“না, আমি জগদীশপুরে যাচ্ছি—সাতটা উনপঞ্চাশের গাড়িতে। দিদিকে একবার বোলে আসি।”

কমলার সঙ্গে দেখা কোরে অরুণ ফিরে এল—একটা সিগারেট ধরিয়ে মুখে দিয়ে, আর গোটা-আষ্টেক মায় দেশালায়ের বাক্সটা ডোরাটানা টুইলের কোটটার পকেটে ফেলে। হরেনকে বল্লে—“হরেনদা চল্লুম।” তারপর চটি জুতোটা চটাস্-চটাস্ করতে-করতে বেরিয়ে গেল। ক্ষিতীশ খানিক চুপ কোরে থেকে বল্লে—“অরুণ কি সতীশবাবুর দেখা পাবেন ?”

হরেন বল্লে—“পেতেও পারে।”

ক্ষিতীশ খানিক অন্যমনস্ক থেকে বোলে উঠলো—“আমার কেমন মনে হচ্ছে, এ যাত্রায় অরুণও নিরাশ হবে।”

হরেন কোন জবাব না দিয়ে আপনার মনে কি ভাবতে লাগলো।

সকাল সাতটা উনপঞ্চাশের প্যাসেঞ্জার বেলা একটায় বেলতলিতে অরুণকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। অরুণ তার ব্যাগ আর ছাতাটা প্ল্যাটফরমের সাদা কাঠের রেলিঙের গায়ে ঠেসিয়ে রেখে একখানা গাড়ির সন্ধান করতে ফটকের দিকে চলেছে, দেখলে, একদল যাত্রাওয়ালা ষ্টেশনের দুটো কেরাঞ্চি আর চারখানা গোরুর গাড়ি দখল কোরে কাগজের ফুল, সাজ-ঘরের তোরঙ্গ, হারমোনিয়ামের বাক্স ইত্যাদিতে বোঝাই হয়ে ফ্লুট বাজাতে-বাজাতে পান চিবোতে-চিবোতে রৈ রৈ কোরে চল্লো। সব-শেষে অরুণের চেনা একটা মুটে দুটো এ্যাসেটিলেন গ্যাসের বাতি মাথায় কোরে যাচ্ছিল ; সে অরুণকে ডেকে বল্লে—“কালিগাঁয়ে যাবে নাকি বাবু ? দেন আমার হাতে ব্যাগটা। গাড়ি পাওয়া যাবে না।”

“জগদীশপুরে যেতে হবে।” বোলে অরুণ মুটেকে ব্যাগটা দিয়ে বল্লে—“সতীশের বাসায় চল্।”

“সতীশবাবুতো নেই। বাসায় মাঠাকরুণ একলা আছেন।” বোলে মুটে হন্‌হন্ কোরে এগিয়ে চল্লো।

অরুণ একবার ভাবলে—তবে আর গিয়ে কি লাভ? আবার বল্লে,—"তাই চল্; মা-দুর্গাকে দেখে না হয় কালিগাঁয়েই যাবো একবার।"

ভাদরের আকাশ মেঘলা হলেও বাতাসের লেশমাত্র ছিল না। তার উপর সাম্‌নে যাত্রাওয়ালাদের চলতি গাড়িগুলো মেটে রাস্তায় বিষম ধুলো উড়িয়েছে। অরুণ একটার পর একটা সিগারেট পোড়াচ্ছে আর যাত্রার অধিকারীকে অভিশাপ দিতে দিতে চলেছে। তার মুটে সদররাস্তা ছেড়ে হাঁটা-পথে কোন্ দিক দিয়ে কোথায় যে গেছে, তার আর দেখা নেই। এমন সময় সামনের একখানা কেরাঞ্চি গাড়ি চাকা ভেঙে হঠাৎ রাস্তার মাঝে কাৎ হয়ে পড়লো। গাড়ির ছাদ থেকে গোটা-কতক ফ্লুট ক্লারিওনেট আপনার-আপনার বাক্স ছেড়ে এবং মধ্যে থেকে নিজেদের আসন ছেড়ে গোটা-ছয়েক ছোকরা এবং আধা-বয়সী যাত্রার দলের বাবু পানের পিক্-মাখা সার্ট আর পমস্থ নিয়ে ছিটকে ধুলোয় পড়লো। অরুণ এই দুর্ঘটনার দিকে দৃকপাত না কোরে হন্ হন্ কোরে সোজা বেরিয়ে গেল। তারপর আর-এক-সময়ে অরুণ দেখলে, রাস্তার ধারে আর-একটা ঠিকে-ঘোড়া যোত ছিঁড়ে কেবলি লাথ্ ছুঁড়ছে আর গাড়ির মধ্যেকার লোকগুলো কেবলি ঘোড়া আর গাড়োয়ানকে গাল পাড়ছে, কেউ বা গানও ধরেছে। এমনি নানা ঘটনার মাঝ দিয়ে, ধুলোয় আর ঘামে মিলিয়ে একটা আধ্‌শুক্‌নো আধ্-ভিজে চেহারা নিয়ে অরুণ গ্রামে পৌঁছলো—বেলা সাড়ে চারটেয়।

গ্রামের একটিমাত্র রাস্তা; তারি দুধারে ঘর-বাড়ি, দোকান-পাট পঞ্চাননতলা, ঠিকেগাড়ির আস্তাবোল, ইস্কুল-বাড়ি, ডাক্তারখানা সমস্তই—মায় একটা চেরিটেবেল্ ডিস্পেন্‌সারি—যেখানে কুইনাইনের বদলে ময়লা ময়দার গুঁড়ো দেওয়া হয়; আর একটা "জগদীশ হল ও পবলিক্ লাইব্রেরী এণ্ড ক্লব।" সেখানে প্রবন্ধ পাঠ, বারোয়ারী পূজো, করপোরেসন মিটিং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের গলায় মাল্যদান ও ওইদিন থিয়েটার যাত্রা বা বায়স্কোপে স্ত্রীস্বাধীনতাও কখনো-কখনো হয়ে থাকে।

অরুণ তেতে-পুড়ে এই লাইব্রেরীর গায়ে সতীশের বাড়ীর সদর দরজায় এসে দেখলে তার মুটে দাঁড়িয়ে আছে। অরুণ একবার দরজাটায় নাড়া দিয়ে একটা হাঁক দিলে—"মা-দুর্গা ঘরে আছেন?"

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দু'তিন বার হেঁকেও যখন কারু সাড়া পেলে না, তখন মুটের দিকে চেয়ে অরুণ বল্লে—"তুই যে বল্লি, মা ঘরে আছেন?"

মুটের উত্তর হলো—"আছেন কিন্তু সকাল থেকে জ্বরে বেহোঁস।"

"এতক্ষণ বলতে হয়রে গাধা!" বোলে অরুণ দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে, বাড়ীর মধ্যে দাওয়ার উপরে ব্যাগটা রেখে, ভাড়ার পয়সা মুটের হাতে দিয়ে, অরুণ লোকটাকে একেবার ডাক্তারবাবুকে ডেকে আন্‌তে পাঠিয়ে ঘরে ঢুকলো।

অন্ধকার ছোট ঘরটির মধ্যে দুর্গামণি শুয়েছিলেন। অরুণ গিয়ে আস্তে-আস্তে তাঁর পায়ে হাত দিতে চম্‌কে উঠে দুর্গামণি বলে উঠলেন—"কে সতীশ?"

অরুণ তাঁর কাছে সরে বসে বল্লে—"সতীশ তো নয়, আমি এসেছি, মা-দুর্গা!"

"অরুণ!"—বোলে দুর্গামণি তাঁর রোগা হাতখানি অরুণের কোলে ফেলে শুধোলেন—"বাড়ীর সব ভালো? আমার—" বোলেই সতীশের মা চুপ করলেন। একফোঁটা জল চোখের কোণে গড়িয়ে এল।

অরুণ তাড়াতাড়ি বোলে উঠলো—"তোমার বৌমা ভালো আছেন, ভেবোনা। গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছিল; হরেনদাদা ছাখে—রাস্তায় বসে কাঁদছে। সে আর তার বন্ধু ক্ষিতীশ তাকে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে তাকে ভয়ানক অসুখ থেকে বাঁচিয়েছে!"

দুর্গমণি অরুণের দিকে চেয়ে শুধোলেন "—এখন বৌমা?"

"এখন দিদি আমার কাছে আছে।" বোলেই অরুণ চাদরে একবার নিজের মুখটা বেশ কোরে মুছে নিলে।

দুর্গামণি একটা নিশ্বাস ফেলে বল্লেন—"তবে সে গুজোবটা?"

"সবই মিথ্যা!" বোলেই চট-কোরে অরুণ দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—"আমি একবার বাইরে দেখি, ডাক্তার এল বুঝি।"

দুর্গামণির সামনে বসে থাকা আর নিরাপদ নয় বুঝে অরুণ ডাক্তারকে সঙ্গে কোরে তবে ঘরে ঢুকলো এবার। ডাক্তারের মুখে অরুণ শুনলে, দুর্গামণির টাইফয়েড; কেউ নর্স না করলে চলবে না। এটুকুও ডাক্তার বল্লেন যে একটু দুর্নামের দরুণ পাড়ার মেয়েরা কেউ এঁর সেবা করতে রাজি নয়। ডাক্তারের কথায় বাধা দিয়ে অরুণ বলে উঠলো—"সে কথা থাক! আজ রাতটার মতো আপনি আপনার হিন্দুস্থানী দাসীটাকে এঁর কাছে পাঠিয়ে দিন। আমি আজই কলকাতা থেকে নর্স আনতে চল্লুম। আমার আসা পর্য্যন্ত আপনি এঁকে দেখবেন কিনা বলুন?"

"নিশ্চয় দেখবো!" বলে ডাক্তার চলে গেলেন।

ডাক্তারকে বিদায় কোরে অরুণ দুর্গামণির কাছে এসে বল্লে—"মা, সতীশের ঠিকানাটা কি? তাকে তার করতে হবে।"

দুর্গামণি বল্লেন—"সে তো তার পাবেনা। বিবাগী হয়ে কোথায় হিমালয় গেছে।"

অরুণ বল্লে—"তবে উপায়? আমি তোমার জন্যে কলকাতা থেকে নর্স আনিগে।"

নর্সের কথা শুনেই দুর্গামণি ভুরু কুঁচকে বল্লেন—"না, না, নর্স কাজ নেই! তোরা কেউ—"

অরুণ দুর্গামণির মুখের কাছে মুখ নিয়ে শুধোলে—"দিদিকে আনবো মা-দুর্গা?"

"সেই ভালো!" বোলে দুর্গামণি চোখ বন্ধ করে আস্তে বল্লেন—"বৌমাকে বলিস, আমি গুজোব-কথা, বেনামি-চিঠিতে একটুও বিশ্বাস করিনি, করবোও না। সতীলক্ষ্মী আমার বৌ!"

অরুণের চোখ ছল-ছল কোরে এল। সেই সময় ডাক্তারের দাসী রামদাসিয়া এসে উপস্থিত দেখে অরুণ বল্লে—"আজ রাতের মতো এই দাসীটাকে তোমার কাছে রেখে যাই; কাল দিদিকে এনে দিচ্ছি। আমার ব্যাগটা এইখানেই রইলো।"

দুর্গামণির পায়ের ধূলো নিয়ে অরুণ বেরোবে, দুর্গামণি রামদাসিয়াকে বল্লেন—"ও-ঘরে বাতাসা আর ডাব আছে, অরুণকে খেয়ে যেতে বল্।"

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অরুণ দু-খানা বাতাসা চিবিয়ে ডাবের সমস্তটা গলার মধ্যে ঢেলে দিয়ে মুখ মুছতে-মুছতে সোজা আবার ষ্টেশনের দিকে চল্লো।

পাবলিক লাইব্রেরীর কাছটায় অরুণের বন্ধু যতীন একটা এসেটিলিনের হাঁড়া খাটাতে ব্যস্ত ছিল; অরুণকে দেখে বলে উঠলো—"কিরে কোথায় চলেছিস্? শুকনো দেখি যে! খবর কি? পড়াশুনা চলছে কেমন? আজ রাতে বারোয়ারী পুজো; যাত্রা হবে; আসিস্—বুঝলি!" এমনি নানা প্রশ্নের অরুণ একটি-মাত্র উত্তর দিয়ে গেল—"মা-দুর্গার বড় অসুখ।"

গ্রন্থপঞ্জী

ছবির রাজা ওবিন ঠাকুর । অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাবার কথা । উমা দেবী
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আদিপর্বের শিল্পকর্ম
Abanindranath Tagore. Golden Jubille Number.
Abanindranath. Visva-Bharati
The Visva-Bharati Quarterly. Abanindra Number
শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ । রানী চন্দ
লিপির শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ । ভূদেব চৌধুরী
বাণীশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ । অশোকবিজয় রাহা
কাছের মানুষ অবনীন্দ্রনাথ । সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়
অবনীন্দ্রনাথ । লীলা মজুমদার
আধুনিক কবিতার দিগ্বলয় । অশ্রুকুমার সিকদার
সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ । বুদ্ধদেব বসু
প্রবন্ধ সংকলন । বুদ্ধদেব বসু
ছন্দের বারান্দা । শঙ্খ ঘোষ
একটি নক্ষত্র আসে । অম্বুজ বসু
জীবনানন্দ । গোপালচন্দ্র রায়
শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ । সুধা বসু
দক্ষিণের বারান্দা। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়
শুদ্ধতম কবি । আবদুল মান্নান সৈয়দ
স্থির বিষয়ের দিকে । অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
ভারতের চিত্রকলা / অশোক মিত্র
Tragic Sense of life / Miguel De Unamuno

Jibananda Das. Chidananda Dasgupta

কবি জীবনানন্দ। সঞ্জয় ভট্টাচার্য

বিশ্বভারতী পত্রিকা। অবনীন্দ্রনাথ সংখ্যা

জীবনানন্দ স্মৃতি। দেবকুমার বসু সম্পাদিত

কবিতা। জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যা

ময়ূখ। জীবনানন্দ স্মৃতি

জীবনানন্দ দাশ। বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত

রাজকাহিনী। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পথে বিপথে। „

বুড়ো আংলা। „

রং বেরং। „

একে তিন তিনে এক। „

ভূত পতরীর দেশ। „

আলোর ফুলকি। „

চাঁইবুড়োর পুঁথি। „

মারুতির পুঁথি। „

মাসী। „

কিশোর সঞ্চয়ন। „

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী। „

শিল্পায়ণ। „

আপন কথা। „

ঘরোয়া। „

জোড়াসাঁকোর ধারে। „

অবনীন্দ্র রচনাবলী ১, ২, ৩ খণ্ড। „

বনলতা সেন। জীবনানন্দ দাশ

ধূসর পাণ্ডুলিপি। „

সাতটি তারার তিমির। „

মহাপৃথিবী। „

বেলা অবেলা কালবেলা। „

রূপসী বাংলা। জীবনানন্দ দাশ

নীলাঞ্জনা। ,,

ঝরা পালক। ,,

কবিতার কথা। ,,

জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ,,

—

নির্দেশিকা

—